Volume I September , 2021 No. I

GEO-TALK

A Journal of Man and Environment

DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

HIRALAL BHAKAT COLLEGE

http://www.hbcnht.edu.in/college_magazine.php

Editor

Chandan Ghosh, SACT, Department of Geography, Hiralal Bhakat College.

.

Editorial Board:

1. Dr. Indranil Mondal, Assistant Professor, Department of Geography, Hiralal Bhakat College, Nalhati, Birbhum
2. Dr. Niladri Das, Assistant Professor, Department of Geography, Hiralal Bhakat College, Nalhati, Birbhum.
3. Dr. Rejaul Islam Sana, Assistant Professor, Department of Geography, Hiralal Bhakat College, Nalhati, Birbhum.
4. Mr. Biswajit Mondal, SACT, Department of Geography, Hiralal Bhakat College, Nalhati, Birbhum
5. Mr. Sajal Ghosh, SACT, Department of Geography, Hiralal Bhakat College, Nalhati, Birbhum
6. Mr. Biplob Sen, SACT, Department of Geography, Hiralal Bhakat College, Nalhati, Birbhum

© *Department of Geography, Hiralal Bhakat College*

HIRALAL BHAKAT COLLEGE

NALHATI, BIRBHUM, WEST BENGAL, PIN 731220Estd. 1986
(Affiliated to the University of Burdwan and Re-accredited byNAAC)
Phone:03465255254Email:hbcollege@gmail.comWebsite:www.hbcnht.in

Editorial Note

From,

Chandan Ghosh
SACT, Department of Geography
Hiralal Bhakat College
Nalhati.Birbhum

'Geo-Talk' নিয়ে সকলের মধ্যে অসংখ্য কৌতূহল ও উদ্দীপনা কাজ করেছে একদম সূচনা পর্ব থেকে। ভূগোল বিভাগের বেশ কিছু উদ্যোগপূর্ণ কাজের মধ্যে এই কাজটি অনন্যতার দাবি রাখে। যে মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এই পথ চলা শুরু হল, তা আগামী দিনে সকল ছাত্র-ছাত্রীদের জীবন বিকাশের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে আমাদের এই উদ্যোগ, সকল শিক্ষার্থীকে পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে আরও মনোযোগী ও দৃঢ় করবে - এই আশা রাখি।

বিষয়বস্তু নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিভাগের সকল শিক্ষকেরা যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন ও উক্ত বিষয়গুলিকে মালার মতো গেঁথে, সকল শিক্ষার্থীকে তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে, সমগ্র ব্যাপারটিকে একটি বাস্তব রূপ প্রদান করেছেন। তাদেরকে পরিচর্যা করা, পর্যবেক্ষণ করা ও সর্বোপরি তাদের মধ্যে অন্তর্নিহিত প্রতিভার বহিঃপ্রকাশ - যার ফলশ্রুতি হিসেবে আমাদের আজকের এই পত্রিকা (Geo-Talk)।

নির্দিষ্ট সময়ে লেখা পাঠানোর জন্য সকল অতিথিগণ, আমার স্নেহের ছাত্র-ছাত্রী ও বিভাগের শিক্ষক মহাশয়দের অসংখ্য ধন্যবাদ। নির্দিষ্ট সময়ে লেখা পাওয়ার ফলে আমার সম্পাদনার কাজটি সম্পন্ন করা অনেক সহজ হয়েছে। বিভাগীয় প্রধান ড. ইন্দ্রনীল মন্ডল, ড. নীলাদ্রি দাস, ড. রেজাউল ইসলাম সানা, শ্রীযুক্ত বিশ্বজিৎ মন্ডল, শ্রীযুক্ত বিপ্লব সেন ও শ্রীযুক্ত সজল ঘোষ মহাশয় সম্পাদনার কাজে বিভিন্নভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। ড. ইন্দ্রনীল মণ্ডল মহাশয়ের সুচারু দৃষ্টিভঙ্গি ও ড. নীলাদ্রি দাস মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল - আমাদের এই পত্রিকা। আমাকে সম্পাদক হিসেবে নির্বাচন করার জন্য ভূগোল বিভাগের কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চাই অধ্যক্ষ ড. নুরুল ইসলাম মহাশয়কে এবং I. Q. A. C. এর Co-ordinator ড. শুদ্ধসত্ত্ব ব্যানার্জি মহাশয়কে, যাহারা আমাদের এই পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারে প্রথম থেকে বিশেষভাব উদ্যোগী হয়েছেন। আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চাই বিশিষ্ট ভূগোল শিক্ষাবিদ ও লেখক শ্রীযুক্ত নীলাংশু চক্রবর্তী মহাশয়কে যিনি আমাদের এই পত্রিকাতে সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করে আমাদের এই পত্রিকার শ্রীবৃদ্ধি করেছেন।

পরিশেষে, আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চাই আমার স্নেহের সকল ছাত্র-ছাত্রীদের, যাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ছাড়া এই মহৎ কাজটি সম্পাদনা করার সুযোগ হয়তো আমার হতো না। আমার এই সম্পাদনার কাজে যদি কোথাও কোনো ভুল হয়ে থাকে, তাহলে আমি বিশেষভাবে সকলের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।

Chandan Ghosh
চন্দন ঘোষ
স্টেট এডেড কলেজ টিচার
নলহাটি, বীরভূম

HIRALAL BHAKAT COLLEGE

NALHATI, BIRBHUM, WEST BENGAL, PIN 731220Estd. 1986
(Affiliated to the University of Burdwan and Re-accredited byNAAC)
Phone:03465255254Email:hbcollege@gmail.comWebsite:www.hbcnht.in

Form the desk of Head of the Department

From,

Dr. Indranil Mondal
Assistant Professor and HOD
Department of Geography
Hiralal Bhakat College
Nalhati.Birbhum

বিভাগের কথা

ভূগোল বিভাগের পথচলা দীর্ঘ দিনের নয়। এই অল্প সময়ের পরিসরে অনেকগুলি উদ্যোগ নিয়েছে বিভাগ। 'Geo-Talk' তাদের মধ্যে অন্যতম। এটি একটি ই-প্রত্রিকা। অতিমারি-আবহে, ছাত্রছাত্রী এবং বিভাগের শিক্ষকদের সম্মিলিত প্রয়াস। আসলে সিলেবাসের মাটিতে পা রেখে, সিলেবাসের বাইরে আকাশ ছোঁয়ার ইচ্ছে। সিলেবাস এবং ই-প্রত্রিকার মাঝখানে ছিল ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে তিনটি আলোচনা-সভা। দ্বিতীয় সেমেস্টারের ছাত্রছাত্রীদের আলোচনা-সভার বিষয় হচ্ছে 'মানব সমাজের বিবর্তন'। আহ্বায়ক ছিলেন শ্রীযুক্ত চন্দন ঘোষ এবং সভাপতিত্ব করেছেন অধ্যাপক সৈয়দ মানুয়ারুজ জামান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান। চতুর্থ সেমেস্টারের ছাত্রছাত্রীদের আলোচনা-সভার বিষয় 'পরিবেশগত সমস্যা'। আহ্বায়ক ছিলেন শ্রীযুক্ত সজল ঘোষ এবং সভাপতিত্ব করেছেন শ্রীযুক্ত কৃতিমান বিশ্বাস, পরিবেশবিদ্যার অধ্যাপক। ষষ্ঠ সেমেস্টারের ছাত্রছাত্রীদের আলোচনা-সভার বিষয় 'দুর্যোগ ও তার মোকাবিলা'। আহ্বায়ক ছিলেন শ্রীযুক্ত বিশ্বজিৎ মণ্ডল এবং সভাপতিত্ব করেছেন ড.বংশীধর সাহু, গণিতের অধ্যাপক। ছাত্রছাত্রীরা উক্ত আলোচনা-সভায় যে বক্তব্যগুলি রেখেছেন, তাদের লিখিতরূপগুলি থেকে নির্বাচন করে নেওয়া হয়েছে প্রতিনিধিস্থানীয় নিবন্ধ। সেগুলি নিজ গুণে স্থান করে নিয়েছে ই-প্রত্রিকায়। এইখানে জানিয়ে রাখা ভালো, আলোচনা-সভার আহ্বায়কেরা সযত্নে গড়েপিঠে নিয়েছেন ছাত্রছাত্রীদের এবং সম্মানীয় সভাপতিদের মূল্যায়ন সমৃদ্ধ করেছে ছাত্রছাত্রীদের লেখাগুলি।

মাননীয় অধ্যক্ষ ড. নূরুল ইসলাম মহাশয় এবং আই.কিউ.এ.সি -র কোঅর্ডিনেটোর ড. শুদ্ধসত্ত্ব ব্যানার্জির সস্নেহ প্রশয়ে এই যাত্রাপথটি মসৃণ হয়েছে। এই প্রকল্পটির বাস্তব রূপ দিতে সম্পাদনার দায়িত্ব সামলেছেন শ্রীযুক্ত চন্দন ঘোষ। ই-প্রত্রিকা নির্মাণের সমস্ত ভার বহন করেছেন ড. নীলাদ্রি দাস। তাঁকে সহায়তা করেছেন ড. রেজাউল ইসলাম সানা, শ্রীযুক্ত বিশ্বজিৎ মণ্ডল, শ্রীযুক্ত বিপ্লব সেন এবং শ্রীযুক্ত সজল ঘোষ। বিভাগ সকলের কাছে কৃতজ্ঞ।

ইন্দ্রনীল মণ্ডল
বিভাগীয় প্রধান
ভূগোল বিভাগ, হীরালাল ভকত কলেজ

HIRALAL BHAKAT COLLEGE

NALHATI, BIRBHUM, WEST BENGAL, PIN 731220Estd. 1986
(Affiliated to the University of Burdwan and Re-accredited byNAAC)
Phone:03465255254Email:hbcollege@gmail.comWebsite:www.hbcnht.in

Message from the Desk of Principal, Hiralal Bhakat College

Hiralal Bhakat College, Nalhati is a premier institute of higher education in the district of Birbhum. It is pursuing the excellence in teaching- learning methods. It has already set up an exemplary standard in pursuing higher education which is recognised by the highest body of assessment and accreditation in the country. It has scored well for its graduate outcome and perception.

Department of Geography is one of the leading department of our College. During pandemic situation it has taken effective measures to reach every student through online platforms. Besides taking regular classes and keeping constant contact with the students it has successfully organised student seminar of various semesters.

This online magazine of the department is the outcome of the online seminar held recently. I hope, Geography department will lead other departments in the journey of attaining excellence in higher education.

HIRALAL BHAKAT COLLEGE ★ Estd-1986 W.B ★ NALHATI, BIRBHUM

Principal

Hiralal Bhakat College

Nalhati. Birbhum

Principal
Hiralal Bhakat College
Nalhati, Birbhum

CONTENT

Sl. No.	Title	Author	Page No.
1	দুর্যোগ প্রস্তুতিকরনের সামর্থ্যগত কৌশল ও তার বাস্তবায়ন	নীলাংশু চক্রবর্তী	1-6
2	“The Religion of the Forest”, “Tapoban” and “The Message of the Forest”: Tagore's Green Writing and Beyond	Dr. Suddhasattwa Banerjee	7-11
3	Geography & Geographers	Biplob Sen	12-13
4	ক্যান্সার এক্সপ্রেস---সবুজ বিপ্লব এর একটি ভয়ঙ্কর ক্ষতিকারক ফল	সজল ঘোষ	14-20
5	সমাজের বিবর্তন	অনুসূয়া বসু	21-23
6	মানুষের বিবর্তন	আকাশ ভকত	24-27
7	ঋতুভিত্তিক যাযাবর বৃত্তি	সুপ্রকাশ দত্ত	28-30
8	পিতৃতান্ত্রিক সমাজ	বিভা মাল	31-32
9	মাতৃতান্ত্রিক সমাজ	লিপিকা সাহা	33-35
10	পশ্চিমবঙ্গের উপজাতি সম্প্রদায়	প্রিয়াঙ্কা হালদার	36-39
11	শিল্প সমাজ	পূজা মণ্ডল	40-43
12	শিল্পোত্তর পরবর্তী সমাজ	পূজা প্রামাণিক	44-46
13	গ্রামীণ সমাজ ও উন্নয়ন	ত্রিশা বিশ্বাস	47-50
14	নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন	অভিজিৎ প্রামাণিক	51-54
15	জীববৈচিত্র্য হটস্পট- ভারতের অন্যতম জীববৈচিত্র্য হটস্পট পশ্চিমঘাট পর্বত মালা	রেহেনা খাতুন	55-59
16	পৃথিবীর ফুসফুস অগ্নিদগ্ধ সমস্ত পৃথিবীর চিন্তার কারণ অ্যামাজন বনভূমিতে দাবানল-23 আগস্ট, 2019	এম. ডি. আখতার আনসারী	60-66
17	শহুরে তাপ দ্বীপ	রঘুনাথ মণ্ডল	67-69
18	সুন্দরবন ভঙ্গর বাস্তুতন্ত্র	রাজীব হেমব্রম	70-73
19	প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার; পরবর্তীপ্রজন্মেরবিঘ্ন না ঘটিয়ে	সাদিরুল সেখ	74-77

20	নিস্তব্ধ উপত্যকায় জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ভাবনা – ‘সাইলেন্ট ভ্যালি আন্দোলন’ ভারতের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশ আন্দোলন	সম্পা প্রামাণিক	78-81
21	ইউট্রোফিকেশন: জলাশয়ের বন্ধ্যাকরন – জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীদের প্রাণ সংশয়	মনিষা চক্রবর্তী	82-85
22	দুর্যোগ এবং বিপর্যয়ের ধারণা	আব্দুল্লাহ হিল কাফি	86-89
23	দুর্যোগ পঠন-পাঠনের দৃষ্টিভঙ্গিসমূহ	অঙ্কিতা চক্রবর্তী	90-93
24	ভূমিকম্পের ফলাফল	জুঁই মণ্ডল	94-97
25	ভূমিকম্পের ব্যবস্থাপনা	কবিরুল ইসলাম	98-100
26	Flood as a Disaster and its Causes	Mou Mal	101-103
27	বন্যার প্রভাব	নিলয় মনি	104-106
28	বন্যা ব্যবস্থাপনা	প্রদীপ মাল	107-110
29	দুর্যোগ এবং এর কারণ হিসেবে ঘূর্ণিঝড়	রফিকুল ইসলাম	111-114

GEO-TALK
A Journal of Man and Environment
Journal available at: http://www.hbcnht.edu.in/college_magazine.php

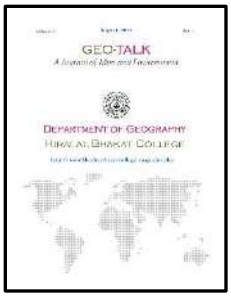

দুর্যোগ প্রস্তুতিকরনের সামর্থ্যগত কৌশল ও তার বাস্তবায়ন

নীলাংশু চক্রবর্তী*

বিশিষ্ট ভূগোলশিক্ষাবিদ ও লেখক

ARTICLE INFO

Keywords:
দুর্যোগ
টর্নেডো
Hazard Assessment
Resource Mobilization

Article history

Received: 19th July, 2021
Revised: 22th July, 2021
Accepted: 24th July, 2021
© ***Dept. of Geography, Hiralal Bhakat College***

ABSTRACT

সাধারণত কোনও দুর্যোগ বা বিপর্যয়ের পরিপেক্ষিতে বিষয়টি বেশ কয়েকটি মৌলিক নীতিকে অনুসরণ করে যথা- নির্ধারক, সময়কাল , চাহিদা, নির্ভরশীলতা, গবেষণা, পরিকাঠামো । ভারতের দুর্যোগ মোকাবিলায় সারকারীক্ষেত্রে যে বিভিন্ন স্তর রয়েছে সেগুলি হল- কেন্দ্রীয় সরকার স্তর, রাজ্য সরকার স্তর, জেলা স্তর, সমষ্টিগত স্টার এবং গ্রাম পঞ্চায়েত স্তর। দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রস্তুতির হযে বিভিন্ন কৌশল নেওয়া হয় সেগুলো হল- দুর্যোগ মূল্যায়িত করা,পরিকল্পনা, প্রাক সতর্কতা ব্যবস্থা।

পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের পর থেকেই মানুষ নিরাপত্তার স্বার্থে, বিভিন্ন সময়ে তার জীবনশৈলীতে বেশকিছু সাধারণ প্রস্তুতিমূলক পন্থা অবলম্বন করে এসেছে। কিন্তু সাধারণ জীবন যাপনের জন্য প্রস্তুতি, আর দুর্যোগ বা বিপর্যয়ের জন্য প্রস্তুতি, দুটিই হল ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্র। যখন কোনও স্থানে দুর্যোগ কিংবা বিপর্যয় অপ্রতিরোধ্য ভাবে আঘাত হানে, অথবা মানুষের জীবন সংকটের পরিস্থিতি তৈরি করে, তখন যথাযথ সামর্থের বিকাশ ঘটিয়ে তার প্রভাব গুলিকে কাটিয়ে তুলতে প্রস্তুতিকরণের বিষয়টি মানুষের সচেতনতা মূলক পদক্ষেপের একটি অনিবার্য কৌশলমাত্র। অন্যভাবে বলতে গেলে, যথাযথ বিকাশ বা নীতিমালা দুর্যোগের প্রতিক্রিয়ামূলক ঝুঁকিগুলোকে আগে থেকে চিহ্নিত করে, তার প্রভাব গুলিকে প্রশমিত করার লক্ষ্যে মানুষকে কিছুটা হলেও আশ্বস্ত করে। আবার, সময়োপযোগী প্রস্তুতির মাধ্যমে মানুষের জীবন সম্পত্তি, এমনকি পরিবেশে যাবতীয় সম্পদহানিগুলিকে রক্ষা করা সম্ভব। ঠিক সেই কারণেই বিশিষ্ট অধ্যাপক *Luka Kovacic* ***"In order to mitigate the losses and to prevent disaster situation local community, country and the international environment should be prepared''.***

আসলে কোনও দুর্যোগ কিংবা বিপর্যয় ব্যবস্থাপনার প্রক্রিয়াটিকে নিরন্তরভাবে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কিংবা সংশ্লিষ্ট কোনও দুর্যোগ রাতে বিপর্যয়ে উপনীত না হতে পারে সেই লক্ষ্যমাত্রাটিকে ব্যক্তি, গোষ্ঠী কিংবা প্রতিষ্ঠান মারফত যাবতীয় সক্ষমতা গুলিকে ধরে রেখেই প্রস্তুতিক্ষেত্রটি পরিচালিত হয়ে থাকে। তাই দুর্যোগ তথা বিপর্যয়ের প্রাক্ পরিকল্পনার নিরিখে এখানে সামর্থ্য এবং প্রস্তুতি ধারণাটি প্রায়

*Corresponding author
E-mail address: nilangsuc@gmail.com

কাছাকাছি। যেমন কোনও স্থানে বন্যা কিংবা ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস এ পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে, সরকারিভাবে প্রতিষ্ঠিত কোনও দুর্যোগ তথা বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর, কিংবা সংশ্লিষ্ট কাজে নিয়োজিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে খাদ্য সংরক্ষণ, Flood Shelter বা Storm Shelter গঠন, সম্প্রদায়গত প্রশিক্ষণ, Mock drill এর ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি প্রস্তুতি পর্বের অন্তর্গত হয়ে থাকে।

তবে, প্রস্তুতিকরণের পদক্ষেপটিকে মানুষ খুব সহজেই বা হঠাৎ করে গ্রহণ করতে শেখেনি। অতীতে মানুষ যখন জঙ্গলে বসবাস করত, তখন প্রকৃতিতে সংঘটিত ঝড়-বৃষ্টি, তুষারপাত প্রভৃতির হাত থেকে বাঁচার জন্য, মানুষ নিজেদের নিরাপদ বাসস্থানের জায়গাটাকে আগে থেকেই স্থির করে নিত। সেক্ষেত্রে তারা কোনো পাহাড়ি কিংবা পার্বত্য গুহায় নিজেদের বসবাস করে তুলতো। সেই সময়, এটাও ছিল দুর্যোগের এক সাধারণ প্রস্তুতি। সভ্যতার অভ্যুদয়ের পর দুর্যোগের অভিঘাতগুলি নিরসন করতে, মানুষ তার নিজস্ব জ্ঞান এবং একাধিক কৌশলের দ্বারা প্রযুক্তির ক্ষেত্রটিকে যথেষ্ট উপযোগী করে তুলেছে। বলাবাহুল্য, পৃথিবীর এমন কোন স্থান নেই, যা কোনও দুর্যোগ বা বিপর্যয়ের দ্বারা প্রভাবিত হয় না। এই পরিস্থিতিতে প্রথমদিকে মানুষের যাবতীয় প্রস্তুতি মূলক যাবতীয় কর্মকাণ্ড ছিল যেকোনও প্রাকৃতিক, কোনো আকস্মিক দুর্ঘটনা কেন্দ্রিক। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে সমগ্র পৃথিবী জুড়ে মানুষের কর্মকান্ডের পরিধিগত ব্যাপ্তি, প্রকৃতির উপর মানুষের নিরন্তর চাপ বৃদ্ধি, ক্রমবর্ধমান প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিব্যাপ্তি প্রভৃতি, সমগ্র মানবজাতির অস্তিত্বকে যে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, সেখানে সমস্ত ধরনের প্রস্তুতিই মানুষের প্রাত্যহিক জীবনদর্শন হয়ে উঠেছে।

সাধারণত কোনও দুর্যোগ বা বিপর্যয়ের প্রেক্ষাপটে প্রস্তুতির বিষয়টি বেশ কতগুলো মৌলিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, যেমন:

১। নির্ধারক (Determinants): যেকোনো প্রস্তুতির প্রধান নির্ধারক হল দুর্যোগ বিপর্যয়ের পরিস্থিতিতে মানুষের বিভিন্ন সমস্যা, ঝুঁকি, অসহায়তা বা বিপন্নতা প্রভৃতি।

২। সময়কাল (Period): যে কোনো দুর্যোগ তথা বিপর্যয়ের প্রস্তুতিপর্বের সময়কাল ধার্য করা হয় সংশ্লিষ্ট দুর্যোগ কিংবা বিপর্যয়ের পূর্বের অবস্থায়।

৩। চাহিদা (Demand):
প্রস্তুতির লক্ষে মানুষের যেসমস্ত চাহিদার দিকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়, সেগুলি হল মানুষের পর্যাপ্ত খাদ্য, প্রয়োজনীয় বস্ত্র, নিরাপদ আশ্রয়স্থল, চিকিৎসা পরিষেবা, যোগাযোগ বা পরিবহনগত বিভিন্ন মাধ্যম প্রভৃতি।

৪। নির্ভরশীলতা (Interdependency): দুর্যোগ কিংবা বিপর্যয় এর পরিস্থিতিসাপেক্ষে যাবতীয় প্রস্তুতি গ্রহণের ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি সহায়ক সম্পদের উপর নির্ভর করতে হয়, যেমন- নির্দিষ্ট পরিকল্পনা, বরাদ্দকৃত অর্থ, পরিকাঠামোগত স্তর, সাড়া প্রদানের সক্ষমতা, নেতৃত্বদান ও অংশগ্রহণ প্রভৃতি।

৫। গবেষণা ও প্রশিক্ষণ (Research and Training): বিভিন্ন দুর্যোগ ও বিপর্যয় পরিস্থিতির উদ্দেশ্যে, যাবতীয় প্রস্তুতিপর্বে গবেষণা এবং প্রশিক্ষণমূলক বিভিন্ন কর্মসূচির বিশেষ ভূমিকা থাকে।

৬।অবদান (Role): সমস্ত ধরনের দুর্যোগ ও বিপর্যয়ের প্রস্তুতিমূলক নীতিতে কোনও রাষ্ট্রের সরকারি, বেসরকারি অথবা আন্তর্জাতিক কোনও প্রতিষ্ঠানের বিশেষ অবদান লক্ষ্য করা যায়।

৭। সমন্বয় (Coordination): প্রস্তুতির মৌলিক নীতিতে বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক স্তরের মধ্যে সমন্বয় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

৮।পরিকাঠামো (Infrastructure): কোনও স্থানে সংগঠিত দুর্যোগ যাতে বিপর্যয় বিস্তৃতি লাভ না করতে পারে, সেইজন্য এই ধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলায় যথাযথ প্রতিক্রিয়া (Repercussion) বজায় রাখতে পরিকাঠামো বৃদ্ধির ওপর বিশেষ নজর দেওয়া হয়।

সাধারণত দুর্যোগের প্রকৃতিকে সামনে রেখে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র মূলত দুই ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করে থাকে, এগুলো হলোঃ

সমস্ত দুর্যোগে প্রস্তুতিকরণ (On all hazard preparedness): পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র কর্তৃক একাধিক দুর্যোগের প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে গড়ে তোলা এই ধরনের বহুমুখী প্রচেষ্টাটি অত্যন্ত অর্থবহুল এবং সময় সাপেক্ষ। কারণ, এই ধরনের প্রস্তুতিতে প্রথমে রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলের ঘটে যাওয়া একাধিক দুর্যোগ বা বিপর্যয়গুলিকে তাদের পূর্ববর্তী ক্ষয়ক্ষতির পরিসংখ্যানের মাধ্যমে যথার্থভাবে চিহ্নিত করতে হয়। এরপর নির্দিষ্ট পরিকল্পনার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট দুর্যোগ বা বিপর্যয়ের ঝুঁকির সম্ভাব্যতা নিরসনের লক্ষ্যে যথাযথ প্রস্তুতি নেওয়া হয়। বৃহৎ অঞ্চলের পরিপ্রেক্ষিতে এই ধরনের প্রস্তুতি অনেক রাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন রাজ্যের প্রশাসনিক স্তরের উপর বেশ কিছু দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। সমস্ত দুর্যোগের প্রস্তুতির জন্য কোনও

রাষ্ট্র একাধিক প্রশিক্ষিত বাহিনীর সাহায্য নিয়ে থাকে, যাদের সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। যেমন- ভারতবর্ষে National Disaster Management Authority সমস্ত ধরনের দুর্যোগের পরিপ্রেক্ষিতে প্রস্তুতিমূলক বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। বিশেষ করে ভারতবর্ষে National Disaster Response Force বা NDRF সর্বদা প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

নির্দিষ্ট দুর্যোগে প্রস্তুতিকরণ (On specified hazard preparedness): যখন কোনও একটি স্বল্প পরিসর স্থানে, বারবার একই ধরনের দুর্যোগের ঘনঘটা, কিংবা সংশ্লিষ্ট বিশেষ দুর্যোগ সৃষ্টির সম্ভাবনাকে সামনে রেখে, দুর্যোগ নিরসনের বিভিন্ন প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়, তাকেই নির্দিষ্ট দুর্যোগ প্রস্তুতিকরণ বলা হয়। এই ধরনের উদ্যোগ কোনও রাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রদেশ বা রাজ্যের প্রশাসনিক স্তরে গ্রহণ করা হয়।যেহেতু একটি বিশেষ দুর্যোগের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রস্তুতি নেওয়া হয়ে থাকে, তাই এখানে যাবতীয় সিদ্ধান্তগুলি অত্যন্ত পারদর্শীতার মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়। যেমন পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরল রাজ্যে প্রতিবছর প্রায় পালাকারে বন্যা সৃষ্টি হয়ে থাকে বলে, এই সমস্ত রাজ্যে বিশেষ দুর্যোগ প্রস্তুতিটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। অন্যদিকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মিসিসিপি অববাহিকা অঞ্চলে টর্নেডোর ঘনঘটার জন্য সেখানে সরকারি মাধ্যমে বেশকিছু Hazard Response Team সর্বদা প্রস্তুত থাকে।

দুর্যোগ প্রস্তুতিতে বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক স্তর

একাধিক প্রাতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রিত স্তর থেকেও দুর্যোগ প্রস্তুতির বিষয়টি বিভিন্ন ভাবে পরিচালিত হয়ে থাকে, যেমন-

সরকারি প্রস্তুতি (Governmental preparedness): কোনও স্থানে দুর্যোগ বা বিপর্যয়ের সমস্ত ধরনের প্রস্তুতি সর্বোচ্চ স্তরে থাকে সরকারি প্রস্তুতি। কারণ যে কোনও রাষ্ট্রের সরকার সেখানকার জনগণের নিরাপত্তা এবং জীবন রক্ষার জন্য সব সময় বিশেষভাবে দায়বদ্ধ। যেকোনো দেশের কেন্দ্রীয় সরকার প্রশাসনিক ঊর্ধ্বতন স্তর থেকে নিম্নতম স্তরে, প্রত্যেকের বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা তথা দায়দায়িত্ব অর্পণ করে, প্রস্তুতি মূলক কাজের ধারাবাহিকতা বজায় রাখে। ভারতবর্ষে দুর্যোগ প্রস্তুতি ক্ষেত্রে সহকারী বা প্রশাসনিকভাবে যে বিভিন্ন স্তরগুলি রয়েছে, সেগুলি হল:

কেন্দ্রীয় সরকার স্তর (Central Government Level)

↓

রাজ্য সরকারি স্তর (State Government Level)

↓

জেলা প্রশাসনিক স্তর (District Administrative Level)

↓

সমষ্টিগত উন্নয়ন স্তর (Block Development Level)

↓

গ্রাম পঞ্চায়েত/গনসভা স্তর (Village Panchayat Ganosabha Level)

প্রসঙ্গত, সরকারি বিভিন্ন প্রশাসনিক স্তরে প্রস্তুতির ক্ষেত্রে মূলত, যে সমস্ত বিষয় সর্বাধিক প্রাধান্য দিয়ে থাকে। এগুলো হলোঃ নির্দিষ্ট পরিকল্পনা (Specific Planning), সম্পদ ও সরঞ্জাম (Resources and Equipment), অনুশীলন (Exercise), প্রশিক্ষণ (Training) -মহড়া (Drill) এবং বিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষ (Statutory Authority) প্রভৃতি।

সাংগঠনিক প্রস্তুতি (Organisational Preparedness): সাংগঠনিক প্রস্তুতিতে বিভিন্ন Non Governmental Organization (NGO) এর ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। সমগ্র পৃথিবী জুড়ে এমন অনেক সংগঠিত সহায়ক প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যারা যেকোনো দুর্যোগ কিংবা বিপর্যয়ে নিজেদের সমস্ত সহায়-সম্বলকে সাথে নিয়ে দুর্যোগের মোকাবিলা করতে নেমে পড়ে। বাস্তবে এই প্রতিষ্ঠানগুলিই সংগঠনিক প্রস্তুতি নিয়ে থাকে। সাংগঠনিক প্রস্তুতির স্তরে, দুর্যোগ বা বিপর্যয় পরিস্থিতিকে মাথায় রেখে, যে সমস্ত প্রস্তুতি নিয়ে থাকে, সেগুলি হল: তথ্য সংগ্রহ (Information collection), কার্যভিত্তিক অনুশীলন (Functional Experience), তহবিল গঠন (Fund creates), পরিকল্পনা উদ্ভাবন (Plan invention) প্রভৃতি।

জনসাধারনের প্রস্তুতি (Public Preparedness): যে কোনও দুর্যোগ ও বিপর্যয়ের পরিস্থিতির সাপেক্ষে স্থানীয় জনসাধারণ বা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বেশকিছু প্রস্তুতি লক্ষ্য করা যায়। যখন কোনও স্থানে প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট কারণে মানুষের জীবনে নানা দুর্ভোগ নেমে আসে তখন দেশের নাগরিক, প্রতিবেশি, কিংবা পারস্পারিক সম্পর্কের নিরিখে প্রত্যেকেই সেবি পদগুলি মোকাবিলা করতে সদা প্রস্তুত থাকে। অনেক সময় জনসম্প্রদায়ের এই সহজাত দায়বদ্ধতা তথা প্রস্তুতি, কোনও অপরিচিত মানুষদের বিপদ থেকে উদ্ধারের ক্ষেত্রে সমান ভাবে কার্যকারী হয়ে ওঠে। প্রসঙ্গত, সমাজে সাধারণ মানুষের মধ্যে সম্প্রদায়গত বেশ কয়েকটি শ্রেণীর রয়েছে, যেমন: কৃষক, চাকুরীজীবি, ব্যবসায়ী, ধীবর প্রভৃতি, যারা যেকোনও বিপদে পড়বে প্রস্তুতিমূলক বিভিন্ন নির্দেশিকা বিশেষভাবে মেনে চলে। যেমন - সমুদ্রে মাছ ধরতে যায়, সর্বদা তারা আবহাওয়া সংক্রান্ত খবরা খবর রাখার জন্য সর্বদা নিজেদের কাছে একটি রেডিও কিংবা ট্রান্সমিটার সঙ্গে রাখে।

আগাম দুর্যোগে নিরিখে, একেও একটি প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপ বলা যায়।

পারিবারিক প্রস্তুতি (Household Preparedness): প্রত্যেকটি পরিবারের সদস্যরাই তাদের নিজস্ব পরিসরের মধ্যে থাকা আপনজনের নিরাপত্তার জন্য যথেষ্ট দায়িত্বশীল। তাই কোনও দুর্যোগ কিংবা বিপর্যয়ের পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে, আগাম প্রস্তুতিমূলক বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। যেমন বন্যাপ্রবণ অঞ্চলগুলিতে বসবাসরত প্রত্যেকটি পরিবারের যথেষ্ট উচ্চস্থানে নির্মাণ করা হয়। আবার যে সমস্ত অঞ্চলে প্রায় প্রবল শৈত্য প্রবাহের মতো ঘটনা ঘটে, সেখানকার পরিবারভিত্তিক বাসগৃহ গুলিতে খুব কম জানালা রাখা হয়। একইভাবে ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চলগুলিতে পারিবারিক বা পরিবারভিত্তিক বাসগৃহগুলি কাঠ দ্বারা নির্মাণ করা হয়। কাজেই সংশ্লিষ্ট দুর্যোগগুলির নিরিখে, এই সমস্ত পারিবারিক পদক্ষেপগুলোকে, নিরাপত্তামূলক আগাম প্রস্তুতি বলা চলে।

এছাড়াও, পৃথিবীর বেশকিছু আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যারা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যে কোনো দুর্যোগ বা বিপর্যয়ের অভিঘাত নিরসনের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকে। এই সমস্ত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে অন্যতম হল UNO (United Nations Organization), International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, WHO (World Health Organisation) প্রভৃতি। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলি বিভিন্ন দেশের সাথে সহযোগিতা ও সমন্বয় মূলক প্রচেষ্টার দ্বারা বিভিন্ন জরুরী পরিস্থিতিতে, তাদের প্রস্তুতি এবং প্রতিক্রিয়া আদর্শ মেলবন্ধন ঘটিয়ে থাকে।

প্রস্তুতির বিভিন্ন কৌশল (Different Strategies of Preparedness):

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে দুর্যোগ তথা বিপর্যয়ের প্রস্তুতি স্বরুপ, Community Based Disaster Preparedness (CBDP) এর সার্বজনীন কৌশলগুলোকে অবলম্বন করা হয়, এগুলি হল:

দুর্যোগ মূল্যায়িত করা (Hazard Assessment): প্রস্তুতি গ্রহণের প্রাথমিক পর্বেই যে কোনও দুর্যোগ বা বিপর্যয়ের প্রভাব গুলিকে বিশেষভাবে মূল্যায়িত করা হয়। এখানে নির্দিষ্ট পরিকল্পনামাফিক দুর্যোগের প্রতিটি ঝুঁকি (Risk) এবং বিপন্নতা (Vulnerability) মূল্যায়ন করার জন্য বেশ কয়েকটি বিষয় চিহ্নিত করা হয়, যেমন:

১। অঞ্চল বিশেষে মানুষ কোন কোন দুর্যোগ দ্বারা প্রভাবিত হয়, সেগুলির অভিঘাতগুলিকে চিহ্নিত করা।
২। কোন কোন অঞ্চলের মানুষ দুর্যোগের দ্বারা সর্বাধিক বিপন্ন, তা নির্ধারণ করা।
৩। দুর্যোগে ঝুঁকির বিভিন্ন স্তর কতটা মারাত্মক তা নিরূপণ করা।
৪। দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি নিরিখে সামর্থের মূল্যায়ন করা প্রভৃতি।

প্রসঙ্গত, সার্বিকভাবে দুর্যোগ মূল্যায়িত করার মাধ্যমে বোঝা যায়, দুর্যোগের পরিস্থিতিতে জনসংখ্যা, বাসগৃহ পরিকাঠামো প্রভৃতির এগুলি কতটা কার্যকরী।

সাড়া প্রদানের পদ্ধতিগত কৌশল (Response Mechanisms Strategies): প্রস্তুতিমূলক এই পর্বে, সাড়া প্রদানের যে সমস্ত পদ্ধতিগত কৌশল আয়ত্বকরণের করার ওপর জোর দেওয়া হয়, সেগুলি হল:

উদ্ধারকারী দলগঠন, দলগত মূল্যায়ন, জরুরিকালীন পরিস্থিতির জন্য বিতরণ কেন্দ্র গঠন, পরিস্থিতি অনুভব করে ত্রাণ শিবির এবং সংরক্ষণাগার গঠন, ত্রাণ সরবরাহের বিভিন্ন উপকরণের (যেমন- পরিবহন, যোগাযোগ ব্যবস্থা) পথ প্রশস্ত করা প্রভৃতি।

পরিকল্পনা (Plan): যে কোনো দুর্যোগ বা বিপর্যয় পরিকল্পনার পূর্বে পরিকল্পনামূলক প্রস্তুতি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এখানে যেকোনো পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে, যে কয়েকটি উপাদানের উপর নির্ভর করতে হয়, সেগুলি হল -
দুর্যোগ ও বিপর্যয় কেন্দ্রিক প্রাতিষ্ঠানিক মনোভাব বা সর্বাত্মক ধারণা, সময়োপযোগী সাংগঠনিক দুর্যোগ বা বিপর্যয় নিরসন মূলক সঞ্চালনা, সম্ভাব্য দুর্যোগ মুখাপেক্ষিতা, জরুরিকালীন পরিকাঠামো, প্রাতিষ্ঠানিক সহায়ক সম্পদ প্রভৃতি।

তথ্য ব্যবস্থাপনা (Information Management): যে কোনো দুর্যোগ বা বিপর্যয়ের জরুরিকালীন প্রস্তুতি কাঠামোয় তথ্য ব্যবস্থাপনা অপর একটি বিশেষ উপাদান। এক্ষেত্রে তথ্য ব্যবস্থাপনা লক্ষ্যে, পৃথিবীর সরকারি, বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন বিষয়গুলোর ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে সেগুলি হল-
স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তথ্য আহরণের জন্য, নির্দিষ্ট একটি Database তৈরি রাখা।
Nature Study এবং অন্যান্য গবেষণা মূলক কার্যাবলী গুলি চালিয়ে যাওয়া।

তথ্য পরিবেশন এবং তথ্য আদান-প্রদানের সমস্ত প্রযুক্তি আয়ত্তে রাখা প্রভৃতি

প্রসঙ্গত, দুর্যোগের প্রস্তুতি মূলক কার্যক্রমের সমগ্র তথ্য ব্যবস্থাপনার কাজটি সরাসরি মানুষের দুর্যোগ উপলব্ধি এবং তৎপরতার ওপর নির্ভরশীল।

প্রাক্ সতর্কতা ব্যবস্থা (Early Warning Systems): দুর্যোগ তথা বিপর্যয়ের নিরিখে যেকোনো প্রাক্ সর্তকতা ব্যবস্থার উদ্দেশ্য গুলি হল-

১। দুর্যোগের পরিস্থিতির পূর্বেই ঝুঁকি হ্রাসের জন্য বিভিন্ন সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গুলিকে যথাযথ সনাক্তকরণ।

২। একটি নির্দিষ্ট পূর্বাভাসের লক্ষ্যে Warning System এর যথাযথ ব্যবহার।

৩। উপযুক্ত পরিস্থিতিতে সর্তকতা প্রদানের মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করা বা তথ্য প্রদান করা প্রভৃতি। প্রসঙ্গত, উল্লেখ্য 2004 খ্রিস্টাব্দের 26 শে ডিসেম্বর ভারত মহাসাগরে ভয়াবহ সুনামির নিরিখে বিশ্বব্যাপী Early Warning System টিকে আগাম প্রস্তুতিপর্বে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়।

সম্পদ সংহতিকরণ (Resources Mobilisation): দুর্যোগের পরিস্থিতিকে আগে থেকেই অনুধাবন করে বিভিন্ন সহায়ক সম্পদ গুলির যোগান অক্ষুন্ন রাখাও একটি গুরুত্বপূর্ণ ন্যায় সঙ্গত পদক্ষেপ। সম্পদ সংহতিকরনের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো হল-

দুর্যোগের পরিস্থিতিতে সম্পদের সার্বজনীন চাহিদাগুলি সম্পর্কে সচেতন থাকা, সম্পদ আহরণে উপযুক্ত মেধাস্বত্বাকে কাজে লাগানো, সম্পদ অপচয়ের পথগুলিকে রোধ করা, সম্পদ বন্টন কেন্দ্রগুলির পথ উন্মুক্ত রাখা প্রভৃতি।

সমন্বয় (Coordination): সমন্বয় হল গোষ্ঠী তথা প্রতিষ্ঠানগুলিকে সহযোজিত বা সংগঠিত করার বিশেষ এক প্রক্রিয়া। যে কোনো কাজে সফলতা পাওয়া তখনই সম্ভব, যখন সর্বস্তরে সমন্বয়মূলক প্রচেষ্টার সার্থক প্রয়োগ ঘটানো যায়। দুর্যোগ বা বিপর্যয়ের পরিস্থিতিতে সরকারি এবং বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে একাধিক প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। তাই যেকোনো দুর্যোগের পরিস্থিতিতে প্রস্তুতির সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ঘটাতে প্রাতিষ্ঠানিক বিভিন্ন স্তরের সমন্বয় সাধন করা হয়। সুষ্ঠু সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে যে সমস্ত কর্মসূচিগুলোতে নজর দেওয়া হয়, সেগুলি হল-

প্রয়োজনীয় তথ্যগুলিকে একে অপরের মধ্যে ভাগ করে নেওয়া, পারস্পরিক যোগাযোগ ও পরিবহনের মাধ্যমগুলিকে একত্রে ব্যবহার করার সহমত পোষণ, উদ্ধার ও ত্রাণকার্যে একে অপরের পরিপূরক ভাবে কাজ করার প্রতিশ্রুতি রক্ষা প্রভৃতি।

সাধারণত দুর্যোগ বা বিপর্যয়ের প্রস্তুতিমূলক সমন্বয় নীতিতে কেন্দ্র এবং রাজ্যের মধ্যে থাকা সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে যেমন বিশেষ সাহচর্যতা লক্ষ্য করা যায়, তেমনই আন্তর্জাতিক স্তরে একাধিক রাষ্ট্র বা স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সমন্বয় মূলক পরিপূরকতা লক্ষ্য করা যায়।

সম্পদ সংহতিকরণ (Resources Mobilisation): দুর্যোগ বা বিপর্যয়ের যেকোনো পরিস্থিতি আগে থেকে মূল্যায়ন করে, যথাযথ সম্পদ সরবরাহ বজায় রাখার পদক্ষেপে সম্পদ সংহতি করণ বলা হয়। এটি এমন একটি ন্যায় সঙ্গত পদক্ষেপ, যেগুলিকে দুর্যোগ চলাকালীন বা দুর্যোগ-পরবর্তী পরিস্থিতিতে ত্রাণ ও উদ্ধার কার্যে যথেষ্ট কার্যকরী হয়ে ওঠে। দুর্যোগ বা বিপর্যয়ের প্রস্তুতিমূলক পর্বে সম্পত্তি করনের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র গুলি হল:

১। সার্বজনীন সম্পদের চাহিদাগত প্রেক্ষাপটগুলিকে বিশেষভাবে পর্যালোচনা,

২। সম্পদের উৎস স্থলগুলিকে চিহ্নিতকরন, ৩।সম্পদ যোগানের সমস্ত পথগুলোকে উন্মুক্ত করে দেওয়া,

৪। সম্পদ সংহতিকরনে স্বতন্ত্র মেধাস্বত্বের বিকাশ ঘটানো,

৫। সর্বস্তরে সম্পদের অপচয়ের পথগুলিকে নিরসন করা,

৬। পরিকল্পনা ভিত্তিক সম্পদ বন্টনকেন্দ্রগুলির পারিসরিক বৃদ্ধি ঘটানো প্রভৃতি।

গণশিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং মহড়া (Public education, Training & Rehearsals): দুর্যোগ বা বিপর্যয়ের অভিঘাতগুলির থেকে সরাসরি মানুষকে রক্ষা করতে জনসম্প্রদায় ভিত্তিক গণশিক্ষা, প্রশিক্ষণ, মহড়ার ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি অত্যন্ত কার্যকরী কয়েকটি পদক্ষেপ। বস্তুত, এই ধরনের প্রস্তুতিমূলক কর্মসূচীগুলি বিভিন্ন রাষ্ট্রের অন্তর্গত, সরকারি বা বেসরকারি একাধিক প্রাতিষ্ঠানিক স্তরের মাধ্যমে নেওয়া হয়ে থাকে। বছরের বিভিন্ন সময় ধরে এই ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়ে থাকে। সমগ্র প্রশিক্ষণ কার্যটি পরিচালনার দায়িত্বে থাকে বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত কয়েকজন KRP (Key Resources Person)। তবে, এই ধরনের কর্মসূচির সাফল্য নির্ভর করে জনগণের সদিচ্ছা এবং অংশগ্রহণের উপর। ভারতবর্ষে সরকারিভাবে যে কোনো দুর্যোগ বা বিপর্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতে গণশক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং মহড়া সংক্রান্ত সমগ্র

কার্যাবলী পরিচালনার দায়িত্ব রয়েছে NDRF (National Disaster Response Force) এর উপর।

পর্যাপ্ত সহায়তা ব্যবস্থাপনা (Adequate Support System):

দুর্যোগ বা বিপর্যয়ের প্রস্তুতি পর্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থাপনাটি হল মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিটি উপযোগিতাগুলিকে যথাযথ সরবরাহের পথ সুগম রাখা। এই উদ্দেশ্যে সরকারি-বেসরকারি স্তরে যে সমস্ত উপকরণ ও পরিষেবাগুলিকে সামনে রেখে সহায়তামূলক প্রস্তুতি নেয়া হয়, সেগুলি হল: খাদ্য (Food), বস্ত্র (Cloths), বাসস্থান (Shelter), জল (Water),

অর্থসংস্থান (Finance), তথ্য, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং প্রযুক্তি (Information, Communication and Technology) পরিবহন ব্যবস্থা (Transportation), নিরাপত্তা (Safety), শক্তি সম্পদ (Energy Resources), উৎপাদনপ্রণালী (Manufacturing) প্রভৃতি।

এখন তাহলে খুব স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগে, দুর্যোগের এই সমস্ত প্রস্তুতিমূলক পরিসরগুলিকে কি আমরা সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে শিখেছি? কারণ, এখনো অধিকাংশ দুর্যোগে মানুষকে কোনও দুর্যোগের নিরিখে অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করতে দেখা যায়। আবার, আর্থিক ভাবে পিছিয়ে পড়া দেশগুলিতে দুর্যোগের সক্ষমতা বা প্রস্তুতিকরণের বিষয়টি শুধুমাত্র তত্ত্বেই রয়ে গেছে। তবে এই ধরনের দুর্বলতা আমরা পুরোপুরি কাটিয়ে তুলতে না পারলেও বিশেষ কিছু পরিকল্পিত পদক্ষেপ দুর্যোগে আমাদের নিরাপত্তাকে কিছুটা হলেও নিশ্চিত করেছে। বিশেষ করে, 1980 দশকের পর থেকে উন্নত দেশগুলি, দুর্যোগের প্রকৃতি এবং নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে বেশকিছু প্রযুক্তিগত প্রস্তুতিমূলক কর্মকৌশলকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রয়োগ করতে শুরু করে। পরবর্তীকালে জাতিসংঘের পরিবেশ রক্ষার বিভিন্ন কর্মসূচি UNEP-United Nations Environment programme)- তেও বিভিন্ন অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতিতে যৌথভাবে প্রস্তুতি গ্রহণের কথা বলা হয়। তাছাড়া 1986 খ্রিস্টাব্দে যে স্বপরিচালনাধীন Asian Disaster Preparedness Center (ADPC) নামক সংস্থাটি গড়ে উঠেছে, সেটি এশিয়ার প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের জলবায়ু পরিবর্তন এবং দুর্যোগ মোকাবিলায় নিয়োজিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলির সক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে যাবতীয় প্রস্তুতি মূলক কাজকর করে থাকে। বিশেষ করে, একাধিক Sectoral Project এর মাধ্যমে ADPC দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে বন্যা, খরা, ভূমিকম্প, ভূমিধসে, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদির প্রতিরোধে প্রযুক্তিগত বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করে থাকে। সংস্থাটি বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ মারফৎ দুর্যোগ মোকাবিলার প্রস্তুতিমূলক প্রশিক্ষণ শিবির গুলিকেও অতি সাফল্যের সাথে পরিচালিত করে আসছে। বর্তমানে চীন, ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল, পাকিস্তান শ্রীলঙ্কা, ফিলিপিনস, কম্বোডিয়া, থাইল্যান্ড প্রভৃতি দুর্যোগ বহুল দেশগুলি এর অন্যতম সদস্যভুক্ত দেশ। বর্তমানে আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে Hyogo Framework কে দুর্যোগ ও বিপর্যয়ের সমস্ত ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণের অন্যতম সোপান বলে মনে করা হয়। এখানে, বিশ্বের পশ্চিমি সংস্কৃতির উদারনৈতিক ভাবধারার পরিপ্রেক্ষিতে, দুর্যোগ বা বিপর্যয়ের ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখে, আগাম প্রস্তুতিমূলক পর্বগুলিকে চ্যালেঞ্জ সরকারের নেওয়া হয়েছে। আরও Sendai Framework কে পাথির চোখ করে, 2035 সালের মধ্যে দুর্যোগ বা বিপর্যয়ের যাবতীয় প্রস্তুতি পর্বগুলি স্থিতিশীল উন্নয়নের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়ে চলেছে। সেই সঙ্গে, বর্তমানে পৃথিবীর উন্নত দেশগুলির পাশাপাশি উন্নয়নশীল দেশগুলিও জাতীয় স্তরে "Disaster Preparedness and Response Mechanisms Guidelines" নির্মাণ করে, দুর্যোগ ও বিপর্যয়ের অভিঘাতগুলিকে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে মোকাবিলা করে চলেছে। ঠিক সেই কারণে অধিকাংশ দেশ আজ বিপর্যয়হীন বিকাশের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে, মানুষের সমকালীন সমস্যা নির্মোচন এবং শ্রেয় ভবিষ্যত গঠনের লক্ষ্যে পৃথিবীতে স্থিতিশীলভাবে টিকে থাকার জন্য সমস্ত প্রস্তুতির সমস্ত পথগুলিকে খুলে রেখেছে।

GEO-TALK
A Journal of Man and Environment
Journal available at: http://www.hbcnht.edu.in/college_magazine.php

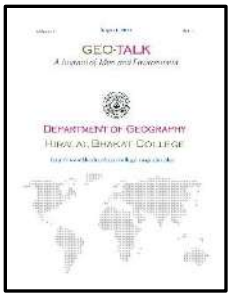

"The Religion of the Forest", "Tapoban" and "The Message of the Forest": Tagore's Green Writing and Beyond

Dr. Suddhasattwa Banerjee*

Assistant Professor, Department of English, Hiralal Bhakat College, Nalhati, Birbhum

ARTICLE INFO

Keywords:
Tapoban
The Ramayana
Sacchidananda
Visva-Bharati
Ecocriticism

Article history

Received: 8th July, 2021
Revised: 30th July, 2021
Accepted: 12th August, 2021
© Dept. of Geography Hiralal Bhakat College

ABSTRACT

While dealing with " The Religion of the Forest" have to trace back the time that defies the very notion of the importance of the forest. Citing the texts like Abhigyanam Shakir alam, Kumara Sambhabana and The Ramayana tagore observes a symbiotic relationship between man and nature in the vast biosphere of the forest. The symbiotic equilibrium that Tagore saw in ancient Indian civilization has been recently termed as the 'Biotic Community' in an alternative manner by the Norwegian ecocritic Arne Naess.

I would like to be critically engaged with some of Tagore's works e.g. "The Religion of the Forest", "Tapoban" and "The Message of the Forest" and show Tagore as an eco-conscious writer who, way back in the first two decades of the twentieth century anticipated some of the fundamental premises of the recent discourses of environment. I shall also try to historicise this Green Reading of Tagore in its contributive aspect to his anti- colonial rather postcolonial introspections and thereby foregrounding his relevance as a practical environmentalist to combat the threat of Global Warming and Climate Change in the twenty-first century. While dealing with "The Religion of the Forest" we have to trace back the time that defies the very notion of the importance of forest, put forward in this essay to a Bengali essay, "Tapoban" anthologised in his book Santiniketan and written between 1909 and 1916. In another lecture, "The Message of the

*Corresponding author
E-mail address: suddhasattwabanerjee@gmail.com

Forest" we find the key ideas of the essay under discussion. We have to take these three texts into our critical span to get a coherent picture of Tagore's Green Writing and in this context I would like to trace certain aspects in them that move beyond the well-defined premise of Ecocriticism and enters into the realm of the idea of living in complete coherence with nature. This journey beyond Green Writing is a result of Tagore's organic way of thinking, reading and writing with a unique gesture in an age when everything was fast transforming into abject mechanisation. His broad ecological perspective grew and matured over time and eventually recycled to meet the demands of his contemporary history. His pantheistic vision was flexible enough to incorporate within it the Upanishadic philosophy of material renunciation, self-determination and the search for the divine infinite in nature. According to him the kernel of India's value system is that of reconciliation of the diverse. This is the teaching of the hermitage, which is inscribed in the cultural memory of India: The hermitage shines out in all our ancient literature, as the place where the chasm between man and the rest of creation has been bridged. Citing the texts like *Abhigyanam Shakuntalam, Kumara Sambhabam* and *The Ramayana,* he observes a symbiotic relationship between man and nature in the vast biosphere of the forest. He even notices that that the entropy of material wealth and prosperity was gradually threatening this equilibrium and the poems of Kalidasa contained according to Tagore "a warning against the gorgeous unreality of that age, which like a Himalayan avalanche was slowly gliding down to an abyss of catastrophe".

Juxtaposing Europe's mastery over the elements of nature through the use of machines to the Indian ideal of syncretism, Tagore views: "For us the highest purpose of this world is not merely living in it and making use of it, but realizing our own selves in it through expansion of sympathy; not alienating ourselves from it and dominating it, but comprehending and uniting it with ourselves in perfect union". Thus the synonymity between external and internal nature is established through the word 'Sacchidananda'. It is for this reason that, according to Tagore, Rama could become a hero even in his exile, by sympathising with nature, not by dominating it.So, for Tagore nature was manifest not as an inanimate periphery; rather it came up as the sublime centre around which our lives evolve: That is why, when Sita was taken away, the loss seemed to be so great to the forest itself. Interestingly, this perception of Tagore anticipates two recent ecocritical coinages.

The symbiotic equilibrium that Tagore saw in ancient Indian civilization has been recently termed as the 'Biotic Community' in an alternative manner by the Norwegian ecocritic Arne Naess. Influenced by the Buddhist Doctrine of the non-harming of all beings, Naess views Biotic Community as a constellation of interconnected human and non-human entities.

Its balance must be preserved to secure the future Ecosphere as a whole. The establishment of Brahmacharyashrama in Santiniketan, then, can be simultaneously seen as the reiteration of an alternative cultural and Biotic Community where students were educated to be one with nature and not to harm its balance in any way. Education was a means to attain this union, rather than becoming an end in itself. James Lovelock, in another instance, puts forward his 'Gaia Hypothesis' which foregrounds a complex and multifaceted entity involving earth's Biosphere, atmosphere, oceans and soil. It is a totality constituting a proportionally organic system that operates like a living organism. Tagore's poetic, rather philosophical perception could initially sense this now-available ecological doctrine in a much earlier time. We are familiar with the notion of history as a repository of human phenomena. Nature is seen as a cultural construct that is made available to us through multiple discursive practices, which undermines the over-determined relationship between nature and culture and the very existence of an essential nature in the reality.

When in his "The Message of the Forest", Tagore views, "Man's history is organic, and deep-seated life-forces work towards its growth" he seems to radically deconstruct this position. In his essay "Tapoban" Tagore notes that the geographic, rather climatological location of a race is one of the key components in determining its cultural fate, and the collective mental structure also. So, the race that was nurtured by the sea-shore excelled in commerce, people whose spiritual appetite was not satiated in the barren and hostile climate of the desert, eventually turned towards conquering material wealth. Similarly, the untamed nature in the form of sea posed before the explorers of Europe the challenge to fight and dominate over it. The reason behind this belligerent attitude of Europe towards non-Europe then actually lies in the natural setting in which the civilization has flourished. Tagore through this 'greening' of his perception of historiography was actually writing against the colonial paradigms of writing history: a history that had been reduced to some empirical database of anthropocentric phenomena.

Unlike Gandhi's pre-modern rather anti-modern village community, he initially embraced technological modernity to give the villages a financial uplift. The intention was to draw some virtuous result out of it. But Tagore was increasingly becoming aware of the breach between the possibility and the outcome. In the name of global progress, technological modernity was slow-poisoning human morals, breeding avarice by the capitalist enclosure of humanity, whereas, globalization meant for him the globalization of values. The extreme idealization of rationality and technology put forward by Europe was for Tagore antithetically menacing for human salvation. In another essay Tagore pessimistically notes, "Today our homes

have dissolved into hotels, community life is shifted in the dense and dusty atmosphere of the office, man and woman are afraid of love" and wonders whether science can at all be 'humanized'. He left it entirely upon science "to bring back sanity to the human world by lessening the opportunity to gamble with fortune". In his last years this feeble faith on the prospect of a fruitful application of technology would also go "bankrupt altogether". So far I have tried to show Tagore as a Theorist, who was aware of his environment. But his negotiation with environmentalism was not limited only to abstract theorization. The rural reconstruction work at Sriniketan bears a practical example of it. His insistence on the development of cottage-industries, the introduction of festivals like Vriksharopana (tree planting) and Halakarshana (ploughing) posit him as an activist who was painstakingly trying to restore the values, lost in the ancient Indian civilization and to relocate it in his 'modern' hermitage: Visva-Bharati. Ecocriticism, according to Glotfelty, is at present a "predominantly white movement", arguably lacking the institutional support-base to engage fully with multicultural and cross-cultural concerns.

Tagore's works which are being discussed interestingly provide us with this alternative perspective much before even the inception of ecocriticism. Ecological concerns came to Tagore being interwoven with moral, rather ethical issues. He could not find any chasm between them because, for him nature was an embodiment of the divine morality: something that man was supposed to reveal in his personality. This attitude paved his way towards the cosmopolitan, rather universal dissemination of values, which defied any kind of socio-cultural codification or chronological specificity. Green writing is not a stable form of reaction to a stable problem. In our neo-colonial reality, global warming has come up as a threatening offspring of European late-capitalist, rather consumerist vision of economic progress, in a more disastrous manner than what was there in the time of Tagore. Shall we still not pay any heed to his word when he says, "For India to force herself along European lines of growth would not make her Europe, but only a distorted India". It is not only a conscious attempt to deviate from the European way of ecoconsciousness, but it is also a recognition on the part of Tagore to recognize and reiterate the Natural as the force that sustained man. Tagore also recognized that to generate this awareness and respect he required a language of spirituality and deification that would formalize and aestheticize this awareness to inculcate the sense of importance of nature among his fellow citizens and ashramites. The poetic, aesthetic, environmental and the pedagogic came together within these works as Tagore wore a mythical presence of nature within the human and it is startling to find the relevance of Tagore's thoughts in the modern ecological theorizations

like Nicholas Polunin's *Growth Without Eco Disaster* and Henry Frankfort's *Kingships and the Gods*.

GEO-TALK
A Journal of Man and Environment
Journal available at: http://www.hbcnht.edu.in/college_magazine.php

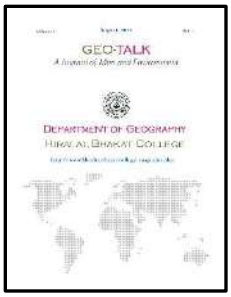

Geography & Geographers

Biplob Sen*

SACT, Department of Geography, Hiralal Bhakat College, Nalhati, Birbhum

ARTICLE INFO

Keywords:
Richard Hearthstone
Paradigm
Quantitative Revolution
Anaximander

ABSTRACT

The term "geography" was coined by a Greek scholar Eratosthenes. Later on the term "geography" was known to all as a subject. The modern era in geography started with the scholarly works the American, French, Britain,German and Soviet scholar.

Article history

Received: 8th July, 2021
Revised: 30th July, 2021
Accepted: 12th August, 2021
© ***Dept. of Geography Hiralal Bhakat College***

From the Precambrian era to Cenozoic Era the history of originating geography lies. The formation of the earth started about 4.5 billion years ago. Then eventually the term "Geography" was coined by a Greek scholar, named Eratosthenese. Though the term "Geography" was unknown before, but the quest to learn the facts were started already. Later on, the term "Geography" was known to all as a subject. The subject has widespread nature, which was later explained briefly by Richard Hartshorne in his book "The Nature of Geography". With the phase of time, the dimensions and the nature of the subject reached a new height. As the dynamic nature of the subject and vast study area, the subject unfolds huge scope for the Geographers to study the temporal shift and new dimensions. From ancient to modern times the insight of the Geographers gave birth to several new branches of Geography. In the early period of studying Geography, the main focus was on the Physical perspectives. Then the focus of the subject was shifted towards man environmental relationships. In the ancient period, Geography grew out of the exploration, mapping, observation, and speculations from the observations. It is hard to trace the actual time of diffusion and spread of geographical

*Corresponding author
E-mail address: biplob.sen1993@gmail.com

knowledge. The archaeological evidence collected from different civilizations gave a primary idea of the history of geographical knowledge. Hence different civilizations of the world contributed several facts, the collage of all contributed facts eventually flourish the geographical diverse knowledge. Before the rise of the Hellenic culture, geography was treated as a subjective domain of the surface of the earth. After the rise of the Hellenic culture, Phonecians contributed important knowledge to the subjective domain. The Greek scholars are notable in the ancient geographical era. Several Greek scholars like Homer, Thales, Hecataeus, Anaximander, Eratosthenes, Plato, Aristotle, and Herodotus are remarkable. They discovered the direction of the wind, various geometric techniques, world maps, the circumference of the earth, etc. After the Greeks, Roman, Chinese, Indian scholars contributed important aspects to the subject. The modern era in Geography started with the scholarly works the American, French, Britain, German and Soviet scholars. With the work of modern Geographers, the approach to study geography has been changed. Like the regional approach was shifted towards systematic approach. In this context Hartshorne-Schafer debate was important. Later on, the scientific and systematic approach to study geography started at the beginning of the Quantitative Revolution. Thus the subjective domain of Geography became vast, more meaningful, and scientific. The paradigm shift of geographical knowledge brings geography to the postmodern era. Thus the cohesiveness between Geographers and Geography from the ancient to modern era broadens the changing nature of Geography.

GEO-TALK
A Journal of Man and Environment
Journal available at: http://www.hbcnht.edu.in/college_magazine.php

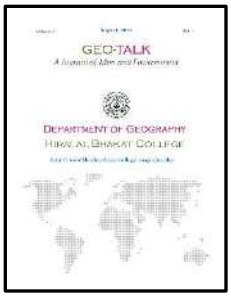

ক্যান্সার এক্সপ্রেস---সবুজ বিপ্লব এর একটি ভয়ঙ্কর ক্ষতিকারক ফল

সজল ঘোষ *

SACT, Department of Geography, Hiralal Bhakat College, Nalhati, Birbhum

ARTICLE INFO

Keywords:
ক্যান্সার এক্সপ্রেস
সবুজ বিপ্লব
ম্যালাথিয়ন
পাঞ্জাব
PGIMER

Article history

Received: 8th July, 2021
Revised: 30th July, 2021
Accepted: 12th August, 2021
© ***Dept. of Geography Hiralal Bhakat College***

ABSTRACT

ভারতের সবুজ বিপ্লব এর সুফল ভোগ করে মূলত পাঞ্জাব এবং হরিয়ানা। সবুজ বিপ্লবকে সফল করার জন্য প্রচুর পরিমানে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার করা হয় , এর ফলে মাটিতে, জলে এগুলি মিশে মানুষের শরীরে প্রবেশ করে ক্যান্সার ঘটায়। সবুজ বিপ্লব এর ফলে পাঞ্জাব "Food Bowl" হওয়ার সাথে সাথে " Cancer Bowl" ও পরিণত হয়েছে। পাঞ্জাব এর মালওয়া অঞ্চল এ ক্যান্সার রোগীর সংখ্যা সর্বাধিক। একে ভারতের "Cancer বেল্ট"বলা হয়। এই অঞ্চল এর মানুষ নিকটতম সবথেকে সাশ্রয়ী মূল্যের হাসপাতাল Acharya Tulsi Regional Cancer Treatment and Research Centre , Bikaner, Rajasthan এ যায়। এই গন্তব্যে যাওয়ার ট্রেন হল 54703 নম্বর এর Abohar-Jodhpur Passenger যার নাম হচ্ছে ক্যান্সার এক্সপ্রেস।

ভূমিকা

বিজ্ঞান সাধনার মূলেই রয়েছে মানবকল্যাণ। বিজ্ঞান – বলে বলীয়ান মানুষ দূরন্ত নদীর স্রোতকে বশীভূত করে তার অমৃত প্রবাহে উষর মরুকে করেছে শস্য–শ্যামলা। তার চিন্তা ভাবনা, কামনা বাসনা, প্রয়াস প্রচেষ্টা আজ কেবল মর্তসীমার গণ্ডিতেই আবদ্ধ নয়, মহাকাশের নীল সীমান্ত অতিক্রম করে গ্রহ থেকে গ্রহানতরে প্রসারিত। কৃষিক্ষেত্রে বিজ্ঞানের নানাবিধ সহযোগিতায় সফল হয়েছে সবুজ বিপ্লব এর। কিন্তু প্রদীপ এর সামনে যেমন আলোকিত অংশ থাকে ঠিক তার তলায় থাকে অন্ধকার, যেহেতু বিজ্ঞান কোনো সচেতন বস্তু নয় তাই নিজের ইচ্ছেমতো কিছু করবার ক্ষমতা নেই তার, আমরা বিজ্ঞানকে যেভাবে প্রয়োগ করবো ঠিক সেই মতই ফল পাবো। তাই সবুজ বিপ্লব এর বিজ্ঞান এই আশীর্বাদ গ্রহণ করতে গিয়ে আমাদেরকে মূল্য চকাতে হয়েছে অনেক কৃষককে তাদের জীবনকে ক্যান্সার আক্রান্ত এবং মৃত্যুর মাধ্যমে। "ক্যান্সার এক্সপ্রেস" একটি খুব কৌতূহলী নাম, যার সাথে জড়িয়ে রয়েছে সবুজ বিপ্লব এর এক লুক্কায়িত কারণ।

সবুজ বিপ্লব এর উৎপত্তি:

"বিপ্লব" কথাটির আক্ষরিক অর্থ হল আমূল পরিবর্তন। তাই সবুজ বিপ্লব এর অর্থ হল সবুজ এর আমূল পরিবর্তন। ভারতবর্ষে স্বাধীনতা পূর্ব এবং পরবর্তী সময়ে খাদ্যের অভাবে দুর্ভিক্ষ দেখা দিতে এর কারণ ছিল ভারতে প্রাচীন পদ্ধতিতে কৃষিকাজ। তাছাড়া Malthus

*Corresponding author
E-mail address: sajalghoshsuri@gmail.com

এর থিওরি অনুসারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় Geometric Progression (1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128...) এ আর খাদ্য বৃদ্ধি পায় Arithmetic Progression (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8…) এ। তাই ভারতের মতো জনবহুল দেশের কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ এর মাধ্যমে অধিক ফসল উৎপাদনের প্রয়োজন হয়ে পরে। 1950 এর দশকে মেক্সিকোতে ড: নরম্যান বোরলগ উচ্চফলনশীল গম বীজ এর ব্যবহার এর মাধ্যমে সবুজ বিপ্লব এর সূচনা করেন। বোরলগের উদ্ভাবনের কল্যানে ওই সময় দুর্ভিক্ষ থেকে কমপক্ষে 100 কোটি মানুষ রক্ষা পায়। তাকে এইজন্য 1970 সালে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। যদিও "Green Revolution" শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন উইলিয়াম গড 1968 সালে। ভারতের সবুজ বিপ্লব এর জনক বলা হয় এম. এস. স্বামীনাথনকে। 1960 এর দশকের এর পর থেকে উচ্চফলনশীল বীজ এবং অন্যান্য আধুনিক কৃষি পরিকাঠামোর সাহায্যে ফসল উৎপাদনের অভুতপূর্ণ উন্নতিকে সবুজ বিপ্লব বলা হয়। সবুজ বিপ্লব এর সাহায্যে ভারত এর কৃষিতে স্বনির্ভর যেমন হয়েছে তেমন বিদেশি আমদানি বন্ধ হয়েছে এবং সর্বপরি দুর্ভিক্ষের অবসান হয়েছে। ভারতে সবুজ বিপ্লব এর প্রাথমিক সাফল্য অর্জন করে পাঞ্জাব এবং হরিয়ানা।

চিত্র ২ - সবুজ বিপ্লব এবং কীটনাশক স্প্রে

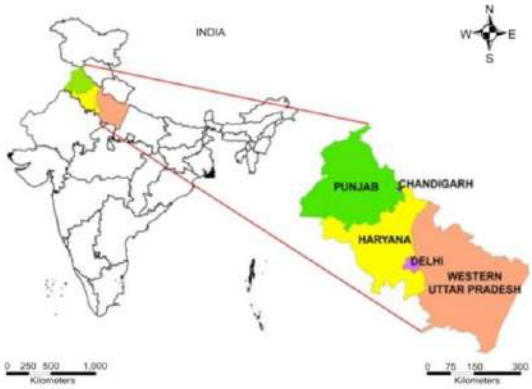

চিত্র ১ - ভারতের সবুজ বিপ্লব এর রাজ্য সমূহ

সবুজ বিপ্লব এর মূল উপাদান: সবুজ বিপ্লবকে সাফল্য মন্ডিত করার জন্য কয়েকটি উপাদান অপরিহার্য ছিল, এগুলি হল:

(১) উচ্চফলনশীল বীজ
(২) রাসায়নিক সার
(৩) কীটনাশক এর প্রয়োগ
(৪) জলসেচ
(৫) কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার
(৬) কৃষি ঋণের ব্যবস্থা ইত্যাদি।

উচ্চফলনশীল বীজে কম সময়ে অনেক বার ফসল উৎপাদন করা যায়। উচ্চফলনশীল বীজের ক্ষেত্রে রাসায়নিক সার এবং কীটনাশক বেশি ব্যবহার করতে হয়। রাসায়নিক সারের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো এর N:P:K এর অনুপাতটি 4:2:1, তাই এটি বেশি কার্যকর হয়। 1970-71 সালের পর থেকে রাসায়নিক সারের ব্যবহার বেড়েছে প্রায় 12 গুণ, আর এই সময় এ খাদ্যশস্যের পরিমান বেড়েছে প্রায় 3 গুন।

সবুজ বিপ্লব এর মূল উপাদান: সবুজ বিপ্লবকে সাফল্য মন্ডিত করার জন্য কয়েকটি উপাদান অপরিহার্য ছিল, এগুলি হল:

(১) উচ্চফলনশীল বীজ
(২) রাসায়নিক সার

(৩) কীটনাশক এর প্রয়োগ
(৪) জলসেচ
(৫) কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার
(৬) কৃষি ঋণের ব্যবস্থা ইত্যাদি।

উচ্চফলনশীল বীজে কম সময়ে অনেক বার ফসল উৎপাদন করা যায়। উচ্চফলনশীল বীজের ক্ষেত্রে রাসায়নিক সার এবং কীটনাশক বেশি ব্যবহার করতে হয়। রাসায়নিক সারের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো এর N:P:K এর অনুপাতটি 4:2:1, তাই এটি বেশি কার্যকর হয়। 1970-71 সালের পর থেকে রাসায়নিক সারের ব্যবহার বেড়েছে প্রায় 12 গুণ, আর এই সময় এ খাদ্যশস্যের পরিমান বেড়েছে প্রায় 3 গুন।

কৃষিকার্যে ব্যবহৃত রাসায়নিক সার:

কৃষিকার্যে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রচুর পরিমানে রাসায়নিক সার ব্যবহার করা হয়, যেমন - ইউরিয়া, অ্যামোনিয়াম সালফেট, অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, মনোক্যালশিয়াম ফসফেট ইত্যাদি। এইসব সারের অব্যবহৃত অংশ বৃষ্টির জল দ্বারা বাহিত্হয়ে নিকটবর্তী হ্রদ, নদী বা জলাশয় এ মিশে মানুষের শরীরে প্রবেশ করে। পানীয় জলে নাইট্রেট আয়ন থাকলে তা ব্যবহার করা যায় না, কারণ জলের বিশুদ্ধকরণ প্রক্রিয়ায় নাইট্রেট আয়ন অপসারণ করা যায় না। নাইট্রেট আয়ন মিশ্রিত জল গ্রহণ করলে শিশুদের "ব্লুবেবিসিনড্রোম" নামক রোগ দেখা যায়। মানবদেহে নাইট্রেট আয়ন নাইট্রে। সোঅ্যামিন জাতীয় যৌগের সৃষ্টি হয় যার প্রভাবে ক্যান্সার সৃষ্টি হয়।

কৃষিকার্যে ব্যবহৃত কীটনাশক পদার্থ: অধিক পরিমাণে শস্য উৎপাদনের জন্যও সংরক্ষণের জন্য বিবিধ রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহৃত হয় যেমন- কীট পতঙ্গ মারার জন্য পতঙ্গ নাশক, ছত্রাক বিনাশের জন্য ছত্রাক নাশক, আগাছা বিনাশের জন্য গুলমানাশক ইত্যাদি। এদেরকে একত্রে কীটনাশক বলা হয়। কীটনাশক বিভিন্ন ধরনের হয়, যেমন - (১) ক্লোরিন-ঘটিত কীটনাশক: ডি.ডি.টি, গ্যামিক্সন, অ্যালডিন, ক্লোরডেন ইত্যাদি। (২) ফসফেট ঘটিত কীটনাশক: ম্যালাথিয়ন, প্যারাথিয়ন, মিথাইল প্যারাথিয়ন, ডায়াজিনোন ইত্যাদি। (৩)কার্বামেট জাতীয় কীটনাশক: সেভিন, বেগন ইত্যাদি।

এদের মধ্যে ক্লোরিন ঘটিত কীটনাশক গুলি অত্যন্ত ক্ষতিকারক, কারন এরা জৈব রাসায়নিক পক্রিয়ায় বিয়োজিত হয় না। এদের বিষক্রিয়া বছরের পর বছর টিকে থাকে। এগুলি জলে অদ্রাব্য কিন্তু তেল ও চর্বিতে দ্রাব্য। খাদ্য শৃঙখলের মাধ্যমে মানুষের শরীরে প্রবেশ করলে এগুলি বিভিন্ন চর্বি সম্পন্ন কলাই সঞ্চিত হয়। এর প্রভাবে মানুষের শরীরে ক্যান্সার এর সৃষ্টি হয়।

"ভারতের ক্যান্সার বেল্ট": ভারতের গড় ক্যান্সার রোগী প্রতি লাখ এ 80 জন, সেখানে পাঞ্জাব এ ক্যান্সার রোগীর সংখ্যা প্রতিলাখ এ 90 জন। পাঞ্জাব এর মালওয়া অঞ্চলকে ভারতের ক্যান্সার বেল্ট বলা হয়। মালওয়া অঞ্চলটি পাঞ্জাব এর দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে অবস্থিত , যেটি কটনবেল্ট নামে পরিচিত। তুলাতে অন্য ফসলের তুলনায় বেশি পরিমাণে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক এর ব্যবহার হয়, তাই এই অঞ্চল এ ক্যান্সার রোগীর সংখ্যা অত্যধিক বেশি। এই অঞ্চল এ ক্যান্সার রোগীর পরিমান প্রতি লাখ এ প্রায় 109 জন। মালওয়া ছাড়াও Muktsar, Faridkot, Ferozpur, Mansa অঞ্চল এ ক্যান্সার রোগীর সংখ্যাপ্রচুর। Majha এবং Doaba অঞ্চল এ ক্যান্সার রোগীর সংখ্যা বেশি। Malwa অঞ্চল এ প্রতি লাখ এ ক্যান্সার এ মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় 30 জন, Majha অঞ্চল এ প্রায় 21 জন এবং Doaba অঞ্চল এ প্রায় 28 জন। জারনাইলসিং জানিয়েছেন যে, কৃষকেরা এলাকা থেকে ময়ূর উধাও হয়ে যাওয়ায় মধ্যে দিয়ে প্রথম টের পান যে কোথাও কিছু একটা সমস্যা হচ্ছে। জারনইলেসিং যখন বিষয়টি পুরোপুরি অনুধাবন করতে পারেন ততদিনে তার পরিবারের সাত সদস্য ক্যান্সার এ আক্রান্ত এবং তাদের মধ্যে 3 জন মারা গেছেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে এলাকার কৃষকেরা কীটনাশক স্প্রে করার সময় কোনো সুরক্ষা নেন না, তিনি বিষয়টি নিয়ে নানা মহলে যোগাযোগ করতে থাকেন। এক পর্যায় এ তার আবেদনে সাড়া দিয়ে পাঞ্জাব এর '**Post Graduate Institute of Medical Education and Research**' এর গবেষকরা বিষয়টি নিয়ে অনুসন্ধান শুরু করেন এবং তারা দেখেন জারনিলেসিং এর ধারণাটি এক দম ঠিক। যেখানে কীটনাশক ব্যবহার এর

প্রবণতা বেশি সেই অঞ্চল এ ক্যান্সার এর প্রাদুর্ভাবও বেশি।

চিত্র ৩-ক্যান্সার এক্সপ্রেস এবং জমিতে কীটনাশক স্প্রে করা হচ্ছে

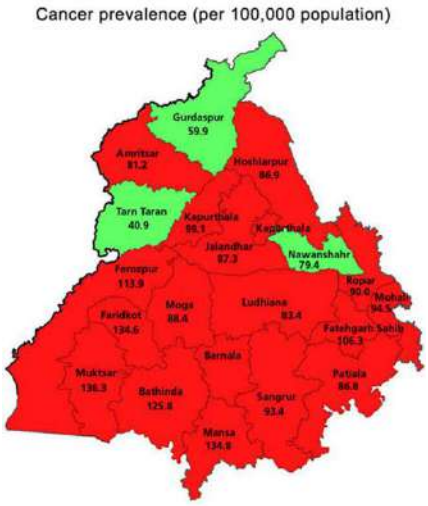

চিত্র -৪ পাঞ্জাব এর ক্যান্সার প্রভাবিত এলাকা সমহ

ক্যান্সার এক্সপ্রেস কি?:

ভারতের মধ্যে সবথেকে বেশি ক্যান্সার রোগীর সংখ্যা পাঞ্জাব এ।সবুজ বিপ্লব এর ফলে এখানকার মাটিতে, জলে কীটনাশক ও রাসায়নিক সার ব্যবহার এর ফলে বিষাক্ত হয়ে গেছে। তাই প্রায় পাঞ্জাব এর ঘরে ঘরে আজ ক্যান্সার রোগী। বিশেষ করে Malwa অঞ্চল এ ক্যান্সার রোগীর সংখ্যা খুব বেশি। তাই এই অঞ্চল এর মানুষ সামনা সামনি সব থেকে সাশ্রয়ী মূল্যের নিকটতম ক্যান্সার হাসপাতাল Acharya Tulsi Regional Cancer Treatment and Research Centre, Bikaner, Rajasthan এ যায়। এই গন্তব্যে যাওয়ার ট্রেন হলো 54703 নম্বর এর Abohar - Jodhpur Passenger যার নাম হচ্ছে ক্যান্সার এক্সপ্রেস। এই ট্রেনটি যাত্রা শুরু করে Abohar Junction (ABS) থেকে এবং পৌঁছায় Jodhpur Junction (JU) তে। মোট দুরত্ব অতিক্রম করে 673 কিমি এবং সময় লাগে 18 ঘন্টা 20 মিনিট। মাঝে 26 টিস্টেশন পড়ে , সবকটি স্টেশন থেকে কমবেশি ক্যান্সার রোগী চাপেন এই ট্রেন এ।

ক্যান্সার এক্সপ্রেস: প্রতিদিন রাতে ঠিক 9 টা বাজলেই অন্যরকম এক চাঞ্চল্য তৈরি হয় পাঞ্জাব এর ভাতিনদা রেলস্টেশন এ। রোজকার মতোই 12 কোচের যাত্রীবাহী একটি ট্রেন এসে দাঁড়ায় রেল স্টেশনের 2 নম্বর প্লাটফর্মে। যাত্রীরা ছাড়াও ট্রেনটিকে এক

নজর দেখতে আসা উৎসুক মানুষের সংখ্যাও কম থাকে না। ট্রেনটি প্লাটফর্ম ত্যাগ করে ঠিক 9 টা 25 মিনিটে। সকাল 5 টা নাগাদ 326 কিলোমিটার অতিক্রান্ত করার পর তারা রাজ্য সীমান্তের ওপারে তাদের গন্তব্যের পৌঁছে যাবে আচার্য তুলসী রিজিওনাল

ক্যান্সার ট্রিটমেন্ট এন্ড রিসার্চ সেন্টার, বিকানের, রাজস্থান এ। তারা সবাই আগত পাঞ্জাব এর মালওয়া অঞ্চল থেকে যারা জ্যের 20 টি জেলার মধ্যে 9 টি জেলা এবং 60 শতাংশ জনসংখ্যা নিয়ে গঠিত। ভাতিনদা থেকে বিকানের পর্যন্ত ট্রেনটির যাত্রী ভাড়া 210 টাকা হলেও ক্যান্সার এর রোগীদের জন্য ফ্রী। রোগীর সঙ্গে থাকা লোকেদের জন্য ভাড়ায় ছাড় থাকে 75 শতাংশ পর্যন্ত। ভাতিনদার যাত্রা পথে 26 টি স্টপেজ থেকে পাঞ্জাব এর বিভিন্ন এলাকার ক্যান্সার আক্রান্ত যাত্রীদের তুলে নেয় ট্রেনটি। এই রোগীদের মধ্যে বেশিরভাগ থাকেন আবার কৃষক। এটি একটি কঠিন কিন্তু অনিবার্য যাত্রা –আচার্য তুলসী সাশ্রয়ী মূল্যের নিকটতম সরকারি ক্যান্সার হাসপাতাল। Balwinder Singh যার অন্ন নালিতে ক্যান্সার রয়েছে তিনি বলেছেন-" আমি ভাতিনদার একটি বেসরকারি হাসপাতালে 1 লাখ টাকা ব্যয় করেছি এবং আর এটি অসমর্থ হওয়ায় বিকানের এচলে এলাম"। ম্যালওয়ার প্রাণ কেন্দ্র ভাতিনদা সবচেয়ে উন্নত জায়গার দরিদ্ররা নিজেকে বাঁচাতে অন্য একটি রাজ্যে চলে যায়। এই ট্রেন এ প্রতিদিন 70 জন ক্যান্সাররোগী ভ্রমন করেন ভাতিনদা থেকে যার জন্য এই ট্রেন এর নাম হয়েছে "ক্যান্সার এক্সপ্রেস" এবং এই অঞ্চল এর নাম হয়েছে "ক্যান্সারবেল্ট"। Post Graduate Institute of Medical Education and Research (PGIMER), Chandigarh এর দ্বারা করা একটি মহামারি বিজ্ঞানের গবেষণায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে অনন্যা অঞ্চল থেকে ভাতিনদা অঞ্চল এক্যান্সার এর প্রকোপ বেশি। ক্যান্সারএ মৃত্যুর সংখ্যা ছিল প্রতিলাখ এ 51 Talwandi Sabo (Bathinda) তুলনামূলকভাবে প্রতিলাখ এ 30 মালওয়া এর বাইরের জেলাগুলোতে। 1960 এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে যে সবুজবিপ্লব এর সূচনা হয়েছিল তা পাঞ্জাবকে "ভারতের রুটির ঝুড়ি" তে পরিণত করেছিল। অনন্যা রাজ্যের ঘাটতিপূর্ণ অঞ্চল এ খাদ্যশস্য এর 95 শতাংশ সরবরাহ করে পাঞ্জাব। কিন্তু এই সুফল ভোগ করতে গিয়ে অধিকাংশ এলাকায় জলে uranium সঞ্চিত হয়েছে এবং রাসায়নিক সার ও কীটনাশক প্রয়োগ এর ফলে ক্যান্সার রোগীর সংখ্যা অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

The cancer train

চিত্র –৫ ক্যান্সার ট্রেন

ক্যান্সার এর পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধির কারন:

(১) 2015 সালে ভর্তি পুরুষ ক্যান্সার রোগীর মধ্যে কৃষকদের সংখ্যা ছিল 60 শতাংশ। এরপর থেকে প্রতিবছর কৃষকদের ক্যান্সার আক্রান্তের সংখ্যা উর্ধ্বমুখী হতে দেখা যাচ্ছে।

(২) ভারতে সরাসরি ক্যান্সার এর বিষয়ে কোনো সেই ভাবে গবেষণানেই। কিন্তু কৃষকদের আর্থসামাজিক অবস্থা খারাপ হওয়ার কারণে খুব দেরিতে তাদের ক্যান্সার শনাক্ত হয়।

(৩) কৃষকরা খালি পায়ে, খালি গায়ে, হাত লাগিয়ে মাটি ও জলের মধ্যে কাজ করে। জমিতে যে কীটনাশক তারা দেয়- সেটির নিয়মিত সংস্পর্শে আসা একটি কারণ হতে পারে।

(৪) জলে কারখানায় রাসায়নিক দূষণ এখন অনেক বেশি। তার সাথে যখন কীটও আগাছা নাশক মিশে যাচ্ছে তখন তা আরো বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। তারা সংস্পর্শেও অনেক বেশি আসছেন কৃষকরা।

(৫) যখন অল্প জায়গায় সবজি লাগাই তখন নিমপাতা সেদ্ধ করে জল ছটায়। কিন্তু যখন 5-6 বিঘা জমিতে চাষ করে তখন তা সম্ভবপর হয় না। তখন কীটনাশক প্রয়োগ না করে উপায় থাকে না, তখন কীটনাশক প্রয়োগ করতেই হয়।

(৬) যারা মজুর হিসেবে জমিতে কাজ করছেন, তাদের কে মালিক কোন ধরনের সুরক্ষা সামগ্রী সরবরাহ করেন না, তাছাড়া তাদের দৈনিক আয় 200-300 টাকা হওয়ায় তাদের পক্ষে নিজের জীবন ধারণ করে মাস্ক, গ্লাভস, পায়ে রাবারের জুতা পড়া সম্ভবপর হয় না।

(৭) কৃষকরা রাসায়নিক নিরাপদ পরিমানের চাইতে বেশি ব্যবহার করছেন এবং নিজেদের সুরক্ষার ব্যাপারে তাদের কাছে তেমন কোনো তথ্য থাকে না। কৃষক যাচ্ছে কীটনাশকের দোকানে, বিক্রেতা যখন যেটার সুবিধা পায় সেটার ক্যাম্পাইন করে, সেটাই কৃষকের কাছে বিক্রি করে। দেখা যাচ্ছে এক ধরনের পোকা মারার জন্য সে 3-4 টা কোম্পানির এক ইফ্যামিলির কীটনাশক প্রয়োগ করছে। ফলে তাদের মধ্যে রোগের প্রবণতা বাড়ছে।

(৮) বেশিরভাগ কৃষকরা বলেন যে, যেদিন তারা জমিতে কীটনাশকদেন- সেদিন তাদের শরীরে বিভিন্ন সমস্যা হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে কীটনাশকের ফলে কৃষকরা মারাত্মক রোগ এ আক্রান্ত হয়।

রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার এ সতর্কতা :

(১) রাসায়নিক সার বা কীটনাশক ব্যবহারের সময় মুখে মাস্ক ব্যবহার ও শরীরের অন্যন্যা অংশেও কীটনাশকের অনুপ্রবেশ রোধের প্রতিরোধক ব্যবস্থা করতে হবে।

(২) এছাড়া বাতাসের উল্টো দিকে তা প্রয়োগ করা যাবে না। কিন্তু সিংহভাগ কৃষকই এই সব পরামর্শ মানছেন না। এটা মানতে হবে ঠিকঠাক।

(৩) অতিরিক্ত কীটনাশক ও রাসায়নিক সার এর পরিবর্তে অন্য কোনো বিকল্প ব্যবহার এর পথ অবলম্বন করতে হবে, যাতে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায় কিন্তু পরিবেশ তথা মানুষেরও কোনো ক্ষতি না হয়।

উপসংহার:

বিজ্ঞান যখন মানব সভ্যতার সুস্থ জীবনযাত্রার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, জীবনের শান্তিকে শেষ করে নিয়ে আসে মৃত্যু আর ধ্বংসলীলা, সুস্থ পরিবেশকে করে তোলে বিষাক্ত তখনই বিজ্ঞানকে আমরা অভিশাপ বলে ঘোষণা করি। বিজ্ঞান হলো মানব জাতির হাতিয়ার। হাতিয়ারের ব্যবহার করে ভালো ও খারাপ দুই কাজই করা যায়। আসলে এটা নির্ভর করে প্রয়োগ কর্তার মনোভাবের উপরে। তাই বিজ্ঞানকে অহেতুক দোষ দিয়ে কোনো লাভ নেই, আমাদের মনোভাবের পরিবর্তন করতে হবে। সবুজ বিপ্লব এর আশীর্বাদ গ্রহণ করার সাথে সাথে মানুষের জীবনকে ও মূল্য দিতে হবে তবেই সবুজবিপ্লব এর সাফল্যের স্বাদ আস্বাদন এর সাথে সাথে টেকসই কৃষিরও বিকাশকে পৃথিবীর দরবারে পৌঁছে দেওয়া সম্ভবপর হবে। সেদিনই **"Food Bowl"** এর বিকাশ হবে কিন্তু **"Cancer Bowl"** এর বিকাশ হবে না।

চিত্র- ৬ Acharya Tulsi Shanti Prathisthan এবং Acharya Tulsi Regional Cancer Hospital & Research Centre, Bikaner

GEO-TALK
A Journal of Man and Environment
Journal available at: http://www.hbcnht.edu.in/college_magazine.php

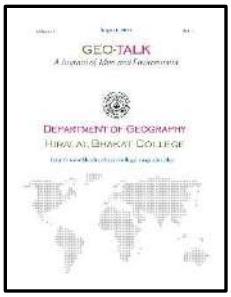

সমাজের বিবর্তন

অনুসূয়া বসু*

Semester-II, Department of Geography, Hiralal Bhakat College, Nalhati, Birbhum

ARTICLE INFO

Keywords:
কৃষিভিত্তিক সমাজ
চার্লস ডারউইন
নীলনদ অববাহিকা
নগর সমাজ

Article history

Received: 8th July, 2021
Revised: 30th July, 2021
Accepted: 12th August, 2021
© ***Dept. of Geography Hiralal Bhakat College***

ABSTRACT

আদিমকাল থেকে মানব সমাজ বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে বর্তমান সমাজে উপনীত হয়েছে। বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের বিশ্লেষণ থেকে জানা যায় যে মানুষের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং মানব অভিযোজন এর ফলে সমাজ বিবর্তিত হয়েছে। শিকারি ও সংগ্রহ ভিত্তিক সমাজ থেকে ধীরে ধীরে শিল্প সমাজ ও নগর সমাজ এ উপনীত হয়েছে মানবজাতি।

ভূমিকা

বিবর্তন এর ইংরেজি প্রতিশব্দ "এভলিউশন" কথাটি ল্যাটিন শব্দ "ইভোলভেরা "থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ উন্মোচন বা বিকাশ সাধন। পরিবর্তনশীলতাই সমাজের প্রত্যাশিত লক্ষ্য। সমাজ প্রতিনিয়ত বিবর্তন, উন্নয়ন ও প্রগতির মাধ্যমে পরিবর্তিত হচ্ছে । মানব ইতিহাসের আদিম অবস্থা থেকে ক্রমান্বয়ে সভ্য মানুষের রূপান্তরিত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপে ছিল সমাজ গঠন। সমাজ গঠনের মধ্য দিয়ে আদিম বর্বর জীবন থেকে মুক্তি লাভ করে এবং স্থিতিশীল ও জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়।

*Corresponding author
E-mail address: anusuyabasu2@gmail.com

পটভূমি

আদিমকাল থেকে মানব সমাজ বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে বর্তমান সমাজে উপনীত হওয়া সত্ত্বেও এই সম্পর্কে আলোচনা খুব সাম্প্রতিককালেই করা হয়েছে।

বিখ্যাত প্রাণী তত্ত্ববিদ চার্লস ডারউইন ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে তার "অরিজিন অফ দা স্পিসিস" গ্রন্থে প্রাণিজগতের বিকাশের কথা বলেছিলেন। ডারউইনের বক্তব্যকে সামনে রেখে Ladwing Gumplowicz মানব সমাজের বিবর্তন এর উপর আলোকপাত করেন।

জার্মান দার্শনিক কার্ল মার্কস এর মতে সমাজ আদিম সাম্যবাদী সমাজ থেকে দাস সমাজ ও সামন্তবাদের মধ্য দিয়ে,

পুঁজিবাদে বিবর্তিত হয়েছে এবং যার সর্বশেষ পর্যায় হলো আধুনিক সাম্যবাদী সমাজ। এছাড়াও প্রমূখ বিজ্ঞানীগণ এই নিয়ে মতাদর্শন করেন।

উপরিউক্ত বক্তব্যে প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, মানুষের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং মানব অভিযোজন এর ফলস্বরূপ সমাজ বিবর্তিত হয়েছে। এর একটি নির্দিষ্ট ক্রমান্বয় দেখা যায়। যেমন-
শিকারি ও সংগ্রহ ভিত্তিক সমাজ - পশুপালক যাযাবর বৃত্তি সমাজ - কৃষিভিত্তিক সমাজ - শিল্পভিত্তিক আধুনিক সমাজ - আধুনিক নগরীও সমাজ

এছাড়াও এই সমাজ গুলির ভেতরেও বিভিন্ন ধরনের সমাজের উদ্ভব হয় যেমন সভ্যতার ভিত্তিতে আদিম সমাজের ও সুসভ্য সমাজ এবং নিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ এবং মাতৃতান্ত্রিক সমাজ।

শিকারি ও সংগ্রহ ভিত্তিক সমাজ

মানুষ তার খাদ্য সংগ্রাহক জীবনের মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকার জন্য যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল, তাকে বলা হয় শিকারী জীবন। প্রথমদিকে মানুষ গাছের ডাল পাথর ইট হিংস্র পশুর দিকে ছুড়ে মারতো আত্মরক্ষার জন্য। পরবর্তীকালে যখন তারা পশুর মাংস খেতে শিখলো তখন থেকেই তারা শিকার করতে শেখে

আজ থেকে মাত্র 1 লক্ষ কুড়ি হাজার বছর আগে আদিম মানুষ শিকারী জীবন আয়ত্ত করে। প্যালিওলিথিক পর্ব ছিল শিকারি জীবনের মূখ্য সূচনাকাল।

বৈশিষ্ট্য

(১) শিকারি জীবনের বৈশিষ্ট্য গুলি হল
(২) এই সময়কালের মৌলিক নীতি ছিল সংঘবদ্ধতা এবং আত্মরক্ষার দ্বারা যোগ্যতমের টিকে থাকা।

(৩) শিকারি জীবনে মানুষ তার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে নিজেদের আত্মরক্ষা করত। তেমনি নিজেদের খাদ্যের জন্য বিভিন্ন পশুদের শিকার করে আহার করত।

(৪) তৎকালীন সময়ে মানুষ গুহা কে বেশি পছন্দ করত তাদের বাসস্থানের জন্য এবং অনেক সময় জলের জন্য নদী তীরবর্তী অঞ্চল কে বেছে নিত।

(৫) সেই সময় মানুষ আত্মরক্ষা ও স্বীকারের প্রয়োজনে গাছের ডাল ও পাথরকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতো।

পশুপালক যাযাবর বৃত্তি

মানব সভ্যতার মধ্যবর্তী পর্যায়ে আদিম মানব পৃথিবীর কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানে বসবাস না করে পশুপালন ও পশুকে পোষ মানাতে তাদের জীবন এক স্থান থেকে অন্য স্থানে অতিবাহিত করেছে ,একেই বলা হয় যাযাবর বৃত্তি।
এর সময়কাল ছিল আজ থেকে প্রায় 14 হাজার বছর পূর্বে।

বৈশিষ্ট্য

আদিম সমাজে মানুষ নিজেদের খাদ্যের রসদ পূরণ করার জন্যই পশুদের ধরে নিজেদের বাসস্থানে প্রতিপালন করত। যেমন-মহিষ ইয়াক শুকর বলগা হরিণ এছাড়া কোন কোন পশু মানুষের সঙ্গে একই গ্রহে বসবাস করত। যেমন-কুকুর বিড়াল ইত্যাদি। এবং কিছু কিছু পশু ভর বাহক রূপে ব্যবহৃত হতো ,যেমন- ঘোড়া গাধা উট প্রভৃতি।
তৎকালীন সময়ে খাদ্যের অভাবে মানুষ এক স্থানে বসবাস করত না যেখানে যেখানে খাদ্যের সংগ্রহ পেত সেই স্থানে গিয়ে বসবাস করতে শুরু করতো।
সেই সময় মানুষ চারণভূমির কাছাকাছি নদী তীরবর্তী কিংবা কোনো পাহাড়ি ঝর্ণার কাছে বসবাস করত।
ঋতু পরিবর্তনের জন্য এবং জলবায়ুর কারণেও তাদের নিজেদের বাসস্থানের ত্যাগ করতে হত এবং অন্য স্থানে বসবাস করার জন্য যেত।

কৃষিজাত সমাজ

মানব জীবনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো কৃষিকাজ। এটি আদিমতম পেশা।
আনুমানিক 10 হাজার থেকে 12 হাজার বছর পূর্বে নব্য প্রস্তর যুগে মিশরের নীলনদ অববাহিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকার মেক্সিকো থেকে পেরু পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় প্রথম কৃষি কাজের উৎপত্তি ঘটে।

বৈশিষ্ট্য

মানুষের কৃষিজাত সমাজ অত্যন্ত সরল প্রকৃতির। এই সমাজের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে মানুষের মধ্যে মূল্যবোধ জাগ্রত হয়।
কৃষি কাজের মধ্য দিয়ে মানুষ অযথাই জীবন থেকে স্থায়ীভাবে বসবাসের সক্ষম হয়।

শিল্প সমাজ

মানব সমাজের একটি যুগান্তকারী দিক হলো শিল্প সমাজ। এটি কৃষি সমাজের বহু পরে গড়ে উঠলেও এর সামাজিক পরিমণ্ডল,

অর্থনৈতিক কাঠামো, উৎপাদন পদ্ধতি, প্রভৃতি বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

১৭৫০ থেকে ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দকে সমগ্র পৃথিবীতে শিল্প সমাজ বিকাশের সময়কাল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

বৈশিষ্ট্য

এই শিল্পে উৎপাদন বৃহদায়তনে হয়ে থাকে। বড় বড় কলকারখানা নিগাম গড়ে ওঠে।

বড় শিল্পকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের কুটির শিল্প গড়ে ওঠে।

এই শিল্প উৎপাদনে বিভিন্ন ধারা পরিলক্ষিত হয়।

বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রাংশ ব্যবহৃত হয়। বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালনা মালিকদের হাতে থাকে। অনেক সময় দেখা গিয়েছে যে বড় বড় কোম্পানি তাদের শেয়ার বিক্রি করেছে।

নারীর স্বাধীনতা শিল্প সমাজের এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

নগর সমাজ

মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক যুগান্তকারী পরিবর্তিত গতিশীল ও আধুনিক সমাজ হলো নগর সমাজ। নগর সমাজ এলো এক সচ্ছল গতিময় পরিবর্তনশীল আধুনিক জীবনযাপনের সুপষ্ট দৃষ্টান্ত।

বৈশিষ্ট্য

নগর সমাজ প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে যথেষ্ট উন্নত এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে থাকে।

নগর সমাজ-সভ্যতার দিক থেকে অত্যন্ত গতিশীল প্রকৃতির।

প্রতিটি নগর সময়ের নিরিখে ক্রমঃবিবর্তিত হয়।

এছাড়াও বিভিন্ন রকম ভাবে একটি সমাজের পরিবর্তন সাধিত হয়। যেমন - ভৌগলিক অবস্থান পরিবর্তন, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, সামাজিক আন্দোলন উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন, শিক্ষার প্রসার রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন, ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রচার-প্রসার ,যাতায়াত ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়ন উন্নয়ন ইত্যাদি কারণেও সমাজের পরিবর্তন ঘটে।

মন্তব্য

উপরে উল্লিখিত আলোচনার মধ্য দিয়ে বোঝা যাচ্ছে যে, প্রতিটি সমাজেই একটি সুনির্দিষ্ট ধারাবাহিকতা কাজ করে। প্রতিটি সমাজেরই এখন ধীরে ধীরে সাম্প্রতিক পরিবর্তন ঘটেছে আগের তুলনায় অনেক উন্নত। এই পরিবর্তনই সমাজকে একটি সহজাত গতি প্রদান করে ।তবে সামাজিক কাঠামোতে রূপান্তর বা পরিবর্তন সাধিত হলে তাকে সামাজিক পরিবর্তন বলে এই ভাবেই রূপান্তরের মাধ্যমে বিশ্বের প্রতিটি সমাজ আরো উন্নত ও আধুনিকতর হয়ে উঠেছে এবং পরবর্তীকালে আরো উন্নত হবে।

GEO-TALK
A Journal of Man and Environment
Journal available at: http://www.hbcnht.edu.in/college_magazine.php

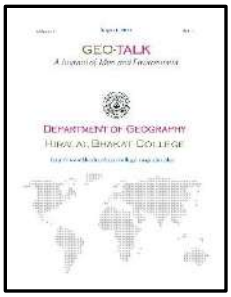

মানুষের বিবর্তন

আকাশ ভকত*

Semester-II, Department of Geography, Hiralal Bhakat College, Nalhati, Birbhum

ARTICLE INFO

Keywords:
গোরিলা
পূর্ব আফ্রিকা
রামাপিথিকাস
পিকিং

Article history

Received: 8th July, 2021
Revised: 30th July, 2021
Accepted: 12th August, 2021
© ***Dept. of Geography Hiralal Bhakat College***

ABSTRACT

পৃথিবীতে কোথায় কিভাবে মানুষের আবির্ভাব ঘটেছিল এই সম্পর্কে ভৌগোলিক দের দুটি মতবাদ হল-ধর্মীয় মতবাদ এবং বৈজ্ঞানিক মতবাদ। মানুষের বিবর্তন সম্পর্কে চার্লস ডারউইন চারটি ধাপ বা পর্যায় এর কথা বলেছেন।

ভূমিকা

আজ থেকে প্রায় 4.6 বিলিয়ন বছর আগে আমাদের এই পৃথিবীর সূচনা হয়েছিল। বর্তমানে সমগ্র পৃথিবীর প্রায় বিভিন্ন জায়গা জুড়ে আমরা যে মানুষদের বসবাস করতে দেখি, সেই মানুষের পূর্বপুরুষদের আবির্ভাব হয় আজ থেকে প্রায় তিন কোটি বছর আগে। সেই প্রাচীনকাল থেকে আজ বর্তমান সময় পর্যন্ত মানুষের বিবর্তনের একটি ধারা ক্রমাগত লক্ষ্য করা যায়। মানুষের বিবর্তনের এই ধারাকেই আমরা বলে থাকি 'Evolution of Humans'।

মানুষ শব্দটির অর্থ

মানুষ শব্দটি মান এবং হুস এই দুটি শব্দ মিলিত হয়ে গঠিত হয়েছে। মান শব্দটির অর্থ আত্মসম্মান এবং হুস শব্দটির দ্বারা বিবেকবোধকে বোঝায়। মানুষের বিজ্ঞানসম্মত নাম হল - হোমো স্যাপিয়েন্স (Homo sapiens)। এটি একটি ল্যাটিন শব্দ, এই শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হলো চিন্তাশীল মানুষ বা জ্ঞানী মানুষ।

মানুষ কাকে বলে?

এই প্রশ্নের উত্তর বিভিন্ন ভৌগলিক এবং বিজ্ঞানীরা বিভিন্নভাবে দিয়ে থাকেন। কেউ কেউ বলেন, যার মধ্যে কিছু বিমূর্ত সত্বা বিদ্যমান আছে এবং অহংঙ্কার বিদ্বেষ, ঘৃণা ,কৃতজ্ঞতা ,সুশিলতা ,সৃষ্টিশীলতা লোভ-লালসা, হিংসা, পরোপকারিতা ,স্বার্থপরতা ইত্যাদি গুণাবলী গুলি লুকায়িত আছে, এবং এই সমস্ত গুণাবলী গুলি পরিচালিত করে যে অন্যান্য প্রাণীদের থেকে নিজেকে পৃথক করতে সক্ষম হয়, এবং

*Corresponding author
E-mail address: akashbhakat7477@gmail.com

যে অন্যান্য সমস্ত জীবের চূড়ান্ত ঊর্ধ্বে অবস্থান করে সেই হল মানুষ।

আবার কারো কারো মতে, মান + হুস = মানুষ। মানুষ হতে গেলে নিজের আত্মসম্মানবোধ থাকতে হবে, এবং ভালো-মন্দ কে আলাদা করার মতো হুস থাকতে হবে, তবেই তাকে মানুষ বলে গণ্য করা হবে।

আবার কেউ কেউ বলেন -

"প্রাণ থাকলে প্রাণী হওয়া যায়।
কিন্তু মন থাকলে মানুষ হওয়া যায় না।
আবার দুটো পা থাকলেও সে মানুষ না ।
প্রকৃত মানুষ তিনিই যার মধ্যে মনুষত্ব নামের
গুণাবলী বিদ্যামান। "

মানুষের আবির্ভাব

এই পৃথিবীতে কোথায় কখন কিভাবে মানুষের আবির্ভাব ঘটেছিল এই সম্পর্কে ভৌগোলিকদের বিভিন্ন ধরনের মতবাদ রয়েছে, এরকম দুটি মতবাদ হল - (ক) ধর্মীয় মতবাদ (খ) বৈজ্ঞানিক মতবাদ।

ধর্মীয় মতবাদ -এ বিভিন্ন ধর্মের (হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান, শিখ) ধর্মগ্রন্থে বলা হয়েছে, এই পৃথিবীতে দৈ বিক শক্তির মাধ্যমে সর্বপ্রথম কোনো একজন নর এবং একজন নারীর আবির্ভাব ঘটেছে, এবং সেখান থেকে পরবর্তীকালে মানুষের আবির্ভাব হয়। অপরদিকে বৈজ্ঞানিক মতবাদেও বিভিন্ন বিজ্ঞানীরা মানুষের আবির্ভাব সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তবে বৈজ্ঞানিক মতবাদে চার্লস ডারউইনের মতবাদ অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন চার প্রকার নরবানর গোষ্ঠী থেকে এই পৃথিবীতে চার প্রকার মানব গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে।

মানুষের উদ্ভব সম্পর্কে এরকম আরো দুটি তত্ব রয়েছে, যথা - (১) বহু উৎস তত্ব, (২) একক উৎস তত্ব।

যে সমস্ত ভৌগোলিকরা পরিবেশের থেকে বংশগতির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন, বহু উৎস তত্বে তারা বলেন - প্রধান প্রধান নরবানর গোষ্ঠীগুলি তাদের ভিন্ন ভিন্ন পূর্বপুরুষ থেকে আগত, এবং পরবর্তীকালে এই প্রধান প্রধান নরবানর গোষ্ঠীগুলি থেকে মানুষের আবির্ভাব ঘটে।

যে সমস্ত ভৌগোলিকরা বংশগতির থেকে পরিবেশের উপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন, একক উৎস তত্বে তারা বলেন - সমস্ত নরবানর গোষ্ঠী গুলি একিই প্রকার পূর্বপুরুষ থেকে আগত।

মানুষের আবির্ভাব সম্পর্কে বিভিন্ন ভৌগোলিক দের মতবাদ

মানুষের আবির্ভাব কিভাবে হয়েছিল ? - এই সম্পর্কে বেশ কয়েকজন ভৌগোলিক তাদের নিজ নিজ মতবাদ পোষণ করেছিলেন। সেগুলি হল -

চার্লস ডারউইন তার নিজের লেখা বই - "মানুষের অবতরণ "(‘***The Descent of Man’***) -এ বলেন চারপ্রকার নরবানরগোষ্ঠী,

যথা - গিবস, ওরাংওটাং,শিম্পাঞ্জি,গোরিলা থেকে পৃথিবীতে চার প্রকার মানব গোষ্ঠীর আবির্ভাব হয়। এই চার প্রকার মানবগোষ্ঠী গুলি হল - ককেশীয় বা শ্বেতাঙ্গ, নিগ্রো, অস্ট্রেলিয়, মঙ্গোলীয়।

মানুষের আবির্ভাব সম্পর্কে বিখ্যাত ভূগোলবিদ মাজীদ হাসান বলেন - ***"The origin of Race is a subject thought with controversy. In general, one encounters two contrasing schools of thought’’.***

মানুষের বিবর্তন

সেই প্রাচীনকাল থেকে আজ বর্তমান কাল পর্যন্ত মানুষের বিবর্তনের একটি ধারা লক্ষ্য করা যায় । মানুষের বিবর্তনের এই ধারাকে বিভিন্ন ভৌগোলিক রা বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, চার্লস ডারউইন এর মতে চার প্রকার নরবানর গোষ্ঠী, পরবর্তীকালে বিবর্তিত হয়ে চার প্রকার মানবগোষ্ঠীতে রূপান্তরিত হয়। ডারউইন যে চার প্রকার নরবানর গোষ্ঠী থেকে চার প্রকার মানব গোষ্ঠীর আবির্ভাবের কথা বলেন, তা অত্যন্ত ধীরে ধীরে ঘটে এবং তিনি এটিকে ধাপের মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করেন। মানব গোষ্ঠীর এই বিবর্তন বা পরিবর্তনকে ডারউইন যে চারটি ধাপের মাধ্যমে দেখিয়েছিলেন, সেগুলি হল -

কিন্তু অপর দিকে অনেক ভৌগোলিক ডারউইনের এই ধারণার পরিবর্তে বলেন - মানুষের প্রথম পূর্বপুরুষের নাম হল - অস্ট্রেলোপিথিকাস আফেরেন্সিস, এই পূর্বপুরুষ ধীরে ধীরে সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে হোমো হ্যাবিলিস নামক পুরুষে বিবর্তিত হয়, এবং এরপর হোমো ইরেক্টাস, হোমো নিয়ান্ডারথ্যালেনসিস, এবং সবশেষে হোমো স্যাপিয়েন্স নামক পুরুষে বিবর্তিত হয় এবং এই হোমো স্যাপিয়েন্স নামক পুরুষ থেকেই মর্ডান ম্যান বা আধুনিক মানুষের সৃষ্টি। মানুষের বিবর্তন সম্পর্কে চার্লস ডারউইন যে চারটি ধাপ বা পর্যায়ের কথা বলেন, সেগুলি হল - অস্ট্রেলোপিথিকাস, পিথিকানথ্রোপাস, নিয়ানডারথাল,ক্রো - ম্যাগনন্। এই ধাপের বা এই পর্যায়ের নরবানর গুলির কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো -

(১) অস্ট্রেলোপিথিকাস পর্যায়

এই ধাপে বা এই পর্যায়ে ডারউইন যে নরবানর গুলিকে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন তাদের জীবনের যাত্রাপথ এবং বৈশিষ্ট্য গুলি হল:-

এই পর্যায়ে নরবানর গুলি চার পায়ে ভর দিয়ে হাঁটা চলা করতো। এই পর্যায়ে নরবানর গুলি অন্যান্য নরবানরদের তুলনায় বুদ্ধিমান ছিল এবং এরা গাছের ফলমূল খেয়ে বেঁচে থাকতো এবং একসাথে দলবদ্ধভাবে ঘুরে বেড়াতো। এই পর্যায়ে নর বানরগুলোর উচ্চতা ছিল 120 থেকে 150 সেন্টিমিটার। এই পর্যায়ের সমগ্র নরবানর গুলিকে বৈজ্ঞানিকরা সম্মিলিতভাবে প্রাইমেট নামে অভিহিত করেছিলেন ।অর্থাৎ এই পর্যায়ে নরবানর গুলিকে এককথায় প্রাইমেট বলা হত। এই প্রাইমেট গুলিকে বা এই পর্যায়ের নরবানর গুলিকে আবার চারটি ভাগে ভাগ করা হয়, যথা -
(ক) ড্রাইওপিথিকাস, (খ) রামাপিথিকাস, (গ) অস্ট্রেলোপিথিকাস - আফ্রিকানাস, (ঘ) অস্ট্রেলোপিথিকাস - রোবাসটাস।

(ক) ড্রাইওপিথিকাস

ডারউইনের মতে এই ড্রাইওপিথিকাস নামক বানর গুলি ছিল মানুষের প্রাচীনতম পূর্বপুরুষ। এই বানর গুলি 2 কোটি 50 লক্ষ বছর পূর্বে পূর্ব আফ্রিকায় বসবাস করতো। এই বানর গুলির বৈশিষ্ট্য হলো, - এদের মস্তিষ্কের ধারণ ক্ষমতা ছিল ২০ ঘন. সেন্টিমিটার।

(খ) রামাপিথিকাস

এই বানর গুলির আবির্ভাব ঘটেছিল 1 কোটি 50 লক্ষ বছর পূর্বে। আবির্ভাব ঠিক নয়, তবে পূর্ববর্তী বানর গুলি নির্দিষ্ট সময়ের পরিসরে যে বানরে পরিবর্তিত হয় তাকে রামাপিথেকাস বলে। এই বানরগুলোর মস্তিষ্কের ধারণ ক্ষমতা ড্রাইওপিথিকাস নামক বানরগুলির তুলনায় কিছুটা বেশি ছিল। এদের মধ্যে কে ধারণ ক্ষমতা ছিল 40 ঘন. সেন্টিমিটার।

(গ) অস্ট্রেলোপিথিকাস - আফ্রিকানাস

এই বানর গুলি আজ থেকে প্রায় 25 লক্ষ বছর পূর্বে পূর্ব আফ্রিকায় বসবাস করতো।এই বানরগুলির মস্তিষ্কে ধারণ ক্ষমতা ছিলো পূর্ববর্তী সমস্ত বানরদের তুলনায় অনেক বেশি।এদের মস্তিষ্কের ধারণ ক্ষমতা ছিল 500 ঘন. সেন্টিমিটার। এই বানরগুলির মস্তিষ্কের ধারণ ক্ষমতা দেখে অনুমান করা যায় যে, এরা নিজেদের বুদ্ধিতে কাজে লাগাতে শেখে এবং এদের জ্ঞান-বুদ্ধির ক্রমশ বিকাশ ঘটতে থাকে।

(ঘ) অস্ট্রেলোপিথিকাস - রোবাসটাস

এই বানর গুলি আজ থেকে প্রায় 20 লক্ষ বছর পূর্বে দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাস করতো, অর্থাৎ পূর্ববর্তী বানর গুলি থেকে এই বানর গুলি পরিবর্তিত হয়ে আসে নির্দিষ্ট সময়ের পরিসরে। এই বানর গুলির মস্তিষ্কের ধারণ ক্ষমতা ছিল 700 ঘন. সেন্টিমিটার।

(২) পিথিকানথ্রোপাস পর্যায়

ডারউইন প্রবর্তিত চারটি ধাপ বা পর্যায়ের মধ্যে দ্বিতীয় পর্যায়ের নাম হল - পিথিকানথ্রোপাস। এই পর্যায়ের নরবানর গুলির যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য গুলি আমরা দেখতে পাই,সেগুলি হল - এই পর্যায়ের নরবানর গুলি সামনের দুটি পা উচু করে, শুধুমাত্র পেছনের দুটি পায়ে ভর দিয়ে হাঁটতে শুরু করা শেখে, তবে এরা সামনের দিকে একটু কুঁজো হয়ে হাটে। এই পর্যায়ের সমগ্র নরবানর গুলিকে বৈজ্ঞানিকরা সম্মিলিতভাবে হোমিনিড নামে অভিহিত করেন। অবস্থানের ভিত্তিতে এই হোমিনিডদের আবার দুটি ভাগে ভাগ করা হয়,যথা - (i) পিকিং মানব, এবং (ii) জাভা মানব।

(i) পিকিং মানব:- আজ থেকে 15 লক্ষ বছর পূর্বে চীনের পিকিং এ যে সমস্ত নরবানর গুলি বসবাস করতো তাদের বলা হত পিকিং মানব। এদের মস্তিষ্কের ধারণ ক্ষমতা ছিল 1000 ঘন. সেন্টিমিটার।

(ii) জাভা মানব:- সুমাত্রা ও জাভা দ্বীপপুঞ্জে যে সমস্ত হোমিনিডরা বা নরবানর গুলি বসবাস করতো তাদের বলা হতো জাভা মানব। এদের মস্তিষ্কের ধারণ ক্ষমতা ছিল 800 ঘন. সেন্টিমিটার।

(৩) নিয়ানডারথাল পর্যায়

ডারউইন প্রবর্তিত চারটি পর্যায়ের অন্তর্গত তৃতীয় পর্যায়টি হল - নিয়ানডারথাল পর্যায়। এই পর্যায়ের নরবানর গুলির বৈশিষ্ট্য হলো - এই পর্যায়ের নরবানর গুলি দুই পায়ের উপর ভর দিয়ে মেরুদন্ড সোজা করে হাঁটতে পারতো। এই পর্যায়ে নরবানর গুলির মস্তিষ্কের ধারণ ক্ষমতা ছিল 1300 থেকে 1500 ঘন. সেন্টিমিটার।এই পর্যায়ের নরবানর গুলি প্রায় 5 থেকে 10 লক্ষ বছর পূর্বে ইউরোপ এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে বসবাস করতো।এ পর্যায়ের নরবানরগুলির উচ্চতা ছিল 5 ফুট 2 ইঞ্চি। মস্তিষ্কের ভিত্তিতে এই পর্যায়ের নরবানর গুলির সঙ্গে আধুনিক মানুষের অনেক সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

(৪) হোমো - ম্যাগনন্ পর্যায়

মানুষের বিবর্তনকে, অর্থাৎ মানব বিবর্তনকে চার্লস ডারউইন যে চারটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে দেখানোর চেষ্টা করেন,তার মধ্যে সর্বশেষ পর্যায় হলো হোমো - ম্যাগনন্ পর্যায়। বর্তমান সমাজের যে আধুনিক মানুষ বা (Modern Man) - তা এই পর্যায়ের

নরগোষ্ঠী থেকে পরবর্তীকালে বিবর্তিত হয়ে আসে। আজ থেকে প্রায় 30 হাজার বছর আগে এই পর্যায়ের নরবানর গুলির আবির্ভাব ঘটে। ফ্রান্সের স্রো - ম্যাগনন্ নামক শহরে এই পর্যায়ের নরবানর গুলির কঙ্কাল (Skeleton) প্রথম পাওয়া গিয়েছিলো। তবে পরে আরো অন্যান্য জায়গাতেও পাওয়া যায়। এই পর্যায়ের নরবানর গুলির যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য গুলি দেখতে পাওয়া যায় সেগুলি হল - এই পর্যায়ের নরবানর গুলির উচ্চতা ছিল 5 ফুট 11 ইঞ্চি। এই পর্যায়ে নরবানর গুলির মস্তিষ্কের ধারণ ক্ষমতা ছিল 2000 ঘন. সেন্টিমিটার। যেহেতু, এই পর্যায়ের নরবানর গুলির মস্তিষ্কের ধারণ ক্ষমতা অন্যান্য সমস্ত নরবানর গুলির তুলনায় অনেক বেশি ছিল, সেহেতু এরা অন্যান্য নরবানর গুলির তুলনায় বেশি বুদ্ধিমান ছিল। এই পর্যায়ে নরবানর গুলি গুহায় ছবি আঁকা, অস্ত্রের ব্যবহার, শিকরা করা ইত্যাদি কাজগুলো করতো। এইভাবে উপরিউক্ত চারটি পর্যায়ে মধ্য দিয়ে ডারউইন মানুষের বিবর্তনের ইতিহাসকে তুলে ধরার চেষ্টা করেন। তবে প্রত্যেকটি ধারণার যেমন প্রশংসিত দিক রয়েছে, ঠিক তেমনি কিছু মন্দ দিক ও রয়েছে। ডারউইনের প্রবর্তিত উপরিউক্ত পর্যায়গুলির মধ্য দিয়ে মানুষের বিবর্তনের ইতিহাসকে, বেশ কিছু ভৌগোলিক অস্বীকার করেন। তবে সেক্ষেত্রে তাঁরা তাদের মতামত পোষণ করে থাকেন।

ভাবলে খুবই আশ্চর্য লাগে, বর্তমান যুগের আধুনিক মানুষই (Modern Man), বিভিন্ন স্থান থেকে পাওয়া আদিম মানুষের কঙ্কাল গুলিকে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে বিশ্লেষণ করে তখনকার দিনের মানুষের বৈশিষ্ট্যগুলিকে খুঁজে বার করেন।অর্থাৎ, এককথায় মানুষই মানুষের পূর্বপুরুষকে খুঁজে বের করেন। এবং আগামী দিনে আদিম মানুষের কঙ্কাল (Skeleton) যত বেশি খুঁজে পাওয়া যাবে ততোই তাদের জীবনধারণ সম্পর্কে আমরা জানতে পারবো এবং এই সমস্ত ধারণাগুলি আরো স্পষ্ট হবে ।

GEO-TALK
A Journal of Man and Environment
Journal available at: http://www.hbcnht.edu.in/college_magazine.php

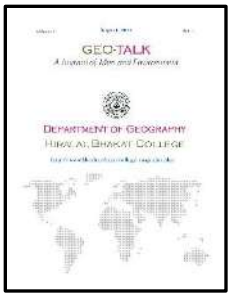

ঋতুভিত্তিক যাযাবর বৃত্তি

সুপ্রকাশ দত্ত*

Semester-II, Department of Geography, Hiralal Bhakat College, Nalhati, Birbhum

ARTICLE INFO

Keywords:
যাযাবর বৃত্তি
আলতাই পর্বত
ইরাক
আদিম জনগোষ্ঠী

Article history

Received: 8th July, 2021
Revised: 30th July, 2021
Accepted: 12th August, 2021
© Dept. of Geography Hiralal Bhakat College

ABSTRACT

ঋতুভিত্তিক তারতম্যে খাদ্যের যোগান অটুট রাখার জন্য মানুষ তাদের পশুদের নিয়ে একজায়গা থেকে অন্যজায়গায় বিচরণ করে। ঋতুভিত্তিক যাযাবর বৃত্তিতে দুইধরণের পরিব্রাজন ঘটে, যথা- আনুভূমিক পরিব্রাজন এবং উল্লম্ব পরিব্রাজন। আনুভূমিক পরিব্রাজন এর মধ্যে আবার বসন্ত কালীন, গ্রীষ্ম কালীন, শীতকালীন পরিব্রাজন অন্তভুক্ত।

ভূমিকা

আমরা প্রত্যেকেই জানি মানব জীবন সৃষ্টির পর থেকেই মানুষ দলবদ্ধভাবে বসবাস করত না। খাদ্যের চাহিদা, আত্মরক্ষার চাহিদায় ও শিকার করার প্রবণতায় মানুষ দলবদ্ধ ভাবে একত্রে বসবাস শুরু করে। মানুষের যে প্রাচীন জীবনযাত্রা, পৃথিবীর কোন একটি স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস না করে, বন্য পশুকে পোষ মানিয়ে ও পশু পালনের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে।

প্রাচীন যুগে মানুষ যখন একত্রে গোষ্ঠীবদ্ধভাবে তাদের পোষ্য প্রাণীদের নিয়ে বসবাস শুরু করত, তখন তারা বুঝতে পারল যে কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানে বসবাস করলে তাদের প্রত্যেকের খাদ্যের চাহিদা পূরণ হবে না। খাদ্যের চাহিদায় তারা বিভিন্ন স্থানে তাদের পোষ্যদের কে সাথে নিয়ে যাযাবর জীবন যাত্রার সূচনা করলো। পশুপালক পর্যায়ে ঋতুভিত্তিক যাযাবর ভিত্তিতে মানুষের দুই ধরনের স্থানান্তর ঘটতো। সেগুলো নিম্নরূপ -

(ক) অনুভূমিক স্থানান্তর বা Horizontal Transition

এই পোকা স্থানান্তরে মানুষ সাধারণত ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলের মধ্যে পোষ্য জীবজন্তুদের কে সাথে নিয়ে গোষ্ঠীবদ্ধভাবে ঋতু অনুসারে গমনাগমন করতে।

তৎকালীন সময়ে পশুপালক যাযাবর সমাজ ঋতুভিত্তিক অনুভূমিক স্থানান্তরের চারটি পর্যায়ে ছিল। সেগুলো নিম্নরূপ-

১. বসন্তকালীন স্থানান্তর :-

*Corresponding author
E-mail address: suprakashdutta098@gmail.com

সাধারণত এপ্রিল মাসের শুরু থেকে জুন মাসের প্রায় শেষের দিক পর্যন্ত মানুষ তার জীবজন্তুর সাথে মনোরম পরিবেশ ও খাদ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে পর্বতের দিকে কিংবা চারণভূমির অভিমুখে রওনা দিতে।

২. গ্রীষ্মকালীন স্থানান্তর :-

গ্রীষ্মকালে তথা জুন মাসের শেষের দিক থেকে প্রায়ই সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিক পর্যন্ত মানুষ প্রচন্ড গরমের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য তাদেরকে সাথে নিয়ে সমভূমি বা মালভূমি থেকে পর্বত বা পাহাড় এর উচ্চভূমি কিংবা উচ্চ মালভূমিতে স্থানান্তর হত।

৩. শরৎকালীন স্থানান্তর :-

সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে নভেম্বর মাসের শেষের দিক পর্যন্ত মানুষ তৃণভূমির দিকে পদার্পণ করত। কারণ এই সময়ে মনোরম পরিবেশের জন্য কৃষিকাজ ভালো হতো।

৪. শীতকালীন স্থানান্তর :-

ডিসেম্বর মাস থেকে প্রায় মার্চ মাসের প্রথম দিক পর্যন্ত মানুষ তাদের পোষ্য জীবজন্তুদের কে সাথে নিয়ে প্রচণ্ড শীতের হাত থেকে রক্ষা পাবার উদ্দেশ্যে পর্বতের উচ্চ ভূমি থেকে পর্বতের পাদদেশে সম্পন্ন এলাকায় কিংবা উষ্ণ মরুভূমির দিকে রওনা দিতো।

প্রসঙ্গত, পশুপালক সমাজে মানুষের ঋতুভিত্তিক যাযাবর জীবনের অনুভূমিক স্থানান্তর চক্রাকার ভাবে ঘটতো। অর্থাৎ বছরের প্রথম দিকে মানুষ তারপর তার পোষ্যদের সাথে যে পথ থেকে যাত্রা শুরু করতো, বছরের শেষে দেখা যেত মানুষ আবার সেই পথ ধরে পুনরায় তার আগে স্থানে ফিরে এসেছে।

দৃষ্টান্ত

এশিয়া ও আফ্রিকার মহাদেশের বেশ কয়েকটি উষ্ণ ও শুষ্ক স্থান রয়েছে যেখানে দীর্ঘকাল ধরে মানুষ ঋতু নিয়ন্ত্রিত অনুভূমিক স্থানান্তরিত করণের মাধ্যমে যাযাবর বৃত্তি এখনো বজায় রেখেছে। বিশেষ করে ইরাক, ইরান, সৌদি, আরব, উত্তর সুদান, সাহারা, মেক্সিকো প্রভৃতি স্থানগুলিতে এখনও এই ধরনের জীবন যাত্রা চোখে পড়ে।

(খ) উলম্ব স্থানান্তরিতকরণ বা Vatical Tnanslation

এই প্রকার স্থানান্তরি করণে দেখা যায় মানুষ তার পোষ্য জীবজন্তুর সাথে ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় পার্বত্য অঞ্চল গুলিতে ঋতুভিত্তিক যাযাবর রীতি অনুসারে বসবাস করত। যেখানে পশুপালক আদিম জনগোষ্ঠীরা বছরের বিভিন্ন সময়ে পর্বতের শীর্ষ দেশ এবং পাদদেশের মধ্যে গমন করত।

পার্বত্য অঞ্চল গুলিতে শীতকালে প্রচন্ড শীতলতা কারণে পর্বতের শীর্ষ দেশ গুলি বরফাবৃত ও উদ্ভিদহীন হয়ে পড়ায় পশুপালক যাযাবর গোষ্ঠীগুলিকে খাদ্যের সমস্যার সম্মুখীন হতে হতো। ফলে যাযাবর গোষ্ঠীগুলোকে তার পোষ্যের সাথে পাদদেশে নেমে আসতে হতো। এছাড়াও এই প্রচণ্ড ঠান্ডায় খাদ্যের চাহিদার আর পাশাপাশি পশুদের বৃদ্ধি ব্যাহত হত। আবার গ্রীষ্মের প্রচন্ড উত্তাপের হাত থেকে থেকে রক্ষা পাবার জন্য পশুপালক যাযাবররা পুনরায় পর্বতের শীর্ষের দিকে গমন করত। কারণ গ্রীষ্মের পর্বত শীর্ষের মৃদু শীতল আবহাওয়ায় পশুর মাংস, দুগ্ধ ও পশমের পাশাপাশি ফলমূল এর যথেষ্ট বৃদ্ধি পেত।

দৃষ্টান্ত

পশুপালক যাযাবর গোষ্ঠীর ঋতুভিত্তিক উলম্ব স্থানান্তরিত করণ আজও পৃথিবীর বেশ কয়েকটি অঞ্চলে পরিলক্ষিত হয়। এর মধ্যেই হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলের হুমায়ুন, গাড়োয়াল কিংবা লাদাখ অঞ্চল গুলি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এখানে অবস্থানরত গাদ্দি, গুর্জর, ভুটিয়া কিন্নর লাদাকি মন পাস প্রভৃতি উপজাতিগোষ্ঠী পশুপালক যাযাবর বৃদ্ধির ঋতুকালীন স্থানান্তরের মধ্যে দিয়ে গরু, ভেড়া, মোষ, চমরি গাই, ছাগল, ঘোড়া প্রভৃতি প্রতিপালন করে থাকে।

এছাড়াও তুর্কিস্তানের কিরঘিজ উপজাতি আলতাই পর্বতে, ইউরোপের ল্লাচ, সারাকাত খানি উপজাতি আল্পস পর্বতের কৃষিকাজ ও পশুপালন জীবিকা নির্বাহ করে।

বর্তমান সমাজ ও যাযাবর জীবন

বর্তমানে যে সমস্ত মানুষ পার্বত্য অঞ্চলে বসবাস করে তাদের বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। যেমন- ভূমিধস, ভূমিক্ষয়, তুষারপাত, নদীর ক্ষয় ইত্যাদি। এইসব প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে মানুষকে বেশিরভাগ সময় তার বাসস্থান ত্যাগ করে পর্বতের পাদদেশে অঞ্চলে চলে আসতে হয়। মানুষ যে শুধু এইসব বিপর্যয়ের কারণে নিজেদের বাসস্থানের ত্যাগ করে তা নয়। প্রচন্ড ঠান্ডার কারণে, প্রচন্ড তুষারপাতের কারণে বহু মানুষ আজও মালভূমি বা পর্বত পাদদেশে সম্পন্ন এলাকায় এসে কয়েক মাসের জন্য আশ্রয় স্থাপন করে। ঠান্ডার পরিমাণ কমলে বা ভূমিক্ষয় রোদ হলে মানুষ আবারও পুনরায় নিজের বাসস্থানে তথা পর্বতের উচ্চভূমিতে ফিরে যায়। এখানো বহু

মানুষকে দেখা যায় যারা ব্যবসার চাহিদায় বা অন্যান্য কারণে নিজ বাসভবন থেকে কয়েক মাসের জন্য অন্যত্র স্থানে গমন করে। সুতরাং বর্তমান সমাজে দাঁড়িয়ে আমরা আজও বলতে পারি যে মানুষ প্রাচীন যুগের মত যাযাবর না হলেও খাদ্য জীবিকা মানুষকে আজও যাযাবর জীবন এর মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছে।

GEO-TALK
A Journal of Man and Environment
Journal available at: http://www.hbcnht.edu.in/college_magazine.php

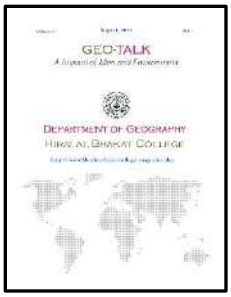

পিতৃতান্ত্রিক সমাজ

বিভা মাল*

Semester-II, Department of Geography, Hiralal Bhakat College, Nalhati, Birbhum

ARTICLE INFO

Keywords:
পিতৃতান্ত্রিক সমাজ
গার্গী
লিঙ্গ বৈষম্য
মূল্যবোধ

Article history

Received: 8th July, 2021
Revised: 30th July, 2021
Accepted: 12th August, 2021
© ***Dept. of Geography Hiralal Bhakat College***

ABSTRACT

পিত্রতান্ত্রিক সমাজে কর্তা রূপে একজন পুরুষকেই নির্বাচন করা হয় এবং এই স্থানে নারীর তুলনায় পুরুষের অধিকার বেশি থাকে। প্রাচীন কালে নারীদের অধিকার মোটামুটি ভালো ছিলো আস্তে আস্তে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের আবির্ভাব ঘটে।তাছাড়া চাকমা, সাঁওতাল, হাজং উপজাতিদের মধ্যেও পুরুষতান্ত্রিক সমাজের আধিপত্য দেখা যায়।

'পিতৃতন্ত্র'একটি ছোট্ট শব্দ কিন্তু এই শব্দের দ্বারা আমরা সমাজের পুরুষ শ্রেণীকে বুঝি। যার অধীনে থাকে পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এমনকি ধর্মীয় মানদন্ড। পিতৃতান্ত্রিক সমাজের কর্তা রূপে একজন পুরুষকেই নির্বাচন করা হয় এবং এই স্থানে নারীর তুলনায় পুরুষের ক্ষমতা বেশি থাকে। পিতৃতন্ত্র হল এমন একটি ক্ষমতা যেখানে নারী দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। এই পরিপেক্ষিতে, হুমায়ুন আজাদ তার লেখা 'নারী' বই এ বলেছেন, "এত অস্ত্র আর প্রস্তুতি নিয়ে কোন প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হয়নি পৃথিবীর কোন সেনাবাহিনী"।

'পিতৃতন্ত্র' বা ***'patriarchy'*** যার আক্ষরিক অর্থ 'পিতার শাসন'। পেট্রিয়ার্কি শব্দের উৎপত্তি হয় দুটি গ্রিক শব্দ - 'পেট্রিয়া' যার অর্থ 'বংশ' এবং 'আরকো' যার অর্থ 'আমি শাসন করি'।

কোনো স্কলার মনে করেন, ছয় হাজার বছর পূর্বে বা খ্রিস্টপূর্ব 4000 বছর আগে সমাজে পিতৃতন্ত্রের সূচনা হয়। আবার মার্ক্সবাদী তত্ব অনুসারে, ফ্রেডরিক এঙ্গেলস ও কাল মার্কস দাবি করেন, পিতৃতন্ত্রের সূচনা হয়; প্রাথমিক শ্রম বিভাগ থেকে। নারীর তুলনায় পুরুষের শারীরিক ক্ষমতা বেশি। আবার মাতৃকালীন সময়ে নারীদের বিশ্রাম ও সন্তানের দেখাশোনার জন্য গৃহেই থাকতে হতো। তাই নারীরা গৃহের তত্বাবোধানে থাকতো এবং পুরুষ খাদ্য উৎপাদন ও পশুপালনের জন্য বাইরের কর্মকান্ডে নিযুক্ত থাকতো। এরপর থেকে পুরুষ বংশ পরম্পরায় সমাজকে নিজের অধীনে আনতে সক্ষম হয়।

সভ্যতার আদি কাল থেকে বিচার করলে দেখা যায় - সমাজে কোনরকম লিঙ্গবৈষম্য ছিল না। প্রাচীন ভারতীয়

*Corresponding author
E-mail address: bibhamal2@gmail.com

সভ্যতার নারীদের যথাযথ আত্মপ্রকাশের সুযোগ-সুবিধা ছিল। প্রাচীনকালে গার্গী, মৈত্রী, অরুন্ধতী প্রভৃতি বিদুষী নারীগণ শিক্ষাচর্চা,ধর্মচর্চা, চিকিৎসাশাস্ত্র, অস্ত্রবিদ্যা, গণিতশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে নিজেদের দক্ষতার পরিচয় দেয় এবং তৎকালীন সমাজ তাদেরকে স্বীকৃতি দেয়। মধ্যযুগে ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠা ও সপ্তম শতকে সামন্ত প্রথার উদ্ভবের ফলে ভারতীয় নারীদের অবস্থা ধীরে ধীরে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের বিধি-নিষেধের গন্ডিতে আবদ্ধ হয়। শুধুমাত্র ভারতেই নয়,পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র পিতৃতন্ত্র চরম আকার ধারণ করে। বিশেষত : মারমা, চকমা, সাঁওতাল, হাজং প্রভৃতি বিভিন্ন উপজাতি মধ্যে পিতৃতন্ত্রের দৃঢ়তা এখন ও লক্ষ করা যায়। প্রাচীনকালে রচিত নানা ধর্মগ্রন্থে এমন কিছু ঈশ্বর প্রদত্ত মতামত ও বিধিনিষেধের উল্লেখ পাওয়া যায় যেখানে পিতৃতন্ত্রের প্রমাণ আছে। মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের অনেক লেখকের লেখনীতে নারীদের সব সময় এক ধাপ পিছনে রাখা হয়েছে। এই সময় রোকেয়া বেগম, কাদম্বিনী গাঙ্গুলী নামে এমন কিছু নারীদের নাম উঠে আসে। যারা সমাজের বৈষম্যের শিকল ভেঙে ফেলেছিল।

প্রাচীনকাল থেকে নারী মানে আমরা বুঝি গৃহকর্মে নিযুক্ত এবং সন্তান উৎপাদনের এক অন্যতম যন্ত্র আর সেই সন্তান অবশ্যই পুত্র সন্তান। এই প্রসঙ্গে মহাভারতের আদি পর্বে বলা হয়েছে, 'পুত্র আত্মা স্বরূপ,কন্যা ক্লেশ এর কারণ'। বিশ্বব্যাপি পিতৃতন্ত্রের প্রখরতা আধুনিক যুগের প্রথম পর্যায় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে নারীরা তাদের অধিকারের দাবি তোলে ফলে পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় শিথিলতা আসে।

বর্তমান সমাজব্যবস্থা এখন অনেকটাই পরিবর্তিত। সংবিধান আজ সমতার কথা বলে। কিন্তু প্রগতিশীলতার কয়েক যুগ অতিক্রম করে এই একবিংশ শতাব্দীতেও পুরুষতান্ত্রিকতা আমাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অবস্থিত। এখনও এই সমাজ পিতৃতন্ত্রের ছত্রছায়ায় এগিয়ে চলছে। এর কারণ স্বরূপ বলা যায়, এখনো অধিকাংশ পরিবার পুরুষ সংগঠিত। একটি পরিবারে একটি পুত্রসন্তান ও একটি কন্যা সন্তান পৃথক পৃথক মূল্যবোধ, নৈতিকতা ও আদর্শ নিয়ে বড়ো হয়। একটি সন্তান জন্ম গ্রহণের পর পিতার বংশপরিচয় গ্রহণ করে এবং পিতার সম্পত্তিতে সর্বাধিক অধিকার একটি পুত্র সন্তানেরই থাকে। নারীর গোত্র এখনও রূপান্তরিত হয়। এইসব কারণের ফলস্বরূপ, একটি পুরুষ একটি নারীকে নিজের সমকক্ষ মনে করে না। তাই নির্বিশেষে কন্যাভ্রূণ হত্যা চলছে পৃথিবীর কোন না কোন প্রান্তে। আজও একটি কন্যাসন্তান সুযোগ-স্থানে নির্যাতনের শিকার হয়। সবশেষে এটুকু বলা যেতেই পারে যে, বর্তমানে সমাজ অনেকটাই নিরপেক্ষ। অনেক রক্ষনশীল পরিবার এখন পিতৃতান্ত্রিকতা থেকে বেরিয়ে এসেছে। তবু আমরা ভুলে যাই , নারীর ভূমিকা ছাড়া কোন সংস্কৃতি স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। নারী-পুরুষ একে অপরের পরিপূরক। নারী-পুরুষ উভয়ের প্রয়াসে পৃথিবীর সৃষ্টি এবং সৌন্দর্যের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। আমরা যেখানে বিশ্ব উন্নয়নের পথে হাঁটছি , সেখানে নারী জাতিকে পেছনে ফেলে সমাজের উন্নয়ন কোনোভাবেই সম্ভব নয়। কবি কাজী নজরুল ইসলামের ভাষায়, "বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর,অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর"।

তবুও একটা 'তবু' থেকে যায় কারণ এ সমাজে শোষিত হয় নারী কেননা এ সমাজ শাসন করে পুরুষ। সত্যি বলতে, আমাদের সমাজের পুজিবাদী অর্থনীতি পিতৃতন্ত্রের জন্ম দেয়। আজকে নারী মানেই দুর্বলতা নয়,নারীদের সামাজিক অবস্থা অনেকাংশেই পরিবর্তিত হয়েছে । এখন নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত হতে পারে তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী। ভারতের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও সর্বশেষ রাষ্ট্রপতি প্রতিভা প্যাটেল ভারতের নারী মর্যাদা ও অধিকার কে পুরুষের সমকক্ষ করে তোলে। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ও প্লেটো নারীকে পুরুষের সমমর্যাদা-ই অধিষ্ঠিত করেছেন।

আমরা এটা কিছুতেই অস্বীকার করতে পারি না যে, ভিন্ন সমাজ-সংস্কৃতি দ্বারা মাতৃতন্ত্র ও পিতৃতন্ত্র নামে যে দুটি চরম মেরুর জন্ম হয়েছে তার নেতিবাচক প্রভাব বেশি। সেখানে একটা সুস্থ সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব নয়। কেননা, সংস্কার কোনো প্রকার নেতিবাচক মূর্খতা নয় । সংস্কার হল সমাজের সার্বিক বিকাশ ও উন্নয়নের সোপান। তাই বর্তমান প্রযুক্তি বিশ্বে দাঁড়িয়ে আমরা এমন একটা সমাজের স্বপ্ন দেখতেই পারি যেখানে নারী - পুরুষ নির্বিশেষে মুক্ত বাতাস নিতে পারে, একে অপরকে প্রাপ্য সম্মান দিতে পারে।

GEO-TALK
A Journal of Man and Environment
Journal available at: http://www.hbcnht.edu.in/college_magazine.php

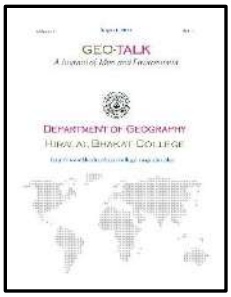

মাতৃতান্ত্রিক সমাজ

লিপিকা সাহা*

Semester-II, Department of Geography, Hiralal Bhakat College, Nalhati, Birbhum

ARTICLE INFO

Keywords:
মাতৃতান্ত্রিক সমাজ
Ancient Society
খাসি
পশ্চিম সুমাত্রা

Article history

Received: 8th July, 2021
Revised: 30th July, 2021
Accepted: 12th August, 2021
© Dept. of Geography Hiralal Bhakat College

ABSTRACT

মাতৃতান্ত্রিক সমাজ হল এমন একটি রাজ্য, পরিবার বা একটি ভিন্ন গ্রুপ যেখানে সম্পূর্ণভাবে মহিলা দ্বারা শাসিত হয়। মায়ের পরিবার থেকেই উত্তরাধিকার ও বংশ পদবি নির্ধারণ হয়। বর্তমানে বেশকিছু জানজাতির মধ্যেও মাতৃতান্ত্রিক সমাজ প্রচলিত যেমন- খাসি, গারো, মসুও।

বিশ্বের জনসংখ্যার অর্ধেক হলো নারী দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়ে তুলতে যাদের ভূমিকা অসীম, তাদেরকে প্রায়শই ছোটো করে দেখা হয়। অথচ গত শতাব্দীর শুরুতে জাতির জনক গান্ধীজি এ সূত্রটি অনুধাবন করেছিলেন। তাঁর **ভাষায়—*"Woman is the champion of man and gifted with equal mental capacities. She has the right to particate in the minutest of the activities of man and she has same rights of freedom and liberty as he"— Gandhiji.***

আলোচ্য বিষয় "মাতৃতান্ত্রিক সমাজ" হলো এমন একটি রাজ্য, পরিবার অথবা একটি ভিন্ন গ্রুপ যেখানে সম্পূর্ণভাবে মহিলা দ্বারা শাসিত হয় অর্থাৎ একজন মহিলা আমাদের পুরুষ কর্তৃত্ব সমাজের মতোই শাসনতন্ত্র করে থাকে। মাতৃতান্ত্রিক সমাজ নারী শাসিত হবে এমন নয়, তবে সমাজব্যবস্থা মাতৃকেন্দ্রীক হতে হয়। আমার মনে হয় পুরুষ তন্ত্র আছে বলেই মাতৃতন্ত্রের সূচনা ঘটেছে। একজন নারীর জন্মের পর থেকে তার পিতা তার দায়িত্ব নেয় এবং তিনি ঠিক করে দেয় তার জীবনধারা কিভাবে চলবে, তারপর সেই নারীর পরিণয় সম্পন্নের পর তার জীবনটা স্বামীর নির্দেশেই চলে। এই পুরুষতন্ত্রের উপর বিদ্বেষের কারণেই নারীদের স্বাধীনতা ও নিজেদের পরিচয় গড়ে তোলার উদ্দেশ্যেই হয়তো পুরুষতন্ত্র থেকে সরে এসে একটি গোষ্ঠী তৈরি করে।

লুইস মারগান এর লেখা ***"Ancient Society"***- বই থেকে জানা যায়, সুপ্রাচীনকালে সকল আদিম গোষ্ঠীই ছিল মাতৃতান্ত্রিক ।সাম্প্রতিককালে বিবর্তনবাদী জীববিজ্ঞানী, জীনতত্ত্ববিদ, প্যালিও এন্থ্রোপলজিষ্টগণ বিভিন্ন পরীক্ষা করে বলেছেন, মানবগোষ্ঠী সুপ্রাচীনকালে প্রথমে মাতৃতান্ত্রিকই ছিল। একদম প্রাচীনকালে মানুষ যখন শিকারে দক্ষতা অর্জন করেনি সেই সময় তারা ছিল জোগাড়ে অর্থাৎ তারা ফলমূল,

*Corresponding author
E-mail address: Sahalipika233@gmail.com

ছোটখাটো বন্যপ্রাণী ইত্যাদি খাদ্যসামগ্রী জোগাড় করত। এই সময় মেয়ে ও পুরুষের কাজে খুব একটা পার্থক্য ছিল না। মেয়ে-পুরুষ সবাই একসাথে খাদ্য সংগ্রহের জন্য বের হতো। এইসব ছাড়াও মেয়েদের একটা অতিরিক্ত কাজ ছিল সন্তানের জন্ম দেওয়া এবং তাদের লালন-পালন করা । আদিম যুগে মানুষের জীবন ছিল অসহায় ও নিরাপদহীন এবং মানুষের সংখ্যা ছিল খুবই কম । সন্তানের জন্ম দিয়ে মেয়েরা বংশবৃদ্ধিতে সাহায্য করত। এর ফলে সন্তান লালন-পালনে মেয়েরা আস্তানার কাছাকাছি থাকতো এবং ঘর-সংসারের গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতো । ক্রমে হাতিয়ার এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য যখন পুরুষরা দূরবর্তী অঞ্চলে যেত তখনো মেয়েরা কাছাকাছি থেকে ফলমূল, বিচি ইত্যাদি জোগাড় করত এবং শিকার যখন অনিশ্চিত হত তখন মেয়েরা ঘাস লতাপাতা, গাছ ইত্যাদি থেকে খাদ্য সংগ্রহ করতো। এইভাবে মেয়েরা একান্ত জরুরি কাজগুলি দক্ষতার সাথে করতো বলে স্বভাবতই তারা সমাজের কর্তা হয়ে উঠেছিল। মেয়েরা যে দাপট ফলানোর জন্য কর্তৃত্ব করত তা নয়, কাজ এবং দক্ষতার গুণেই তারা সমাজের পরিচালনা করত। ক্রমশ হাতিয়ারের উন্নতির ফলে যখন মানুষ শিকার করতে শিখলো আর এতে শুধুমাত্র পুরুষেরা অংশগ্রহণ করত কারন মেয়েরা ঘর সংসার ফেলে শিকারে যেতে পারত না। হাতিয়ার আবিষ্কারের পর শিকার কৌশলের এর উন্নতির ফলে মাতৃতন্ত্র ধীরে ধীরে পুরুষতান্ত্রে প্রবেশ করলো।

মধ্যযুগে যখন পুরুষেরা তাদের শাসনতন্ত্র দ্বারা সমাজকে দাপিয়ে রেখেছে তখন মাতৃতান্ত্রের কোনো ছাপ তেমন নেই। তখন নারীদের কোন স্বাধীন চেতনাই ছিল না। সমাজে তখন পুরুষতন্ত্রের থাবা বিশেষ লক্ষণীয় । যখন সমগ্র নারী পুরুষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তখন সেই সময় কিছু নারী এই পুরুষতন্ত্রকে ভেঙে মাতৃতন্ত্রের অবকাশ ঘটিয়েছে। তার জলজ্যান্ত উদাহরণ— দেবী চৌধুরানী, ঝানসি রানী লক্ষ্মীবাঈ প্রভৃতি চরিত্র প্রকাশিত। এমনকি কাদম্বিনী গাঙ্গুলী বিভিন্ন প্রতিকূলতায় ভারতের প্রথম মহিলা ডাক্তার হয়ে প্রমাণ করে দিয়েছিলেন যে নারীরা কোন অংশে কম নয়, চাইলেই তারা নিজের পরিচয়ে বাঁচতে পারে । একথা সত্য যে বাংলাদেশের মহিলাদের হীনদশা মুক্ত করার আন্দোলন শুরু করেছিলেন পুরুষরা। পুরুষরা তাদের নিজেদের জগতকে উন্নত করে তোলার উদ্দেশ্যে নারী শিক্ষা ও তাদের মধ্যে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটাতে চেয়েছিলেন। ধর্ম অনেক সময়েই ছিল নারীর হীন অবস্থার কারণ। যেমন- সহমরণ প্রথা, বাল্যবিবাহ ,বহুবিবাহ অকাল বৈধব্য ও বৈধব্যের কঠোর ব্রহ্মচর্য ইত্যাদি ।আর এই ধর্ম পুরুষ দ্বারাই রচিত। এই বর্বরোচিত প্রথাগুলি রাজা রামমোহন , বিদ্যাসাগর ভেঙে ফেলে মাতৃতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করেছিল । এইভাবে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সূচনা ঘটেছে মাতৃতন্ত্রের।

মাতৃতান্ত্রিক সমাজ হলো একটি পরিবার বা একটি জনগোষ্ঠী, যাদের পরিবারের দায়িত্ব থাকে একজন নারীর উপর এবং বংশের ধারা নির্ধারিত হয় নারীর দিক থেকে । মায়ের পরিবার থেকেই উত্তরাধিকার ও বংশ পদবী নির্ধারিত হয় । বর্তমানে পৃথিবীর বেশ কিছু জনজাতির মধ্যে মাতৃতন্ত্র লক্ষণীয়, যেমন—

1. মিনানকাবাও (ইন্দোনেশিয়া): চার মিলিয়ন মানুষের সম্প্রদায় মিনানকাবাও দুনিয়ার সবচেয়ে বড় মাতৃতান্ত্রিক সমাজ । প্রথাগতভাবে এনিমিস্ট হলেও একসময় হিন্দুধর্ম এবং বৌদ্ধধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে এই সম্প্রদায়। বর্তমানে তাদের অনেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে । এই সম্প্রদায় মনে করে, কোরআন মিনেই মাতৃতান্ত্রিক সমাজ চলছে । কেননা, কোরআনে নারীর সম্পদের মালিক হতে বিধিনিষেধ নেই ।

2. মোসুও (চীন): মায়ের নেতৃত্বে বড় পরিবারে থাকতে অভ্যস্ত ম্যোসু সম্প্রদায়।তাদের মতে 'স্বামী' বা 'পিতা' বলে কিছু আসলে নেই । এই সম্প্রদায় "ওয়াকিং ম্যারেজ" এ বিশ্বাসী, অর্থাৎ একজন পুরুষ চাইলে একজন নারীর বাড়িতে যেতে পারে এবং রাত্রিটি তার সঙ্গে কাটাতে পারে । তবে স্বামী-স্ত্রী একসাথে বসবাসের বিধান নেই এই সম্প্রদায়ে।

3. গারো (ভারত-বাংলাদেশ): গারো সম্প্রদায় তাদের মায়ের পদবী গ্রহণ করে। পরিবারের সবচেয়ে ছোট মেয়ে মায়ের সম্পদের উত্তরাধিকারী হয়। অতীতে ছেলেদের বয়ঃসন্ধিকাল শুরু হলে তাদের পরিবার থেকে আলাদা করে গ্রামের ব্যাচেলর ডর্মেটরিতে নিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো । কিন্তু খ্রিস্টান ধর্মের প্রভাবে এই চর্চা বাতিল হয়ে গেছে। বর্তমানে গারো সম্প্রদায় সব সন্তানকে সমানভাবে দেখে।

4. খাসি (ভারত): খাসি সম্প্রদায়ের কাছে কন্যা সন্তান জন্ম নেওয়া মানে উৎসবের উপলক্ষ্য। আর পুত্রসন্তান সাধারণ ব্যাপার। পরিবারের সবচেয়ে ছোট মেয়ে সম্পদের অধিকারী হয় । কন্যা সন্তান না থাকলে তারা কন্যা সন্তান দত্তক নেই সব সম্পদ তাকে দিয়ে দেয় । এই কারণে খাসি পুরুষেরা আন্দোলনে নামে।

এছাড়াও স্পেনের বাস্কোস, দক্ষিণ অফ্রিকার চারোকি, চক্টো, উত্তর আমেরিকার লিঙ্গট, পশ্চিম সুমাত্রা, পশ্চিম অফ্রিকার

আকান ও আশান্তি আরও বিভিন্ন জনজাতির মধ্যে মাতৃতন্ত্র লক্ষনীয়।

আমরা যে সমাজে বসবাস করি তাতে পুরুষ মানুষের প্রাধান্য রয়েছে। পরিবার এবং সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে কর্তা হচ্ছে পুরুষ মানুষ। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলিতে মেয়েরা ঘর সংসারের কাজ করে, আর পুরুষেরা অফিস-আদালত ও কল-কারখানা তে কাজ করতে পারে । উন্নয়নশীল দেশের মহিলারা অনেক সময় পরিবারের সদস্য দ্বারা এবং স্বামী কর্তৃতক ভৎর্সিত ও লাঞ্ছিত হয়ে থাকে। তারা অনেক সময় শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে মেয়েদের অনিচ্ছার সত্ত্বেও তাদের বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয় অল্প বয়সে এবং উচ্চশিক্ষা গ্রহণে বাধা দেওয়া হয় । এশিয়ার ও আফ্রিকা মহাদেশ স্বামীরা স্ত্রীদের শাসন করার অলিখিত অধিকার ভোগ করে থাকে। সাধারণত নারী ও কন্যা সন্তানদের ক্ষেত্রে রোগের বাড়াবাড়ি অবস্থায় না পৌঁছলে তাদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার কথা মনে করা হয় না । উপরন্তু ভারতীয় সমাজে অধিকাংশ মেয়েরা রক্তাল্পতায় ভোগে । দৈনন্দিন জীবনে তাই গৃহস্থলীর বিভিন্ন কাজ করার জন্য তাদের অতিরিক্ত শক্তি ক্ষয় হয়। কিন্তু সেই অনুপাতে খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে ঘাটতি দেখা যায়। আবার কন্যা সন্তান হত্যা প্রায়ই শোনা যায়। রাষ্ট্রসংঘ সবাইকে একটি হিন্দু প্রবাদ বাক্য জানাচ্ছে, তাহলো "কন্যা সন্তানকে বড় করা মানে প্রতিবেশীর বাগানে জল দেওয়া।" অপরদিকে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশ সমূহে মেয়েরা সংসারের দায়িত্ব পালনের পরও জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পুরুষের সমান দায়িত্ব বহন করে। পুরুষের সমান মৃধা ও দক্ষতা থাকা সত্বেও কর্মক্ষেত্রে মেয়েরা কম বেতন পায় । আবার আমাদের সমাজে ধনী-দরিদ্রের প্রভেদ রয়েছে। দেখা যায় কোন অভিজাত মহিলা একজন গরিব শ্রেণীর পুরুষের ওপর কর্তৃত্ব করে থাকে । কিন্তু অভিজাত শ্রেণীতে ওই নারী পুরুষের অধীনে থাকতে বাধ্য ।পুরুষপ্রধান সমাজের থেকে নারীদের ধারণা হয়ে গেছে পুরুষপ্রধান , পুরুষ পন্ডিত, পুরুষ দার্শনিক এবং পুরুষরা মেয়েদের চেয়ে বেশি গুণের অধিকারী । কিন্তু একথায় বাস্তব কোনো সত্যতা নেই একথা বর্তমানে নারীদের কর্মকাণ্ডে ও অগ্রগতিতে প্রমাণ করে দিয়েছে।

বর্তমানে এই বিশ্বায়নের যুগে নারীরা পুরুষতন্ত্রের বর্বরোচিত প্রথা ভেঙে নিজেদের প্রতিভার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে । বিভিন্ন পরিসেবামূলক কাজ যেমন (বিমান সেবিকা, হোটেল পরিষেবা, পরিচর্যা করা কাজে) উন্নত দেশগুলির মত উন্নয়নশীল দেশে মহিলার সংখ্যা বাড়ছে । এছাড়াও কন্যা ও পুত্রসন্তান উভয়ই বাবার সম্পত্তিতে সমান মালিকানা প্রভৃতি নীতি চালু হয়েছে। আর বর্তমানে উন্নত দেশগুলিতে নারী পুরুষের ক্ষেত্রে প্রায় সমান।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—" আমার মতে সংসারের মেয়ে পুরুষের ক্ষেত্রে একই। সেই একই ক্ষেত্রে উভয়ে ভিন্ন ভাবে কাজ করে। লড়াইয়ে বাম হাত ধনুকটাকে ধরে রাখে ডান হাত শরটা প্রক্ষিপ্তকরে।.....পৃথিবীর সকল বিভাগের সকল কাজই মেয়েদের বিশেষ শক্তির অপেক্ষা রাখে । সেই শক্তি প্রকাশ অবরুদ্ধ বলে জগতে কত যে দৈন্য তা আমরা জানতে পারিনি।" প্রতিক্ষেত্রে মেয়েরা প্রমাণ করে দিয়েছে পুরুষের থেকে মেয়েরা বুদ্ধি ,মেধা ও শক্তিতে কোন অংশে কম নয়। আমরা বর্তমানে না পুরুষতান্ত্রিক সমাজ চাই না মাতৃতান্ত্রিক সমাজ চাই, আমরা এমন একটা সমাজ চাই যেখানে একজন পুরুষ যা যা করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে একজন নারী ও চাইলে সে কাজ করতে সাচ্ছন্দ্যবোধ করে অর্থাৎ নারী পুরুষের ক্ষেত্রেও একই হয়।

GEO-TALK
A Journal of Man and Environment
Journal available at: http://www.hbcnht.edu.in/college_magazine.php

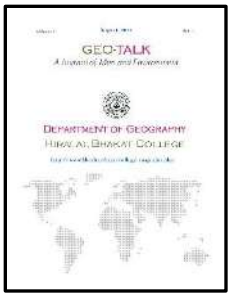

পশ্চিমবঙ্গের উপজাতি সম্প্রদায়

প্রিয়াঙ্কা হালদার*

Semester-II, Department of Geography, Hiralal Bhakat College, Nalhati, Birbhum

ARTICLE INFO

Keywords:
উপজাতি
সাঁওতাল
পুরুলিয়া
অভিযোজন

Article history

Received: 8th July, 2021
Revised: 30th July, 2021
Accepted: 12th August, 2021
© Dept. of Geography, Hiralal Bhakat College

ABSTRACT

বৈচিত্রময় ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন উপজাতি বসবাস করে। আদিবাসী হল একটি সরল প্রকৃতির সামাজিক গোষ্ঠী যার মধ্যস্থিত মানুষের একই ভাষায় কথা বলে এবং বিভিন্ন শিকার ও কাজে সামরুপি জীবনসংগ্রামে যৌথভাবে কাজ করে। পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার 6 শতাংশ আদিবাসী জনসংখ্যা। পশ্চিমবঙ্গের মোট উপজাতি জনসংখ্যার 54 শতাংশ হল সাঁওতাল উপজাতি। প্রকৃতির সাথে অটুট বন্ধন রেখে তারা তাদের জীবনযাত্রা অতিবাহিত করছে।

ভূমিকা

আমাদের আলোচ্য বিষয় হল "পশ্চিমবঙ্গের উপজাতি সম্প্রদায়"। এই উপজাতি শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Tribe' যেটি গৃহীত হয়েছে ল্যাটিন শব্দ 'Tribus' থেকে যার অর্থ হলো "Residential place"। উৎপত্তিগত ভাবে বলা যায় একটি স্থানে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর হল উপজাতি। উপজাতি হলো একটি আধুনিক শব্দ যা ওই ধরনের সম্প্রদায়ের জন্য প্রয়োগ করা হয়, যারা অনেক প্রাচীন এবং উপ মহাদেশের সবথেকে প্রাচীনতম আদিবাসী দের অন্যতম। উপজাতিরা এমন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত তারা কোনো লিখিত ধর্মগ্রন্থের মতানুসারে ধর্ম পালন করে না। তাদের কোন রাষ্ট্র সংগঠন নেই, তাদের মধ্যে একটি ভালো বিষয় হলো- তাদের মধ্যে কোন বিভাজন নেই।

পরিবেশের সঙ্গে তাদের অভিযোজন

পরিবেশের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক চিরন্তন। এই সম্পর্ক অতীতকাল থেকে ক্রিয়াশীল।সাধারণত আমরা পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন এর মাধ্যমে আদিম অবস্থা থেকে আজ এই সভ্য অবস্থাতে পৌঁছেছি। আদিম অবস্থায় আমরা যেমন প্রকৃতি কেন্দ্রিক ছিলাম, তেমন এখনো উপজাতি সম্প্রদায় প্রকৃতি কেন্দ্রিক অবস্থান করে। তাদের যে আর্থসামাজিক বিবর্তন তা প্রকৃতি কেন্দ্রিক। কিন্তু বর্তমানে সভ্য সমাজের মানুষ অর্থাৎ আমরা আমাদের নিজেদের সুবিধার্থে উপজাতি মানুষদেরকে প্রকৃতি থেকে আলাদা করার চেষ্টা করে চলেছি। তাদের প্রকৃতি কেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থাকে ছেড়ে আমাদের এই সভ্য সমাজে আসার আহ্বান জানানো হচ্ছে।

*Corresponding author
E-mail address: priyankahalder865@gmail.com

পশ্চিমবঙ্গের উপজাতি সম্প্রদায় এবং তাদের অবস্থান

পশ্চিমবঙ্গের যা উপজাতি জনসংখ্যা আছে তা পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যা 6%। এই তথ্য অনেকেরই অজানা যে, বর্তমানে যে সমস্ত উপজাতি সম্প্রদায় আছে তাদের বেশির ভাগটাই বহিরাগত। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন উপজাতি গোষ্ঠী লক্ষ্য করা যায়। যেমন সাঁওতাল, মুন্ডা, ওরাং, লেপচা, গারো ইত্যাদি। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে রয়েছে সাঁওতাল। পশ্চিমবঙ্গের মোট উপজাতির সংখ্যা 54% হল সাঁওতাল। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় এই সাঁওতাল গোষ্ঠী ছড়িয়ে আছে। যেমন- বর্ধমান বীরভূম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, হুগলি এবং উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুর। এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গে মুন্ডা উপজাতি গোষ্ঠী রয়েছে 7.5% এবং ভূমিজ রয়েছে 7.5% এবং ওরাং রয়েছে 1.5%। তাছাড়া আরও গোষ্ঠীগুলো খুব কম পরিমাণে আছে পশ্চিমবঙ্গে। বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, পুরুলিয়া প্রভৃতি জেলায় উপজাতির জনসংখ্যার বৈচিত্র লক্ষ্য করা যায়। এই সমস্ত জেলায় সবচেয়ে বেশি উপজাতি গোষ্ঠী পরিলক্ষিত হয়। যদিও পশ্চিমবঙ্গের কমবেশি সব জেলাতেই উপজাতি গোষ্ঠীর মানুষ বসবাস করে। এই সমস্ত জেলায় অবস্থিত উপজাতি গোষ্ঠীর অধিকাংশ মানুষ সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দা।সেই সমস্ত এলাকায় তারা কৃষিকাজ ও অরন্যের ওপর ভিত্তি করে তাদের জীবন ধারণ করে।এই সমস্ত অঞ্চলের অধিকাংশ মানুষের জীবন যাত্রার মান খুব অনুন্নত প্রকৃতির।তারা এই প্রতিকূলতাকে সঙ্গে নিয়েই সেখানে জীবনযাপন করে চলেছে। তবে একথা বলা যায়- তারা এখন সমাজ গঠন সম্পর্কে সচেতন হয়েছে। এবং এখানকার উপজাতিরা নিজেদেরকে পরিবর্তন করতে শুরু করেছে। তাদের মধ্যে অনেকেই এখন উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত।আশা করা যায় পরবর্তীকালে এদের অবস্থার আরও উন্নতি হবে এবং এরা নিজেদেরকে বিকাশের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে নিয়ে যাবে এবং একটা সুস্থ সমাজ গঠনের অংশ হবে।

পশ্চিমবঙ্গের উপজাতির আর্থ সামাজিক বিবর্তন

সাম্প্রতিক সময়ে থেকে পিছিয়ে, বিগত 200 বছরে পশ্চিমবঙ্গের উপজাতি সম্প্রদায়ের আর্থসামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। এই প্রক্রিয়াটিকে আমরা তিনটি পর্যায়ে মধ্যে ভাগ করতে পারি। যথা-

১. ভারতের প্রাক-ব্রিটিশ সময়কাল
২. ব্রিটিশ শাসন থেকে স্বাধীনতা লাভের সময় পর্যন্ত
৩. স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী সময়ে।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখা ভালো যে, তাদের এই দুশো বছরের আর্থসামাজিক বিবর্তন তার বেশিরভাগ টাই কিন্তু তাদের কাছে নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করেছিল। প্রথম পর্বে তাদের অবস্থা খুব একটা সচ্ছল ছিল না, কিন্তু খারাপও ছিল না। তারা সমাজের যে মূল ধারার মানুষ তাদের থেকে অনেক দূরে কোন পাহাড়ের পাশে বসবাস করত। তারা সম্পূর্ণ অরন্যের ওপর নির্ভরশীল ছিল, তাই তারা নিজেদেরকে অরন্যের সন্তান বলে গর্ব বোধ করত। এই সময় তাদের জীবনটা ছিল স্বনির্ভর, তারা তাদের নিজের ইচ্ছে মত বাচতে পারত।

তারপর ব্রিটিশ শাসন থেকে স্বাধীনতা লাভের সময় পর্যন্ত শুরু হয় তাদের জীবনের দ্বিতীয় পর্ব। ব্রিটিশ শাসনের প্রথমদিকে ব্রিটিশ সরকার উপজাতি গোষ্ঠী কে নিয়ে ততটা ও চিহ্নিত ছিল না। কিন্তু কিছু বছর পর থেকেই তারা বুঝতে পারে যে উপজাতিগোষ্ঠী প্রকৃতি কেন্দ্রিক মানুষ। তাই প্রকৃতি থেকে তাদেরকে আলাদা করে ব্রিটিশ সরকার অরণ্য সম্পদ গুলোকে নিজের ক্ষমতায় রাখতে চেয়েছিল,তাই ব্রিটিশ সরকার উপজাতি গোষ্ঠী কে প্রকৃতি কেন্দ্রিক পরিবেশ থেকে উৎখাত করার জন্য তাদের ওপর বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করতে শুরু করে। তারমধ্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অন্যতম ছিল। যশোরে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তাদের জীবনধারায় চরম প্রভাব বিস্তার করেছিল। তারা সেই সময় চরম অত্যাচারের শিকার হয়েছিল। সেই সময় কালে তাদের ওপর শুরু হয়েছিল দেশীয় মহাজনদের অত্যাচার।তারা এই অত্যাচার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বিভিন্ন বিদ্রোহের সাহায্য নেয়। এ বিদ্রোহের উল্লেখযোগ্য উপজাতি নেতাদের অংশগ্রহণ ভারতকে স্বাধীন করার একধাপ এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। এই ভাবে তাদের জীবন বিনষ্ট হওয়ার মধ্য দিয়েই ভারত স্বাধীন হয় এবং ভারত স্বাধীন হওয়ার পরবর্তী সময়ে শুরু হয় তাদের আর্থসামাজিক বিবর্তনের তৃতীয় পর্যায়।দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে তাদের উপর যে অত্যাচার শুরু হয়েছিল তা কিছুটা হলেও কম হয় দেশ স্বাধীন হওয়ার পর। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু উপজাতি গোষ্ঠীর অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য বেশকিছু নীতি ঘোষণা করেছিলেন।এবং সে গুলোকে লক্ষ্য রেখেই তাদের জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করা শুরু হয়েছিল।সেখানে বলা হয়েছিল অরন্যের ওপর তাদের অধিকার সব সময় অব্যাহত থাকবে এবং তাদের উন্নয়ন করতে হলে তাদেরকে সে পরিবেশের মধ্যে রেখে উন্নত করতে হবে।

উপজাতিদের উন্নয়নে সরকারের পদক্ষেপ

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তাদের অবস্থার কিছুটা হলেও উন্নতি ঘটে।সেই সমকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু উপজাতিগোষ্ঠী দের অবস্থা কিছুটা হলেও স্থিতিশীল করার জন্য যে সমস্ত পদক্ষেপগুলো নিয়েছিলেন তার প্রভাব কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের উপজাতিদের উপর পড়েছিল। তাদের এই অবস্থা কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী স্থিতিশীল। তারা সব সময় অত্যাচারের শিকার হয়েছে এবং বর্তমানেও হচ্ছে।বর্তমানে অন্যান্য রাজ্যের মত পশ্চিমবঙ্গে ও উপজাতিদের অবস্থা সঠিক নয়।তবুও বর্তমান সরকার তাদের জন্য অনেক প্রকল্প শুরু করেছে,তাদের মধ্যে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন স্কুল নির্মাণ করা হয়েছে । এবং তাদের মধ্যে যে খাদ্যের সমস্যা সেটা মিটানোর ব্যবস্থা করে তোলা হয়েছে। এখন বর্তমানে তাদের যে সমস্যা সেগুলোর সমাধানের জন্য বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে। যদিও সেই প্রতিশ্রুতি গুলো পূরণ হয়না, ওশুধুমাত্র এই প্রতিশ্রুতি গুলোকে কিছু মানুষের উদ্দেশ্য কে সামনে রেখে পরিচালনা করা হয়। সে উদ্দেশ্য গুলো পূরণ হওয়ার পর সেই প্রতিশ্রুতি গুলো কেয়ার মর্যাদা দেওয়া হয় না। কিছু মানুষ প্রতিনিয়ত এই খেলা খেলে চলেছে উপজাতি গোষ্ঠীর সঙ্গে।

সমাজের কল্যাণে উপজাতিদের প্রয়োজন:

"মানব ইতিহাস হিংসাময়, সহিংস...
সবলের জয়, দুর্বলের পরাজয়...
আধুনিকতার জয়, প্রাচীন পন্থার পরাজয়"...।

তাই আমরা পৃথিবী জুড়ে,প্রভাব ছিল মানুষের কারণে কিভাবে নিম্ন শ্রেণীর মানুষ অবহেলিত হচ্ছে সেই প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই।এর প্রভাব কিন্তু উপজাতি গোষ্ঠীর উপর বিশেষভাবে পরে।উপনিবেশবাদ থেকে শুরু করে পুঁজিবাদ ও বিশ্বায়নের প্রতিটি বিষয়ই প্রবাহিত হয়েছে উপজাতি সম্প্রদায়। তারা সব সময় ধর্মের শিকার, শোষণের শিকার অশুচি অস্বীকার।

তাহলে একটা কথা আমাদের মনে আসতে পারে যে,...

তারা আছেন কেন...?
তবে তারা কেন বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে না....!
যদি তারা এই সমাজে আছে, তাহলে তার কারণ কি...?

এই তিনটি প্রশ্নের উত্তর নিউজিল্যান্ডের মানুষ ও সরকার আগেই বুঝতে পেরেছিল, তাই সেই দেশের সরকার তাদের দেশের উপজাতি অর্থাৎ "মাওরি" উপজাতিদের নিয়ে বেশ সচেতন।আবার অস্ট্রেলিয়ার সরকারও জনতা ধীরে ধীরে বুঝতে পারছেন যে সে দেশের উপজাতি সম্প্রদায় তাদের দেশের সংস্কৃতির বাহক। এবং ইতিহাসের একটা বড় অঙ্গ।তবে ভারতের সরকার ও জনতা তাদের দেশের উপজাতি দের নিয়ে কি সচেতন..? আবার পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ও সরকার কি আদিবাসীদের নিয়ে সচেতন...? তবে এ বিষয়ে বলা যায় পশ্চিমবঙ্গের মানুষ কিন্তু উপজাতিদের নিয়ে সচেতন নয়। আবার তাদের মধ্যে অনেকে মনে করেন উপজাতি গোষ্ঠী পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতির কোন অংশই নয়। কিন্তু এ রাজ্যের সরকার তা বুঝেছেন এই সমাজে উপজাতি সম্প্রদায়ের প্রয়োজনীয়তা। সেই কারণেই 2016 সালে ঝাড়গ্রামে আদিবাসী মিউজিয়াম খোলা হয়। যেখানে তাদের মধ্যে যে সংস্কৃতি অব্যাহত সেগুলো তুলে ধরা হয়।

উপজাতিদের উপস্থিতি আমাদের জাতীয় সত্তাকে আরো সুস্থ করে তুলেছে।তাদের সংস্কৃতি জন্যই আমরা নিজেদেরকে জাতীয় স্তরে তুলে ধরতে পারছি।

কাজেই এই উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ গুলোকে কখনোই উপেক্ষা করা উচিত নয়।আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার পেছনে তাদের অবদান অনস্বীকার্য।

উপজাতি গোষ্ঠীর সম্প্রদায়ের মানুষদের সমাজ ব্যবস্থা ও আচার-আচরণ:

পশ্চিমবঙ্গের যে সমস্ত উপজাতিগোষ্ঠী রয়েছে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো তাদের নিজেদের সমাজ ব্যবস্থা। তারা নিজেদের উপজাতির বাইরে বিবাহ করতে পারে না, আবার তাদের বিবাহের জন্য কিছু নিয়ম রয়েছে। তাদের মধ্যে যদি কেউ নিয়ম লঙ্ঘন করে তাহলে তাকে চরম শাস্তি দেওয়া হয়। তাদের সমাজের নিয়ম অনেকটা কঠিন তাদের মধ্যে কিন্তু এখনো কুসংস্কার লক্ষ্য করা যায়, সেখান থেকে তারা এখনো বেরিয়ে আসতে পারেনি। তাদের মধ্যে রাক্ষস ও অসুর বিবাহ উল্লেখ আছে। আবার একদিক থেকে তাদের সমাজের বিবাহের ক্ষেত্রে আধুনিকতার মনোভাব ও পাওয়া যায়। তাদের সমাজে যে সমস্ত অনুষ্ঠানগুলো হয় তার বেশির ভাগটাই প্রকৃতি কেন্দ্রিক। এবং তাদের এই আচার-আচরণ পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহ্য কে আরো বাড়িয়ে তোলে। তাদের সমাজব্যবস্থা কিছুটা কঠোর হলেও তাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে অবশ্যই প্রাধান্য দেওয়া হয়।

উপজাতিদের জীবনের সংগ্রাম

ইতিহাসের পাতায় আমরা তাদের সংগ্রাম দেখেছি। তাদের নিজেদেরকে রক্ষার উদ্দেশ্যে তারা বিদ্রোহ প্রকাশ করেছে। তারা প্রথম ইংরেজদের বিরুদ্ধে একটা বড় সংগঠন তৈরি করে বিদ্রোহের রূপ ধারণ করেছিলেন। সে ঐতিহাসিক বিদ্রোহী আমরা হুল বিদ্রোহ নামে জানি। এই বিদ্রোহ ঐতিহাসিক বিদ্রোহের মধ্যে অন্যতম ছিল। এ বিদ্রোহের জন্য সিধু ও কানুর সহ তার দলের সমস্ত মানুষের অবদান অনস্বীকার্য।

যদিও তারা এই বিদ্রোহের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভ করতে সক্ষম হননি।তবুও দেশবাসীকে ব্রিটিশ সরকারের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য একটা নির্দিষ্ট পথ তৈরি করে দিয়েছিলেন।

এই হুল শব্দের অর্থ হলো 'সশস্ত্র সংগ্রাম'। কিন্তু এখন আমরা এ অর্থটা কি ভুলে গেছি। আমরা ভুলে গেছি সেইসব মহান ব্যক্তিদের সংগ্রামের কথা। তাইতো আজ খুব সহজেই হুল শব্দটি কে উৎসবের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছি। বর্তমানে আমাদের রাজ্যে এখন বিভিন্ন জায়গায় হুল উৎসব পালন করা হয়। এই 'হুল' সশস্ত্র সংগ্রামের প্রথম চিত্র দেখা গিয়েছিল 855 খ্রিষ্টাব্দের 30 শে জুন বীরভূমে। আর সেই বীরভূমে এখন হুল বিদ্রোহ কে ফুল উৎসবে পরিণত করা হয়েছে।' হুল' কোন উৎসব নয় সেটা একটা ঐতিহাসিক সংগ্রাম এটা ভুললে চলবেনা আমাদের।

'হুল' কোন উৎসব নয়,..... 'হুল' মানে গভীর লড়াই
নয় কোন আনন্দের অনুষ্ঠান... হুল মানে লড়াই চরম
লাঞ্ছনার।
হুল কোন মেলার হুল্লোড় নয়... হূল লড়াই হৃদয় যন্ত্রণার
বা নয় কোনো উৎসবের নাচ... হুল মানে লড়াই অঙ্গার
তাই কখনোই "হুল" কে উৎসব বলে মেনে নেওয়া উচিত। এর
বিরুদ্ধে সরব হওয়া দরকার।

উপজাতিদের নিয়ে দ্বন্দ্ব

আমরা ইতিহাস বিশ্লেষণ করে দেখেছি যে... উপজাতিদের নিয়ে দ্বন্দ্ব প্রথম থেকেই। বিশেষ করে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে উপজাতি গোষ্ঠীর উন্নয়নের কথা বলা হয়। তাদেরকে সভ্য সমাজে আনার চেষ্টা চলছে। এই বিষয় নিয়ে তার সঙ্গে একটা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে, সভ্য সমাজের মানুষের। বিশেষ করে আমরা আমাদের রাজ্যের জঙ্গলমহলের উন্নয়নের কথা প্রায়ই শুনতে পাই। জঙ্গলমহলের মানুষ এখন তাদের এই জায়গা ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য হচ্ছে, কারণ তাদের থাকার পরিবেশকে নষ্ট করে ফেলেছে।

ব্রিটিশ শাসনকালে আমরা তাদেরকে যে রূপে দেখেছিলাম সেইরূপ কিন্তু আমরা দেখতে পাই না। তারা সেই সময় তাদের সর্বশক্তি দিয়ে ব্রিটিশ শাসন কে বাধা দিতে চেয়েছিল।কিন্তু এই বর্তমান সমাজ তার ওপরে যে অত্যাচার চলেছে তার প্রতিবাদ করা খুব একটা সহজ কাজ হবে না।কিন্তু এই বর্তমান সমাজে তাদের উপর যে অত্যাচার চলেছে তার কিন্তু প্রতিবাদ আমরা কয়েকটা দেখতে পাই না।

উপসংহার

ওপরে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে, আমাদের রাজ্যে অবস্থিত 'গোষ্ঠীর জীবন'। এদের ক্ষেত্রে চার্লস ডারউইনের "অস্তিত্বের জন্য জীবন সংগ্রাম"ধারাটি প্রযোজ্য। আমরা কখনোই চাইনা যে তারা সভ্য সমাজে। অতীত কাল থেকেই বলপ্রয়োগ সমাজে ব্যবস্থা চলে আসছে এবং সেটাই অব্যাহত। আবার হয়তো তারা নিজেরাই আমাদের সভ্য সমাজে আসতে চাইছেন না।তাই আমাদের উচিত প্রকৃতির সঙ্গে তাদের কে সংযুক্ত রেখে তাদেরউন্নতি ঘটানো। যেখানে তাদের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব। আমরা এখন প্রায়,,...." জঙ্গলমহল হাসছে"। তারমানে জঙ্গলমহলের আদিবাসীদের জীবনযাত্রা অনেকটা সহজ হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে কি তাই হয়েছে, তাদের হাসি কি একটু ফিকে হয়ে যায়নি। এই সমস্ত খবর আমরা কেউ রাখি না। শুধুমাত্র আমরা বলতেই ভালোবাসি যে... জঙ্গলমহল হাসছে।

GEO-TALK
A Journal of Man and Environment
Journal available at: http://www.hbcnht.edu.in/college_magazine.php

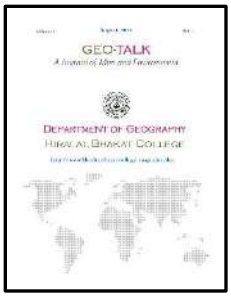

শিল্প সমাজ

পূজা মণ্ডল*

Semester-II, Department of Geography, Hiralal Bhakat College, Nalhati, Birbhum

ARTICLE INFO

Keywords:
শিল্প-সমাজ
কুটির শিল্প
বিশ্বায়ন
ইন্টারনেট

Article history

Received: 8th July, 2021
Revised: 30th July, 2021
Accepted: 12th August, 2021
© ***Dept. of Geography, Hiralal Bhakat College***

ABSTRACT

শিল্পবিপ্লব এর মাধ্যমে শিল্পাসমাজের প্রসার ঘটে। প্রাথমিক অবস্থায় কুটির শিল্পের মাধ্যমে শিল্পভিত্তিক সমাজের বিকাশ ঘটলেও পরবর্তীকালে বৃহৎ শিল্পের মাধ্যমে শিল্পভিত্তিক সমাজ বিশাল আকার ধারণ করে।

ভূমিকা

মানব সমাজের উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর হলো শিল্প সমাজ। শিল্প-সভ্যতার আবির্ভাব ঘটেছে কৃষি সূচনার অনেক পরে। কৃষি বিপ্লবের সূচনার মধ্যে দিয়ে যেমন কৃষি বিকাশ ঘটেছে তেমনি শিল্প বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সমাজের শিল্পের বিকাশ ঘটেছে। শিল্প সমাজ গড়ে ওঠায় নতুন নতুন যন্ত্রপাতি, প্রযুক্তি আবিষ্কার হয়েছে যার ফলে কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তে শিল্পভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। এই সমাজের বিকাশের সাথে সাথে মানুষও কুটির শিল্পের পরিবর্তে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে বৃহৎ ও ভারী শিল্পকারখানা গড়ে তুলেছে যার ফলে আর্থসামাজিক ক্ষেত্রেও অমূল পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। শিল্প সমাজের প্রধান আলোচ্য বিষয় শিল্প উৎপাদন হলেও শিল্প সমাজের অগ্রগতির ফলে কৃষিতে অনেক পরিবর্তন দেখা যায় এবং পরিবর্তন দেখা যায় সমাজ জীবনেও। আমরা এখন দেখতে পাই যে গ্রামের শ্রমিকরা কারখানায় কাজ করে অর্থ উপার্জন করছে এবং শহরে গিয়ে বসবাস করছে। নারী সমাজও পরিবর্তিত হয়েছে তারা লেখাপড়া করে আত্মনির্ভরশীল হচ্ছে। শিল্পের প্রসারের ফলে সমাজ ধীরে ধীরে আরও উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছে।

সংজ্ঞা

কৃষি সমাজের সামাজিক পরিকাঠামো, উৎপাদন পদ্ধতি এবং অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবর্তনের জন্য এবং বিপুল পরিমাণ অর্থ উপার্জনের জন্য মানুষ যখন উন্নত যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে অর্থ উপার্জনের প্রশস্ত করে তোলে তখন তাকে শিল্প সমাজ বলে।

প্রথম দিকে শিল্প সমাজ বলতে ক্ষুদ্র আয়তন বিশিষ্ট শিল্প ও কুটির ভিত্তিক হস্তশিল্প কে বোঝানো হতো। সেই হস্তশিল্প থেকে মানুষ নিজস্ব শ্রম দ্বারা দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করে অর্থ উপার্জন করতো। সেই সমস্ত দ্রব্যসামগ্রী এখন যন্ত্রের

*Corresponding author
E-mail address: pujamondal0543@gmail.com

মাধ্যমে উৎপন্ন হয় সেটা এখন শিল্প সমাজে পরিণত হয়েছে।

শ্রেনি বিভাগ

শিল্প সমাজ আলোচনার ক্ষেত্রে এর কতগুলি শ্রেণীবিভাগ আমরা দেখতে পাই সেগুলি হল -

(i) কুটির শিল্প:- এইসব শিল্প প্রধানত হস্ত নৈপুণ্যের ওপর নির্ভরশীল এবং অর্জিত মূলধনের পরিমাণ কম। একসঙ্গে 10 জন শ্রমিকের বেশি এই শিল্পে কাজ করে না।

(ii) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প:- এই সমস্ত শিল্প উন্নত যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তিনির্ভর এবং এখানে যান্ত্রিক শক্তির ব্যবহার হয় না। এই শিল্পে 10-20 জন শ্রমিক কাজ করে।

(iii) মাঝারি আয়তন শিল্প:- এই সমস্ত শিল্প যন্ত্রপাতি নির্ভর, শ্রম নির্ভর ও মূলধন ভিত্তিক গড়ে ওঠে।

(iv) বৃহদায়তন শিল্প:- এই সমস্ত শিল্প প্রধানত আধুনিক প্রকৃতির হয়। আধুনিক তথা যুক্তিনির্ভর ও বিদেশি বিনিয়োগ। মূলধনের পরিমানও যথেষ্ট কম।

চিত্র- ১

উদ্দেশ্য

শিল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হলো সমাজকে উন্নয়ন করে তোলা। মানব ইতিহাসের সমাজজীবনে শিল্প সমাজের উদ্ভব হঠাৎ কোনো ঘটনা নয়। মানুষ কম প্রয়োগ করে বেশি মাত্রায় অর্থ উপার্জনের জন্য অর্থাৎ নিজের প্রয়োজনের তাগিদে উদ্দেশ্যমূলকভাবে শিল্পের বিকাশের মাধ্যমে শিল্প সমাজ গড়ে তোলে। শ্রম নির্ভর হস্তচালিত কুটির শিল্প, কৃষি শিল্প না করে কিভাবে অল্প সময়ে অনেক বেশি অর্থ উপার্জন করা যায় এই সমস্ত চিন্তা মানুষকে শিল্প সমাজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে উৎসাহ যোগায়।

শিল্প সমাজ গড়ে ওঠার ফলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন উন্নতি হয়েছে তেমনি সমাজ জীবনে উন্নতি হয়েছে। মানুষের মধ্যে যে শ্রেণীগত জাতিভেদ প্রথা ছিল সেগুলি অনেকাংশে দূর হয়েছে। শিল্প মূলক কাজের জন্য যখন এক দেশের মানুষ অন্য দেশে যায় তখন তারা সেই দেশের ভাষা, সংস্কৃতি, আচার-আচরণ সম্বন্ধে জানতে পারে এবং সেই দেশের প্রতি তাদের একটি আগ্রহের সৃষ্টি হয়। মানুষ যতই শিল্পে ব্যবহার শিখছে ততোই নতুন নতুন আরো যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করছে সমাজে কলকারখানা, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং মানুষ প্রচুর পরিমাণে অর্থ উপার্জন করছে। শিল্প সমাজ গড়ে ওঠায় মানুষ শিক্ষিত হয়েছে যার কারণে অপরাধমূলক কাজকর্ম আগের তুলনায় কম হচ্ছে।

সমাজ জীবনে শিল্পের প্রভাব

সমাজ জীবনের পরিবর্তনের শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। শিল্পের অগ্রগতির ফলে সমাজের অগ্রগতি হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে শিল্প ও সমাজের অগ্রগতি হয়েছে শিল্প বিপ্লবের কারণে। শিল্প সমাজ শুরু হওয়ার পর সমাজে মানুষের কর্মসংস্থান, কর্মক্ষমতা, উৎপাদন, ব্যয় সব কিছুই বৃদ্ধি পেয়েছে তার সঙ্গে পরিবর্তন হয়েছে মানুষের আচার-আচরণের।

সমাজ ও শিল্প একে অপরের সঙ্গে গভীর ভাবে সম্পর্কযুক্ত। শিল্প সমাজ এমন একটি সমাজ যেখানে বিভিন্ন ধর্মের, বর্ণের, জাতির মানুষ একসঙ্গে বসবাস করে মানুষ সমাজবদ্ধ জীব তাই সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান - ধারণার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আগেকার দিনের সমাজব্যবস্থা ছিল পিতৃতান্ত্রিক যেখানে শুধুমাত্র পুরুষেরা সমাজের শাসন চালাত এবং সবকিছুতে তারাই কেবল সিদ্ধান্ত নিতে পারত। কিন্তু শিল্প সমাজের উন্নতির ফলে নারীরা পুরুষের সমান অধিকার পাওয়ার যোগ্য হয়ে উঠেছে। পুরুষ সমাজে নারীদের তেমন গুরুত্ব সম্মান দেওয়া হতো না কিন্তু শিল্প সমাজে নারীরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। নারী স্বাধীনতার একটি অন্যতম কারণ হলো শিল্প সমাজ। এই সমাজ গড়ে ওঠার জন্য নারীসমাজ এত উন্নত হয়ে উঠেছে। তারা ঘরের বাইরে গিয়ে পুরুষদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছে এবং অর্থ উপার্জন করছে। তারা পড়াশোনা করে শিক্ষিত হয়ে স্কুল, কলেজ, অফিস, আদালতে পুরুষদের সমতুল্য হয়ে কাজ করছে। যার কারণে পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার সাথে সাথে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাও এখন

দেখা যাচ্ছে। ফলে পরিবারের বিভিন্ন সদস্যদের মধ্যে বিশেষ করে নারীদের মধ্যে ব্যাক্তিস্বাধীনতা দেখা যাচ্ছে।

অর্থনৈতিক প্রভাব:

আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে শিল্পের প্রভাব অনস্বীকার্য। শিল্পের প্রসারের ফলে শিল্পভিত্তিক, খনিজ ভিত্তিক, বাজারভিত্তিক প্রকৃতি অর্থনৈতিক দিক গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন বিষয়ে বহুমুখী সুযোগ সুবিধা থাকায় নানা শ্রেণীর মানুষ একক ভাবে বা গোষ্ঠীবদ্ধভাবে মুনাফার জন্য এই শিল্প সমাজ প্রচলন করেছেন। শিল্প সমাজ গড়ে ওঠার ফলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়ে অত্যন্ত কার্যকরী ও লাভজনক উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রামীণ সমাজের কাছে তেমন সুযোগ সুবিধা না থাকায়গ্রামের মানুষ কর্মসংস্থানের তাগিদে শহরের পাড়ি দিচ্ছে এবং অর্থ উপার্জন করছে। যন্ত্রপাতি, প্রযুক্তি ব্যবহার করে আর্থিক লাভের পরিমাণ অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে শিল্প সমাজে মানুষের অর্থনৈতিক বৃদ্ধি দ্রুতহারে ঘটছে এবং মানুষের ক্রয় ক্ষমতাও বহুলাংশে বেড়েছে। শিল্প অর্থনীতির দ্বারা সমাজে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, রাস্তাঘাট প্রকৃতির বিকাশ ঘটেছে। গ্রামের যে সমস্ত ভূমিভাগ গুলি আগে পশুপালন, কৃষি কাজে ব্যবহার হতো সেগুলিতে এখন শিল্প-কলকারখানা, নতুন রাস্তাঘাট নির্মাণ হচ্ছে এবং ওই সমস্ত এলাকা গুলিও শিল্প এলাকায় রূপান্তরিত হচ্ছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিসরে মানুষ একটি সভ্য সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে।

শিল্প সমাজের সমস্যা

আমাদের শিল্প সমাজের যেমন অনেক ভালো দিক রয়েছে তেমনই তার সঙ্গে কিছু খারাপ দিকও রয়েছে। আমাদের দেশের বেশির ভাগটাই কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা কিন্তু শিল্প সমাজের প্রসারের ফলে সেই কৃষিজমি গুলি দিন দিন যেন হারিয়ে যাচ্ছে। শিল্প সমাজ গড়ে ওঠায় একদিকে যেমন প্রচুর পরিমাণে মুনাফা অর্জন হচ্ছে তেমনি অন্যদিকে পুঁজিবাদের উদ্ভব হচ্ছে সমাজে ধনী এবং গরীব, মালিক শ্রেণী এবং শ্রমিক শ্রেণীর মত সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। নিত্যনতুন কলকারখানা, কর্মসংস্থান গড়ে ওঠায় গরিব মানুষের বসবাস করার বস্তি এলাকা গুলি হারিয়ে যাচ্ছে ফলে তাদের বাসস্থান জনিত সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। এই যন্ত্রপাতি নির্ভর সমাজে মানুষ এতটাই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে যে তারা নিজেদের পরিবারকে সময় দিতে পারছে না যার কারণে সদস্যদের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হচ্ছে এবং পারিবারিক জীবন ক্রমশ ভেঙে যাচ্ছে।

চিত্র- ২

বিশ্বায়নের প্রভাব

বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে বেশি আলোচ্য বিষয় হলো বিশ্বায়ন। বিশ্বায়ন হল সমগ্র বিশ্ব ব্যাপি সংযোগ সাধনের একটি প্রক্রিয়া। বিভিন্ন কলাকৌশলের মাধ্যমে আমরা বিশ্বায়ন কে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করে থাকি। বিশ্বায়নের ফলে আমাদের ইন্টারনেট, মোবাইল ফোন, টেলিফোন, টিভির জগতে এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন এছাড়াও প্রভাব পড়েছে সংস্কৃতির জীবনে, কৃষিক্ষেত্রে এবং শিল্পক্ষেত্রে। বিশ্বায়নের ফলে শিল্প সংক্রান্ত কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, পণ্য ও মালামাল গুলি অল্প সময়ে স্বল্প খরচে দেশের অভ্যন্তরে ও দেশের বাইরে থাকে আমরা খুব সহজেই সংগ্রহ করে সেগুলোকে কাজে লাগিয়ে আমরা অনেক অর্থ উপার্জন করি ঠিকই কিন্তু অন্যদিকে আবার আমাদের আয় বাড়ার সাথে সাথে আমাদের দেশীয় মুদ্রার মূল্য হ্রাস পাচ্ছে। ফলে আমাদের দেশগুলির ব্যাংক, শিল্প মালিকানায় বিদেশি মালিকানার প্রভাব দেখা যাচ্ছে। এই বিশ্বায়নের ফলে যেমন বিদেশে বিভিন্ন দেশীয় শিল্প (যেমন - গাড়ি শিল্প, ইস্পাত শিল্প প্রভৃতি) প্রভাব বিস্তার করছে তেমনি দেশ থেকে দেশীয় কোম্পানিগুলোর নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে যার ফলে ভারতের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সময়ের সাথে সাথে কলকারখানা গুলোতে আধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রমশ বেড়েই যাচ্ছে ফলে কারখানায় শ্রমিকদের চাহিদা কমে যাচ্ছে যার কারণে বেকারত্বের সৃষ্টি হচ্ছে।

উপসংহার:

শিল্প সমাজের বিভিন্ন দিক গুলি আলোচনা করার সময় আমরা শিল্প সমাজের কিছু ভালো দিক দেখলাম এবং কিছু

খারাপ দিকও দেখলাম। শিল্প সমাজ গড়ে ওঠার ফলে মানুষের অর্থনীতির সঙ্গে পরিচয় হয়েছে এবং অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে। অত্যাধিক কলকারখানায় গড়ে ওঠায় জল দূষণ, বায়ু দূষণ, শব্দ দূষণ জনিত বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। যদিও এই সমস্ত সমস্যাগুলিকে এড়িয়েই আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে আর যদি এগিয়ে না যায় তাহলে হয়তো আমাদের সমাজের উন্নতি কখনো সম্ভব হবে না।

চিত্র- ৩

GEO-TALK
A Journal of Man and Environment
Journal available at: http://www.hbcnht.edu.in/college_magazine.php

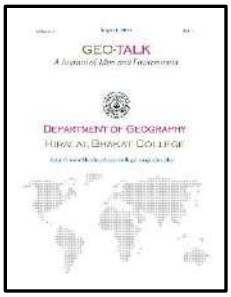

শিল্পোত্তর পরবর্তী সমাজ

পূজা প্রামাণিক*

Semester-II, Department of Geography, Hiralal Bhakat College, Nalhati, Birbhum

ARTICLE INFO

Keywords:
শিল্প-পরবর্তী সমাজ
ব্র্যান্ড ভ্যালু
পুঁজিবাদ
উপনিবেশ

Article history

Received: 8th July, 2021
Revised: 30th July, 2021
Accepted: 12th August, 2021
© ***Dept. of Geography, Hiralal Bhakat College***

ABSTRACT

শিল্পবিপ্লব এর পরে প্রাথমিক ও গৌণ অর্থনৈতিক কার্যকলাপের তুলনায় পরিষেবা খাতে বেশি মনোযোগ আকর্ষণ হয়।

সমাজবিজ্ঞানে শিল্পোত্তর পরবর্তী সমাজ হলো সমাজ পরিবর্তনের এমন একটি পর্যায় যেখানে পরিষেবা খাত (Service sector) উৎপাদন খাতের (Manufacturing sector) তুলনায় আর্থিক দিক থেকে অনেক বেশি সমৃদ্ধি লাভ করে এবং অর্থনীতির মূল ভিত্তি হয়ে ওঠে অর্থাৎ প্রাথমিক ও দ্বিতীয় ক্ষেত্রের অর্থনৈতিক কার্যাবলি থেকে তৃতীয় ও চতুর্থ স্তরের অর্থনৈতিক কার্যাবলি এখানে অনেক বেশি প্রাধান্য পায়। বিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে উন্নত দেশগুলিতে বিজ্ঞান ও উচ্চ প্রযুক্তির বিকাশ তাদের আর্থসামাজিক অবস্থাকে অনেক বেশি সক্রিয় করে তুলেছিল । যার ফলস্বরুপ শিক্ষিত ও দক্ষ শ্রমিক এর প্রয়োজনীয়তা আরো উন্নত প্রযুক্তির উদ্ভাবন শিল্পোত্তর পরবর্তী সমাজের সূত্রপাত ঘটায়। কিন্তু আবার অধিকাংশ সমাজবিজ্ঞানী মনে করেন যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ এবং ১৯৫০ এর শেষ দশকে এই সমাজের সূচনা হয়। তবে "Post Industrial Society" শব্দটির প্রথম উৎপত্তি ঘটে ফরাসি সমাজবিজ্ঞানী আলেন তৌরেনের দ্বারা। এরপর ১৯৭৩ সালে সমাজবিজ্ঞানী ড্যানিয়েল বেল তার ***"The Coming Of post-Industrial Society : A Venture in Social Forecasting"*** বইটিতে 'উত্তর পরবর্তী শিল্প সমাজ' বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার পর শব্দটি বিশ্লেষণধর্মী হয়ে ওঠে। এবং সমাজবিজ্ঞানের আলোচনার বিষয় হিসেবে তথ্যসমাজ, ফোর্ডিজম, নেটওয়ার্ক সোসাইটির মতো শব্দ গুলির উদ্ভব ঘটে।।

এই সমাজ দৈহিক শ্রম ও শক্তির পরিবর্তে নূতন নূতন চিন্তাধারার উদ্ভাবনে বিশ্বাসী । "মানুষের জ্ঞান"এই সমাজে একটি মূল্যবান সম্পদ হিসেবে

*Corresponding author
E-mail address: pramanikpuja042@gmail.com

বিবেচিত। অর্থাৎ প্রযুক্তিগত ও পেশাদার কর্মী যেমন চিকিৎসক, আইনজীবী,কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার, ব্যাংকারদের সঙ্গে দ্বিতীয় স্তরের অর্থনৈতিক কাজের সাথে যুক্ত উৎপাদক ও শ্রমজীবী শ্রমিকদের প্রতিস্থাপনের ফলে উৎপাদিত পণ্য দ্রব্য সরাসরি সংস্থাগুলিতে স্থানান্তরিত হয়।বেশীরভাগ সংস্থাগুলি সরাসরি পণ্য উৎপাদন করে না। শিল্প উৎপাদন থেকে প্রাপ্ত পণ্যের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি,বাজারজাত করার পদ্ধতি কে নিয়ন্ত্রণ করে। 'ব্যবহারিক জ্ঞানের' থেকে 'তাত্বিক জ্ঞানের ' প্রয়োগ এই সমাজে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যা পণ্য দ্রব্য উৎপাদনের, স্থানান্তরের পাশাপাশি মানুষের মধ্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাহিদা তৈরিতে সক্ষম। প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান এর মধ্যে যোগসূত্রের ফলে কম্পিউটার (Computer), ইন্টারনেট (Internet), মোবাইল (Mobile) যোগাযোগ এবং তথ্যপ্রযুক্তির মতো শিল্পোগুলি ভাল ভাবে বিকশিত হয়। উৎপাদনে স্বয়ংক্রীয় (Automation) পদ্ধতির উদ্ভাবন,তথ্য প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতির প্রচলন কায়িক শ্রম প্রদানকারী মানুষের মান গুরুত্বের হ্রাস ঘটায় এবং পেশাদারী কর্মীদের মান ও গুরুত্বের বৃদ্ধি ঘটায়। তথ্য ও প্রযুক্তি নির্ভর বিষয়গুলিকে সুকৌশলে ও গুরুত্ব সহকারে প্রয়োগ ও প্রসার ঘটতে দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ তথ্যনির্ভর স্থাপত্যকর্ম, সাইবারনেটিক্স, বিভিন্ন ধরনের গেম থিওরির কথা বলা যায়। পলিটেকনিক ইনস্টিটিউশন (IIT), বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে উচ্চ শিক্ষার উপর আরো বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। যারা উত্তর পরবর্তী সমাজের জন্য নতুন প্রযুক্তি তৈরি করে। আইডিয়া উৎপাদন করে ও গাইড করে। ফলস্বরুপ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিভিন্ন বেসরকারি পরিষেবাগুলি দুর্দান্ত সম্প্রসার ঘটে। উদ্ভাবনের নিরবিচ্ছিন্নতা ও পরিবর্তন মানব সমাজ ও সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটায়। গবেষণামূলক কাজ কর্ম,আবিষ্কার,যোগাযোগ ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তনের ফলে মানুষের চিন্তাধারা ও কাজের ধরনের মধ্যে পরিবর্তন আসে।যার ফলে মানুষ পরিষেবা সংক্রান্ত কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আঠারো শতকের শেষের দিকে পরিষেবা মূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত কর্মীসংখ্যা ছিল খুব কম কিন্তু বর্তমানে মোট জনসংখ্যার প্রায় 70% জনসংখ্যা পরিষেবা সংক্রান্ত কাজের সঙ্গে যুক্ত।অর্থাৎ এই সমাজের সেবা খাতের সঙ্গে অর্থনীতির একটি স্পষ্ট ছাপ লক্ষণীয়।যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও জাপান এর মত শিল্পোন্নত ও পুঁজিবাদী দেশগুলিতে খুব ভালোভাবে লক্ষ্য করা যায়। ঐতিহাসিক অর্থ শিল্পোত্তর পরবর্তী সমাজ একটি শিল্পোন্ন সমাজের পরিবর্তিত রূপ হলেও এরা একটি অন্যটির দ্বারা প্রতিস্থাপিত নয়। কারণ একটি শিল্পোন্নত সমাজ উৎপাদন পণ্য তৈরি ও পরিবহনের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত। অন্যদিকে শিল্পত্তর পরবর্ততী সমাজ তথ্য ও যোগাযোগ এর দিক নির্দেশক এর সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। একটি শিল্পোন্নত সমাজ শ্রমের জন্য মূলধন কে প্রতিস্থাপন করে এবং শিল্পের অগ্রগতি ঘটায়। কিন্তু পরবর্তী সমাজ মূলধন ও জ্ঞান উভয় কে কাজে লাগিয়ে তথ্য ও প্রযুক্তির সাহায্যে উৎপন্ন দ্রব্য কে ব্যাপকভাবে মানুষের কাছে পৌঁছে দেয় এবং প্রায়শই মূলধনের সাশ্রয় করে। একটি শিল্পোন্নত সমাজে উৎপাদিত অর্থের একটি বড় অংশ শ্রমিকরা বেতন হিসেবে পেত। কিন্তু পরবর্তী সমাজে উৎপাদিত মোট অর্থের বেশীর ভাগটা বিভিন্ন বহু জাতিক সংস্থাগুলি পেয়ে থাকে। সংস্থাগুলি ক্রেতাদের বিভিন্ন রকম চাহিদা পছন্দের কথা মাথায় রেখে উৎপাদন করে। যেখানে একই জায়গায় সমস্ত জিনিস উৎপাদন এর পরিবর্তে বিভিন্ন পণ্য দ্রব্য বিভিন্ন জায়গায় উৎপাদিত হয় এবং এগুলি একত্রীকরণের মাধ্যমে 'ব্রান্ড' তৈরি করে।আর এই 'ব্র্যান্ড ভ্যালুই' বৃহৎ মুনাফা লাভের পথকে সুগম করে।।

প্রকৃত অর্থে এই সমাজ মানব সভ্যতার অগ্রগতি, রাষ্ট্রকে অর্থনৈতিক দিক থেকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি সমাজের পুঁজিবাদের (Capitalism) প্রসার ও ব্যাপকতাকে অনেক বেশি সুদৃঢ় করে। যা শুরু হয়েছিল মধ্যযুগের ইউরোপে প্রচলিল সামন্ত প্রথার মাধ্যমে। সেই সময় ইউরোপের অর্থনৈতিক পরিকাঠামো সামন্ততন্ত্ররের উপর প্রতিষ্ঠঠিত ছিল। তাহলে এখন বলতে হয় সামন্ততন্ত্র (Feudalism) কি? সামন্ততন্ত্র কে পুঁজিবাদের প্রাথমিক পর্যায় বলা যেতে পারে। অর্থাৎ সামন্ততন্ত্র হলো এমন একটি সমাজ কাঠামো যে সমাজে বেশিরভাগ মানুষ গরীব এবং মুষ্টিমেয় কতগুলি মানুষ সম্পদ ও অর্থের অধিকারী।যেখানে শ্রমজীবী ও গরিব সম্প্রদায় কে কাজে লাগিয়ে ধ্বনি সম্প্রদায় সৃষ্টি করা হয়। তবে এই প্রথা ইউরোপ এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এরপর উনিশ শতক নাগাদ ইউরোপের বিভিন্ন দেশ যেমন ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, ডেনমার্ক, স্পেন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বহির্বিশ্বের সঙ্গে সংযোগ

স্থাপন করে যার। ফলস্বরূপ সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের উদ্ভব ঘটে। সাধারনত অর্থনৈতিক ও সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে দুর্বল কোন দেশ যখন অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে শক্তিশালী কোন দেশের অধীনস্থ হয় তখন তাকে সাম্রাজ্যবাদ (Imperialism) বলে। ইউরোপের এইসব দেশগুলি বহির্বিশ্বের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করার ফলে তারা বিভিন্ন দেশে নিজেদের উপনিবেশ(Colonies)স্থাপন করে। সমাজে শাসক ও শোষক শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। এবং উপনিবেশ থেকে প্রাপ্ত প্রচুর 'সম্পদ'সঞ্চিত হতে থাকে ।এই সম্পদকে কাজে লাগিয়ে কিভাবে আরো বেশি অর্থ পাওয়া যায় পুঁজিপতিরা সেই প্রচেষ্টায় শুরু করে তার ফলে শিল্প বিপ্লবের সূচনা হয়।নতুন নতুন যন্ত্রের আবিষ্কার ,বৃহৎ শিল্প কারখানা, হস্তের পরিবর্তে যন্ত্রের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। এই শিল্পোন্নয়ন শিল্প বিপ্লব নামে পরিচিত। এই শিল্প বিপ্লব পুঁজিবাদের পথকে আরও বেশি প্রশস্ত করে।সমগ্র বিশ্বে আর্থসামাজিক অবস্থায় এক পরিবর্তন আসে এবং কৃষিভিত্তিক সমাজ শিল্প সমাজে স্থানান্তরিত হয়। এবং বিবর্তিত হয়ে শিল্পত্তর পরবর্তী সমাজের সূচনা করে। যে সমাজে পুঁজিবাদের (Capitalism) একাধিপত্য খুব স্পষ্ট।

শিল্প সমাজ হোক বা শিল্পত্তর পরবর্তী সমাজ সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের যে আর্থসামাজিক কাঠামো তার কি কোন পরিবর্তন হয়েছে? বরং বলা যায় সময়ের সঙ্গে এটি আরও বেশি বিস্তৃতি লাভ করেছে।মধ্যযুগে যা ইউরোপের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল বর্তমানে তা বিশ্বজুড়ে বিদ্যমান। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ২০১৪ সালের জানুয়ারিতে অক্সফামের প্রকাশিত এক প্রতিবেদন অনুসারে বিশ্বের অর্ধেক সম্পদ এর মালিকানা মোট জনসংখ্যার মাত্র 1% এর মধ্যে বন্টিত। সুতরাং বলা যায় যে একটি শিল্পোন্নত সমাজে যেসব সমস্যা সৃষ্টি হয়েছিল শিল্পত্তর পরবর্তী সময়েও তার কোনো পরিবর্তন হয়নি। জাতিগত ভেদাভেদ অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে ঠিকই কিন্তু অর্থনৈতিক বৈষম্য কি দূর হয়েছে? সমাজে মালিক ও শ্রমিক শ্রেণীর মত ধারনাগুলি একইরকম রয়েছে।উচ্চপ্রযুক্তি ও উচ্চ শিক্ষার প্রসার ঘটলেও তার সার্বিকতা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। জ্ঞান ও সৃজনশীল ব্যক্তির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা শ্রমজীবী শ্রমিক শ্রেণীর গুরুত্বের হ্রাস ঘটাচ্ছে ।প্রযুক্তি বিদ্যায় পারদর্শীতা, জ্ঞান এবং অর্থ যেহেতু এই সমাজে একটি মানুষের সামাজিক অবস্থান, সংস্কৃতি ও জীবনযাপন এর মান কে নির্ধারণ করে। তাই একই সমাজে বসবাসকারী দুটি মানুষের মধ্যে জীবনধারণের পদ্ধতির মধ্যে বিভেদ লক্ষ্য করা যায়। তাই 'জ্ঞানভিত্তিক সমাজ' হোক বা'শিল্পত্তর পরবর্তী সমাজ' নিম্নবিত্তের অবস্থা সর্বদা শোচনীয় এবং অপরিবর্তনশীল। কারণ পুঁজিবাদের অর্থই হলো সকলের ব্যয়ে অল্পসংখ্য এর সমৃদ্ধি।

পরিশেষে বলা যায় যে শিল্পোত্তর পরবর্তী সমাজ মানুষকে যেমন কিছু সমস্যার সম্মুখীন করেছে তেমনি মানব সভ্যতার অগ্রগতি কে আরো এক ধাপ সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে।আর মানব সভ্যতার অগ্রগতি আমরা সকলেই চাই। তবে তা সাম্যবাদী (Communist) সমাজ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে।

GEO-TALK
A Journal of Man and Environment
Journal available at: http://www.hbcnht.edu.in/college_magazine.php

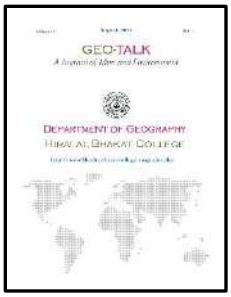

গ্রামীণ সমাজ ও উন্নয়ন

ত্রিশা বিশ্বাস*

Semester-II, Department of Geography, Hiralal Bhakat College, Nalhati, Birbhum

ARTICLE INFO

Keywords:
গ্রামীন সমাজ
কুটির শিল্প
পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা
শান্তিনিকেতন

Article history

Received: 8th July, 2021
Revised: 30th July, 2021
Accepted: 12th August, 2021
© Dept. of Geography, Hiralal Bhakat College

ABSTRACT

গ্রামীন এলাকায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে মানবিক সম্পদ ও বস্তুগত সম্পদ এর ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রামীন উন্নয়ন সম্ভবপর হয়ে ওঠে। গ্রামীন উন্নয়ন এর ব্যাপারে স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং আরো অনেকে ধারণা দেন। এই ডিজিটাল যুগে পরিবেশের কোনো ক্ষতি না করে গ্রামীন উন্নয়নকে জোর দিতে হবে।

ভূমিকা

সমাজ ও সমাজ কাঠামোর প্রধান রূপ হচ্ছে গ্রামীণ সমাজ। সভ্যতার সূচনা হয়েছে গ্রামীণ সমাজ কে কেন্দ্র করে যা পর্যায়ক্রমে আরো বিকশিত হয়েছে ।গ্রামীণ সমাজ হচ্ছে শহরের যান্ত্রিক সভ্যতার থেকে দূরের একটি বিচ্ছিন্ন জনপদ। যেখানে রয়েছে চারিদিকে আবাদযোগ্য জমি , ফসলের মাঠ , স্বল্প ঘনত্বের জনবসতি মোটামুটি দূরত্ব বজায় রেখে আস্তার পর একটা বাড়ি , প্রতি টা বাড়িতে বাস করে এক বা অনেক গুন পরিবার। অন্য গ্রাম থেকে সনাক্ত করণের জন্য প্রতিটি গ্রামেরই রয়েছে নিজস্ব নাম ও সুনির্দিষ্ট পরিসীমা। গ্রামের জন্য সমষ্টি র মধ্যে সম্প্রদায়ের মত স্বতন্ত্র মূল্যবোধ , গ্রামীণ চেতনা , নিজস্বতা , পৃথক সামাজিক ও অধিবাসীদের ঐক্য

চিত্র: ১

*Corresponding author
E-mail address: trishabiswas1946@gmail.com

পরিলক্ষিত হয় । গ্রামের অধিবাসীদের দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত সমাজই গ্রামীণ সমাজ বলে বিবেচিত হয় ।
পল্লী উন্নয়ন: পল্লী উন্নয়ন বলতে সাধারণত জীবন ও অর্থনৈতিক মান উন্নয়নের প্রক্রিয়া কে বোঝানো হয় যা পৃথক ও বিক্ষিপ্ত জনবহুল এলাকার সাথে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত । ভারত সহ বিভিন্ন উন্নয়ন শীল দেশ যে সমস্যা র সম্মুখীন হচ্ছে তাতে তাদের প্রাণের ঝুঁকি বাড়ছে ।তাই গ্রামীণ উন্নয়ন করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

' উন্নয়ন ' এমন একটি ধারণা যাকে আমরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে পারি। উন্নয়ন বলতে সাধারণত বস্তুগত ও মানবিক সম্পদের যথার্থ ব্যাবহার ও সমৃদ্ধি করন বোঝায়। প্রচলিত ধারায় পল্লী উন্নয়ন প্রাকৃতিক সম্পদ কে ঘিরে কেন্দ্রীভূত হয়েছে । কিন্তু বর্তমানে বৈশ্বিক উৎপাদন ও প্রাকৃতিক শহরাঞ্চলের দ্রুত পরিবর্তনের ফলে গ্রাম্য পরিবেশে বৈশিষ্ট্যাবলী দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে ।

গ্রামীণ উন্নয়ন বলতে গ্রামীণ এলাকার মধ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কর্মসূচির দ্বারা মানবিক সম্পদ ও বস্তুগত বিভিন্ন সম্পদের যথার্থ ব্যাবহার মধ্যে দিয়ে দুর্দশা গ্রস্থ মানুষের জীবন প্রণালীর মান উন্নয়ন কেই বোঝানো হয়।

প্রেসিডেন্ট লাসিয়ার নায়ার বলেন -***' a rural development is a policy of national development'.***

পল্লী উন্নয়ন এর গুরুত্ব: গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাতিত উন্নয়ন শীল দেশের সর্বমুখী কল্যাণ সম্ভব নয়। তাই আদর্শ শিক্ষা ও কর্ম প্রেরণার ও একত্রীকরণের দ্বারা আত্মনির্ভরশীল করে তুলতে হবে । তাই কবি গুরুর সাথে তাল মিলিয়ে বলতে পারি - " ফিরে চল ফিরে চল মাটির টানে"
এই উপরিউক্ত লাইন টি বর্তমানে এর এই ভয়াবহ করোনা আবহে বিপুল ভাবে প্রমানিত। মানুষ যদি গ্রামের উন্নয়নের ব্যাপারে সতর্ক হতো তাহলে আজ এই ভয়াবহ পরিস্তিতি সম্মুখীন হতাম না ।গ্রামের মানুষ যদি সংঘবদ্ধ হয়ে বিপুল প্রচেষ্টা র মধ্যেদিয়ে তাদের কর্মসংস্থান করতে পারতো তাহলে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে দুর দেশে পাড়ি দিতে হতো না । উপযুক্ত সচেতনতার অভাবে এত বেশি প্রাণ হারাতে হতো না। র গ্রামীণ কর্মসংস্থান হলে নারী রাও আত্মনির্ভর জীবন পাবে। অবহেলা অন্ধকার জগৎ থেকে সমাজে তারা উন্নয়ন এর আলী দেখবে । কিন্তু গ্রামীণ পরিবেশ তার নিজ বৈশিষ্ট্য গুনে বহু শহুরে মানুষের স্বস্তির নিঃশ্বাস এর জায়গা হয়ে উঠেছে। তাই গ্রামীণ উন্নয়ন এর সাথে দূষণমুক্ত পরিবেশ বজায় রাখাকে মানুষের কর্তব্য বলে ভাবতে হবে তবেই গ্রাম উন্নতির শিখরে পৌঁছবে গ্রামীণ সমাজ ও তার উন্নয়নে বিভিন্ন মনিষীদের ভূমিকা : স্বাধীনতার পূর্বে যে সমস্ত মনিষ দের চিন্তা ধারা র ওপর ভিত্তি করে গ্রামীণ উন্নয়ন পরিকল্পনা গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন স্বামী বিবেকানন্দ , রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাত্মা গান্ধী।

স্বামী বিবেকানন্দের গ্রামীণ উন্নয়ন চিন্তাধারার মূল ভিত্তি ছিল মানুষের সেবা ও কর্মযোগ তিনি গরীব অবহেলিত ও পীড়িত মানুষকে শিব জ্ঞানে গ্রহণ করেছেন এবং মানুষের সেবা ছিল তার কাছে উপাসনা। ভারতের উন্নয়ন বলতে তিনি বুঝতেন সার্বিক উন্নয়ন ও তিনি সর্বদা সকল জাগতিক সমস্যা সমাধানের কথা বলতেন। তিনি নারী জাতির উন্নয়ন দারিদ্র শ্রেণীর উন্নয়ন ও তাদের শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলতেন। বিবেকানন্দের চিন্তায় জাতীয় উন্নয়ন ঘটতে পারে সকল শ্রেণী ও সকল ধর্মের মানুষের সমন্বয়ের মাধ্যমে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও গ্রামীণ উন্নয়নের উপর বিশেষভাবে জোর দিয়েছিলেন। মানুষের আত্মবিশ্বাস ও দারিদ্র দূরীকরণের উপায় গুলিকে তুলে ধরেছিলেন। তিনি পল্লী সাধন ও উন্নয়নের জন্য নিজের চিন্তাধারা বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য তিনি শান্তিনিকেতনে একদিকে শিক্ষা ও অন্যদিকে কর্মক্ষেত্র হিসেবে শ্রীনিকেতন তৈরি করেন ।রবীন্দ্রনাথ এর মূল ভিত্তি হলো পুজোর সাথে মানবসেবা কে একাত্ম করা।
মহাত্মা গান্ধী অর্থনৈতিক চিন্তাধারার মূলকেন্দ্র হচ্ছে গ্রামোন্নয়ন ও স্বরাজ অর্জন। গ্রামোন্নয়নের মূলভিত্তি বলতে তিনি স্বনির্ভরতা। তাই মানুষকে উৎপাদনশীল করার জন্য খাদি ও চরকার প্রচলনের। তিনি গ্রামের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটানোর লক্ষ্যে আর্থসামাজিক পরিবর্তন এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা একসাথে পক্ষপাতী ছিলেন। মনে করতেন গ্রামীণ ভারতের উন্নতির ছাড়া সমগ্র ভারতবর্ষের উন্নয়ন সম্ভব নয়।

প্রাচীন গ্রাম থেকে আধুনিক গ্রামে রূপান্তরের বিভিন্ন পদক্ষেপ: একটি ক্ষুদ্র গ্রাম যেটি প্রাচীনকালে কয়েকটি বসতি মিলে গড়ে উঠেছিল কিন্তু সময়ের সাথে সাথে এই গ্রামগুলি বৃহৎ আকার ধারণ করেছে। কোন গ্রাম আবার বর্তমানে শহরে পরিণত হয়েছে , ঘটেছে তার উন্নয়ন। প্রাচীন কাল থেকে ও ও বর্তমানে কিছু সরকারি পদক্ষেপ ও সামাজিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে যার মাধ্যমে গ্রামের গঠন অর্থাৎ রাস্তাঘাট বাড়িঘর রোজগার স্বাস্থ্য উন্নয়ন ঘটেছে এক্ষেত্রে যে সকল কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে তা হল-

অতীতকালে গ্রাম উন্নয়নের উদ্যোগ: ভারতবর্ষের প্রায় প্রতিটি গ্রাম স্বয়ংসম্পূর্ণ কিন্তু গ্রামকে আরো উন্নয়ন করার ভাবনা সেই অতীতকাল থেকে ছিল যেমন-

১. প্রাক-ব্রিটিশ আমলে পল্লী পূনর্গঠনের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নিতে গ্রামের মানুষ। যেমন কুটির শিল্প কৃষি কাজ উন্নয়ন ও অন্যান্য জীবিকা ।এছাড়া মুঘল সাম্রাজ্যের স্ব-শাসিত গ্রামের ধারণা ফলে স্বনির্ভর গ্রাম গঠনের পথ প্রশস্ত হয।

২. ব্রিটিশ আমলে গ্রামীণ অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতারএকটি দিচ্ছিল যেমন কৃষি ব্যবস্থা অন্য আরেকটি দিক ছিল গ্রামীণ কারিগরি শিল্প। কিন্তু ব্রিটিশ আমলে সস্তা ব্রিটিস্ ও অ ব্রিটিশ যন্ত্রের তৈরি জিনিসপত্রের অনুপ্রবেশের জন্যে গ্রামীণ কারিগরি শিল্প অধঃপতন হয়। তাই মহাত্মা গান্ধী ও তৎকালীন কিছু নেতার উদ্যোগে সর্বভারতীয় তন্তুবায় সমিতি গঠন করা হয় ও পেটিএম গ্রামীণ শিল্প সমিতি স্থাপন করা হয়। গ্রামীণ কৃষকদের উন্নতির জন্য সারা ভারত কিষান সভা গঠিত হয়

৩. এছাড়া প্রাক স্বাধীনতার আমলে পল্লী পূনর্গঠনের জন্য কবিগুরু র শ্রীনিকেতন প্রকল্প শান্তিনিকেতন প্রকল্প বেশ কার্যকরী হয়েছিল। এছাড়া পল্লীবাসী সমৃদ্ধির ও স্বাচ্ছন্দ্যে বিধানের জন্য ও তাদের অজ্ঞানতা কুসংস্কার দূর করার জন্য এ আই ব্রায়ান গুরগাঁও প্রকল্প চালনা করেন।

বর্তমানে গ্রাম উন্নয়ন এর জন্য কিছু কর্মসূচি

সম্পূর্ণ গ্রামীণ রোজগার যোজনা: ভারতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত 15 ই আগস্ট 2001, গ্রামাঞ্চলের অতিরিক্ত মজুদকৃত কর্মসংস্থান পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। এই উদ্দেশ্যে 25 শে সেপ্টেম্বর 2001 থেকে কার্যকরী হয় একটি নতুন প্রকল্প যার নাম দেয়া হয় 'সম্পূর্ণ গ্রামীণ রোজগার যোজনা (SGRY)' |

পানীয় জল সরবরাহ দপ্তর: গ্রামের মানুষের জন্য জল সরবরাহ ও সুস্বাস্থের সুযোগকে সম্প্রসারণ করাই হল এই দপ্তরের কাজ। সজলধারা গ্রামীণ জল সরবরাহ কর্মসূচি (ARWSP) ও সার্বিক স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচি (TSP) এই দপ্তরের কাজ।

জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি কর্মসূচি 2006 (NREGS) National Rural Employment Gurantee Scheme: ২০০৫ এর ১৫ ই সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি আইন প্রকল্প চালু করেন। চাহিদার ভিত্তিতে প্রতিটি গ্রামীণ পরিবারকে বছরে কমপক্ষে 100 দিনের অদক্ষ শ্রমিকের কাজ দেওয়ার গ্যারান্টির উদ্দেশ্যে এই আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রথম কোন প্রকল্পের কাজ দেওয়ার ওকাজ দিতে না পারলে বেকার ভাতা দেওয়ার গ্যারান্টি দেওয়া আছে। এই আইনের 4 নম্বর ধারা অনুযায়ী বাস্তবায়নের জন্য প্রত্যেক রাজ্যের ছয় মাসের মধ্যে একটি কর্মসংস্থান প্রকল্প তৈরি করবে।

ইন্দিরা আবাস যোজনা: ইন্দিরা আবাস যোজনার প্রাথমিক লক্ষ্য হলো অনুদান বাড়িয়ে দরিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী তপশিলি জাতি ও উপজাতি, দাসত্ব মুক্ত শ্রমিক শুধু নয় এমন গ্রামীণ দরিদ্র নতুন বাস গৃহ নির্মাণ ও সেইসঙ্গে বসবা অযোগ্য কাঁচা বাড়ি কে পাকা বাড়ি তে রুপান্তর করা। বাড়ি নির্মাণের জন্য সমতলে ইউনিট পিছু কুড়ি হাজার টাকা এবং পার্বত্য ও দুর্গম অঞ্চলে 22000 টাকা কাঁচাপাকা গৃহে রুপান্তরের জন্য 10000 টাকা দেওয়া হয়।

বহুমুখী স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ নিবিড় স্বাস্থ্য বিধানকর্মসূচি: জেলা স্তর থেকে গ্রাম স্তর পর্যন্ত স্বাস্থ্যপরিসেবা দানের জন্য নানা রকম জেলা হাসপাতাল, মহাকুমা হাসপাতাল, প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র ইত্যাদির মাধ্যমে স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়া হয়। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, প্রশিক্ষিত দাই , কমিউনিটি হেল্থ গাইড রয়েছে যাদের দ্বারা শিশুমৃত্যু রোধ,নিরাপদ মাতৃত্ব ,টিকাকরণ, পরিবারকল্যাণ সম্পর্কিত পরিষেবা নানাভাবে পরিচালিত হয়।

জাতীয় গ্রামীণ রাস্তা উন্নয়ন সংস্থা: এটি হচ্ছে আরও একটি স্ব-শাসিত সংস্থা, যার কাজ হচ্ছে সড়ক যোজনা প্রকল্প রুপায়নের প্রযুক্তিগতভাবে উপদেশ প্রকল্পের, কাজের গুণ বিচার করার জন্য অস্থায়ী কর্মী নিয়োগ ও তত্ত্বাবধান ঠিকমত হচ্ছে কিনা দেখা ও মন্ত্রলয়কে সময় মতন জানানো।

যোগাযোগ: গ্রাম উন্নয়ন এর পরিপ্রেক্ষিতে সমন্বয়ের ক্ষেত্রে প্রাথমিক কাজ হচ্ছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে পরিষ্কার যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা। কারণ সমন্বয় উভয় দিক থেকেই প্রচেষ্টার একটা পদ্ধতি ও একে অপরের ওপর নির্ভরশীলতার নীতিতে গড়ে ওঠে ।

কৃষি উন্নয়ন: এই প্রকল্পের মাধ্যমে নিম্নবিত্ত চাষীদের বীজ রাখার পাত্র, সহায়ক মূল্যে বীজ , সার ও কীটনাশক এবার ব্যবস্থা রয়েছে। যাতে চাষীরা উন্নত প্রথা ও উন্নত প্রজাতি উদ্যানপালন ইত্যাদি ঠিকভাবে করতে পারে সেই জন্য ঋণ দেওয়া।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা: স্বাধীনতার পর ভারতীয় অর্থনীতির দুর্বল ও নিশ্চলতা দুর করার বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় । এজন্য ১৯৫০ সালে জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন গঠন করা হয়। ১৯৫১ সাল থেকে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের চেষ্টা করা হয়।

ব্যাংক: গ্রামের মানুষ যাতে তাদের কৃষি উন্নয়ন ও বাণিজ্যিক উন্নয়ন করতে পারে তার জন্য ব্যাংক নামক আর্থিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়। যেমন বাণিজ্যিক ব্যাংক ,সমবায় ব্যাংক কৃষি জমি উন্নয়ন ব্যাংক প্রভৃতি।
এছাড়া স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ,তহবিল গঠন ,গণশিক্ষা ,গ্রামীণ সংঘ প্রতিষ্ঠা, সহভাগী পরিকল্পনা ,মৎস্য চাষ, শৌচাগার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি একাধিক কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামকে ভবিষ্যতে আরও উন্নতির দিকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।

উপসংহার

গ্রাম থেকেই ভারতের যাত্রা শুরু। সেই গ্রাম এখন এই ডিজিটাল যুগে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সচ্ছন্দে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় অবৈজ্ঞানিক ভাবে উন্নয়ন ঘটানোর জন্য পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয় ও বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা ঘটে। বিশেষ করে দুর্যোগপূর্ণ এলাকার ক্ষতি বেশি হয় তাই উন্নয়নকে আরও বেশি কার্যকরী করে তুলতে হলে আমাদেরকে eco-friendly ভাবে কাজ করতে হবে অর্থাৎ শুধু অর্থনৈতিক কাঠামো ও রাস্তা ঘাট উন্নয়ন করলেই হবে না তার সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশের কাঠামো বজায় রাখতে হবে। পরিবেশবান্ধব বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করতে র যেমন - বনসৃজন , জলাভূমি রক্ষা রাস্তার ধারে গাছ লাগানো ইত্যাদি করতে হবে যার ফলে গ্রামের যে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সেটা বজায় থাকে। কারণ গ্রাম কে আধা গ্রাম ও আধা শহরে পরিণত করলে নানা সমস্যা হতে পারে তাই সব দিক মাথায় রেখে আমাদের এগিয়ে চলতে হবে।

GEO-TALK
A Journal of Man and Environment
Journal available at: http://www.hbcnht.edu.in/college_magazine.php

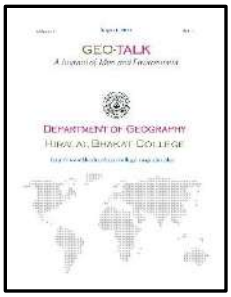

নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন

অভিজিৎ প্রামাণিক*

Semester-IV, Department of Geography, Hiralal Bhakat College, Nalhati, Birbhum

ARTICLE INFO

Keywords:
বৃহৎ বাঁধ
নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন
পুনর্বাসন
সর্দার সরোবর প্রজেক্ট

Article history

Received: 8th July, 2021
Revised: 30th July, 2021
Accepted: 12th August, 2021
© ***Dept. of Geography, Hiralal Bhakat College***

ABSTRACT

মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ ও গুজরাট এর ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে আরবসাগরে পতিত নর্মদা নদীর ওপর সর্দার সরোবর বাঁধ নির্মাণের ফলে নর্মদা উপত্যকায় মানুষের বাসস্থান সহ জীববৈচিত্র্য এর এক অপূরণীয় ক্ষতি হয়। 30 টি বৃহৎ বাঁধ, 133 টি মাঝারি বাঁধ এবং 3000 টি ছোট বাঁধ এবং এর সাথে 75000 কিলোমিটার ক্যানেল নির্মাণের ফলে ক্ষতির কথা মাথায় রেখে নর্মদা বাঁচানোর উদ্দেশ্যে Rally for the Valley Programme চালু করেন

Introduction:

বিংশ শতকের শেষার্ধে সংগঠিত পরিবেশ সুরক্ষার আন্দোলনসমূহের মধ্যে "নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন" অন্যতম। এটি ১৯৮০-র দশকে দক্ষিণ ভারতে শুরু হওয়া অন্যতম প্রধান একটি আন্দোলন।

ভারতের বৃহত্তম একটি নদী নর্মদা নদী যা ভারতের মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ ও গুজরাটের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সবশেষে আরব সাগরে পতিত হয়েছে। ১৯৪০ এর দশক থেকেই নর্মদা নদী উপত্যকার উন্নয়নের জন্য আলোচনা শুরু হয়, ১৯৫০ এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে প্রায় ১৫ টি জায়গা চিহ্নিত করা হয় বাঁধ নির্মানের জন্য। জওহরলাল নেহেরু ১৯৬২ এর দিকে নর্মদা নদীর ওপর সর্দার সরোবর বাঁধ (যা নর্মদা বাঁধ নামেও পরিচিত) প্রকল্পের শিলান্যাস করেন। এই প্রকল্পের অধীনে ৩০ টি বৃহৎ বাঁধ, ১৩৩ টি মাঝারি বাঁধ ও ৩০০০ টি ছোট বাঁধ এবং এর সাথে ৭৫০০০ কিলোমিটার ব্যাপী বিস্তৃত ক্যানেল নেটওয়ার্ক নির্মানের পরিকল্পনা করা হয়। কিন্তু দেখা যায় এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করলে প্রায় ২৯৭ টি গ্রাম প্লাবিত হতে পারে এবং ২০ লক্ষের মতো মানুষ বাস্তুচ্যুত হতে পারে যার মধ্যে অধিকাংশই আদিবাসী মানুষ। প্রকল্পটির বিশালতা বিবেচনা করে লেখক Claude Alvares এটিকে "পৃথিবীর সর্বাধিক পরিকল্পিত পরিবেশ বিপর্যয়" হিসাবে গন্য করেন।

১৯৮০ থেকে ধীরস্থিরভাবে প্রতিবাদ চলতে থাকলেও বাঁধ বিরোধী আলোড়ন ঘনীভূত হতে শুরু করে ১৯৮৫ সাল থেকে যখন থেকে মহারাষ্ট্র, গুজরাট ও মধ্যপ্রদেশে নর্মদা বাঁধ নির্মানের প্রতিবাদে **'do or die'** আন্দোলনের সূচনা হয়।

*Corresponding author
E-mail address: abhijitpramanik80168@gmail.com

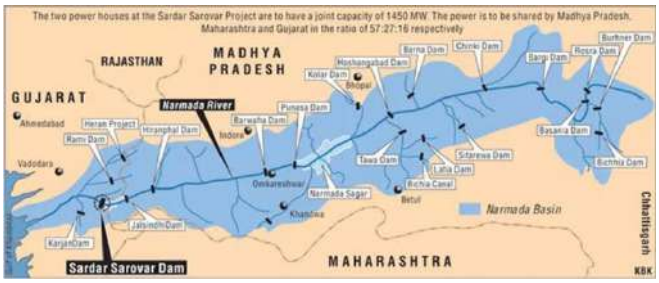

চিত্র ১

Why choose Sardaar Sarovar Project

নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন হল আদিবাসী, কৃষক, বিভিন্ন পরিবেশ কর্মী ও মানবাধিকার কর্মীদের নিয়ে গঠিত একটি সামাজিক আন্দোলন। যে আন্দোলনে নর্মদা নদীর উপর বিভিন্ন বাঁধ নির্মাণের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ করা হয়েছিল।

এই আন্দোলনটি বেছে নেওয়ার কারণ গুলি হল। যেমন: নর্মদা প্রকল্পের ফলে বাঁধের আশেপাশে ২৯৭ টি গ্রাম প্লাবনের আশঙ্কা ছিল এবং অনেক মানুষ তাদের ঘর ছাড়া হবে।

(১) নর্মদা প্রকল্প এই অঞ্চলের মানুষের ক্ষতির সম্ভাবনা আছে তা বিচার করা।

(২) পরিবেশ সরক্ষার উদ্দেশ্যে জীবন-জীবিকা কতটা ক্ষতি হবে তা উপলব্ধি করা ।

(৩) নর্মদা প্রকল্পের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট অনুসন্ধান করা ।

(৪) নর্মদা প্রকল্পের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা আন্দোলনের ব্যাপ্তি খুজে বের করা।

(৫) এই আন্দোলনে ভারতের পরিবেশ আন্দোলন কে কতটা প্রভাবিত করেছে তা অনুসন্ধান করা ।

(৬) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এ আন্দোলন কতটাপ্রভাব ফেলেছে তা অনুসন্ধান করা প্রভৃতি।

Major problem of this project

পরিবেশগত প্রভাব ছাড়া নর্মদা প্রকল্পের ফলে প্রচুর পরিমাণ মানুষ তাদের বাসস্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হবে। এই প্রকল্পের বিরোধীরা দাবি করেন যে -

(1) সর্দার সরোবর বাঁধ তৈরি হলে ২৯৭ টি গ্রাম প্লাবিত হবে।

(2) যার ফলে এই সব গ্রামের বসবাসকারী মানুষ তাদের বাসস্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হবে।

(3) অনেকে আবার দাবি করেন যে নর্মদার সব প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে প্রায় ২০ লক্ষ মতো মানুষ উৎখাত হবে এবং তাদের বেশির ভাগটাই আদিবাসী শ্রেনীর মানুষ।

(4) কিন্তু কেন্দ্র সরকার কাছে এই সমস্ত বাসতচ্যুত মানুষদের পুনবাসনের জন্য তেমন কোন নীতি বা পরিকল্পনা ছিল না যার ফলস্বরুপ শক্তিশালী আন্দোলন সূচনা হয়।

নর্মদা প্রকল্পের সমস্যা গুলি সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরার জন্য ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের উপর চলচিত্র নির্মাতা আলি কাজিমি "নর্মদা: এ ভ্যালি রাইজেস" নামে একটি সিনেমা তৈরি করেন। আনন্দ পাটোয়ারধান নামে অপর এক চলচিত্র নির্মাতা ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে 'এ নর্মদা ডাইরি' নামে একটি সিনেমা তৈরি করেন।

চিত্র ২

Major problem of this project

পরিবেশগত প্রভাব ছাড়া নর্মদা প্রকল্পের ফলে প্রচুর পরিমাণ মানুষ তাদের বাসস্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হবে। এই প্রকল্পের বিরোধীরা দাবি করেন যে -

(1) সর্দার সরোবর বাঁধ তৈরি হলে ২৯৭ টি গ্রাম প্লাবিত হবে।

(2) যার ফলে এই সব গ্রামের বসবাসকারী মানুষ তাদের বাসস্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হবে।

(3) অনেকে আবার দাবি করেন যে নর্মদার সব প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে প্রায় ২০ লক্ষ মতো মানুষ উৎখাত হবে এবং তাদের বেশির ভাগটাই আদিবাসী শ্রেনীর মানুষ।

(4) কিন্তু কেন্দ্র সরকার কাছে এই সমস্ত বাসতচ্যুত মানুষদের পুনবাসনের জন্য তেমন কোন নীতি বা পরিকল্পনা ছিল না যার ফলস্বরুপ শক্তিশালী আন্দোলন সূচনা হয়।

নর্মদা প্রকল্পের সমস্যা গুলি সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরার জন্য ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের উপর চলচিত্র নির্মাতা আলি কাজিমি "নর্মদা: এ ভ্যালি রাইজেস" নামে একটি সিনেমা তৈরি করেন। আনন্দ পাটোয়ারধান নামে অপর এক চলচিত্র নির্মাতা ১৯৯৬

খ্রিস্টাব্দে ‘এ নর্মদা ডাইরি’ নামে একটি সিনেমা তৈরি করেন।

চিত্র ৩

Flora, Fauna and Inhabite Loss

বর্তমান সময়ে দুটি বৃহৎ বাঁধ যা বিতর্কের মূল কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বিবেচ্য। যার মধ্যে একটি হলো Narendra Sagar Project (NSP) এবং অপরটি হল Sardaar sarovar project (SSP)। গুজরাটের রাজ্য সরকার সরদার সরোবর প্রকল্প নির্মাণের পক্ষপাতিত্ব ছিলেন। কারণ এই প্রকল্পের মাধ্যমে মধ্যপ্রদেশ গুজরাট ও রাজস্থানের প্রায় ২.২৭ মিলিয়ন হেক্টর জমি জল সেচ করা সম্ভব হবে।এছাড়া এই দুটি প্রধান বাঁধের দ্বারা বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। এই সব উপকারিতা সত্বেও নর্মদা প্রকল্পের পরিবেশগত বিরুপ বা ক্ষতিকারক প্রভাব গুলি অগ্রাহ্য করা যায় না। যেমন:-

(1) বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বড় বড় বাঁধের পারিপার্শ্বিক পরিবেশের উপর প্রভাব বিশ্লেষণ এর মাধ্যমে দেখা গেছে যে বৃহদাকৃতির বাদ পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের উপর গভীর প্রভাব ফেলে থাকে ।ঠিক একইভাবে নর্মদা প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে উদ্ভিদ ও প্রাণিকুল ধ্বংস হবে ও জল বাহিত প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে।

(2) বহু গ্রাম প্লাবিত হবে, অনেক মানুষ ঘরছাড়া হবে।

(3) তাছাড়া বেশি বৃষ্টিপাতের সময় এই সব বাঁধের ছাড়া জল সংশ্লিষ্ট রাজ্যের এক বিশাল এলাকার যে বন্যা নেমে আসতে পারে তা তো পশ্চিমবঙ্গ বাসী প্রায় প্রতিবছর প্রত্যক্ষ করেছেন।

(4) এছাড়া বর্ষা কালে নর্মদার জল আসে পাশের চাষাবাদ জমিতে প্রবেশ করলে মাটিতে লবনাক্তের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

চিত্র ৪

Against This Project Movement:

বস্তুত নর্মদা উপত্যকায় উন্নয়ন প্রকল্পের বিরুদ্ধই মানুষ প্রতিবাদে মুখর হয়। পৃথিবী জুড়েই এই প্রতিবাদ লক্ষ করা যায়।

১৯৮৯ সাল Atsita Narmada Dharangrast Samiti , Maharashtra Ghati , Navnirman Samiti , Narmada Asargrasta Sangharsha Samiti ও আরা কিছু সংগঠন একত্রিত হয়ে নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন (NBA) সংগঠন স্থাপন করেন ।

অন্যদিকে অপর এক সংগঠন Arch - Vahini রাজ্য সরকার কে এই প্রকল্পে প্রভাবিত মানুষদের পুনর্বাসনে সাহায্য করতে থাকে । কিন্তু নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন সংগঠন সঠিক ভাবে পুনর্বাসনের দাবিতে অনড় থেকে বাঁধ বিরাোধী আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকে ।

নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন সংগঠনের নেতৃত্বে ছিলেন মেধা পাটেকর । যার নেতৃত্বে এই আন্দোলন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক সমর্থন অর্জন করেন । এই নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনে মেধা পাটেকরের ভূমিকা বর্ননা করার মতাো । মেধা পাটেকর প্রথমবার নর্মদা উপত্যকায় এসেছিলেন একজন সামাজিক কর্মী ও গবেষক হিসাবে । তাকে মুম্বাই এর Tata Institute of Social Science থেকে নর্মদা উপত্যকায় নির্মিত সর্দার সরাোবর বাঁধের সমস্যা গুলি তুলে ধরার জন্য নিয়াগ করা হয় । কিন্তু মেধা পাটেকার যত তার গবেষণার কাজ করতে থাকে তত তিনি গরীব আদিবাসী শ্রেনীর মানুষদের জীবন ও সমস্যা নিয়ে আগ্রহী হয়ে পরেন । পরবর্তী কালে তিনি তার গবেষণা ছেড়ে দিয়ে এই নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনে অংশ গ্রহন করেন। তার

অসাধারন নেতৃত্ব দানের ক্ষমতার জন্য অনেক স্থানীয় মানুষ তার সাথে এই আন্দোলনে যুক্ত হন।

চিত্র ৫

১৯৮৯ সালে NBA এক বিশাল বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করেন । এই সমাবেশে বাবা আমটে, সুন্দরলাল বহুগুনার মতাে প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ অংশ গ্রহন করেন ।

১৯৯০ সালে NBA এই প্রকল্পটি স্থগিতের দামি জানায় । আন্দোলন ও বিক্ষোপের দ্বারা NBA , সর্দার সরোবর বাঁধে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের যন্ত্র টারবাইন কেনার জন্য জাপবারা , বিনিয়োগ করা ২০০ মিলিয়ন ডলার বাতিল। করতে সক্ষম হয়। এরপর NBA এর সদস্যরা ১৯৯০ সালের মে মাসে দিল্লির গাের্ল মিথি চকে ধর্নায় বসেন । তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী V.P. Singh এর প্রতিশ্রুতিতে তারা এই ধর্না তুলে দেন ।

তারপর ১৯৯০ সালের ডিসেম্বর ডিসেম্বর মাসে NBA মধ্যপ্রদেশের রাজঘাট থেকে একটি বাঁধ নির্মান কেন্দ্র মার্চো বের করেন , যার উদ্দেশ্য ছিল সত্যাগ্রহ পদ্ধতিতে শারীরিক উপস্থিতির মাধ্যমে বাঁধ নির্মানের কাজ বন্ধ করা কিন্তু সেই মার্চোটি গুজরাট ও মধ্যপ্রদেশের সীমান্তবর্তী এলাকায় থামিয়ে দেওয়া হয় ।

Participants of this Movement: নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন মেধা পাটেকর। যার ভূমিকা ছিল এই আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ।এছাড়া এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন বাবা আমতে, সুন্দরলাল বহুগুণা প্রমুখ ব্যাক্তিগন। ১৯৮৫ সালে সর্দার সরোবর বাঁধ প্রকল্পকে বিশ্বব্যাংক আর্থিক সাহায্য প্রদান করে।

তবে ১৯৯২ সালে এই প্রকল্পের সমালোচনা উল্লেখপূর্বক একটি রিপোর্ট তৈরী করা হয় এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক NGO ও NBA বিশ্বব্যাংককে উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য করে।

এই আন্দোলনে বিভিন্ন সংগঠন ও যুক্ত ছিল যেমন – Narendra Dharangrast, Maharashtra Ghati, Navnirman samiti, Narmada Asargrasta sangharsha samiti . ও আরো কিছু সংগঠন একত্রিত হয়ে নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন সংগঠন স্থাপন করে।

How to overcome

নর্মদা প্রকল্প কেন্দ্র করে মেধা পাটেকর নেতৃত্বে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল তার ফলে সরকার নড়ে উঠেছিল ।এই আন্দোলন শেষপর্যন্ত সফল না হলেও সরকার সাধারণ মানুষের পক্ষে অনেক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল যেমন–

(1) নর্মদা নদীর উপর নির্মিত বাঁধ এর উচ্চতা বাড়িয়ে ১৩৮ মিটার করা হয়েছিল।

(2)বাঁধের উচ্চতা বাড়ার ফলে এর জল ধারণ ক্ষমতা ১২.৭ কিউবিক মিটারথেকে বেড়ে ৪৭.৩ লক্ষ্য কিউবিক মিটার হয়েছিল।

(3)সরকার দাবি করেছে যে নর্মদা নদীর জল একটি ক্যানাল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে গুজরাটের প্রায় ৯০০০ গ্রামে পৌঁছে দেয়া হবে।

(4)নেটওয়ার্কের মধ্যে দিয়ে আসা জল ১৮ লক্ষ হেক্টরের বেশি কৃষি জমির সেচের কাজে ব্যবহার করতে পারবে।

(5) এ আন্দোলনের পরবর্তী সময়ে নদীর আশেপাশে গ্রামীণ বসতি গুলির যাতে কোন অসুবিধা না হয় সেদিকে নজর রাখা হয়েছিল।

(6)নর্মদা নদীর জল যাতে কৃষি জমিতে প্রবেশ করে ফসল নষ্ট না হয় সেদিকে নজর রেখেছিল।

সবশেষে বলা যায় যে নর্মদা নদীর উপর বাঁধ পরিকল্পনার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ যে আন্দোলনমুখী হয়েছিল তা ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও অসাধারণ সফলতা অর্জন করেছে। এই আন্দোলন দেখিয়েছে যে সাধারণ মানুষ যদি সংঘবদ্ধভাবে কাজ করে তাহলে যেকোনো প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করতে সক্ষম । এই ভাবে নর্মদা আন্দোলন বিশ্বের অন্যতম পরিবেশ আন্দোলনের অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করেছে।

GEO-TALK
A Journal of Man and Environment
Journal available at: http://www.hbcnht.edu.in/college_magazine.php

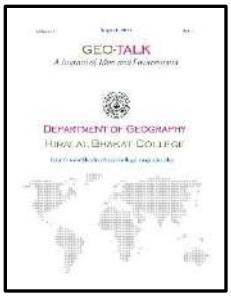

জীববৈচিত্র্য হটস্পট- ভারতের অন্যতম জীববৈচিত্র্য হটস্পট পশ্চিমঘাট পর্বত মালা

রেহেনা খাতুন*

Semester-IV, Department of Geography, Hiralal Bhakat College, Nalhati, Birbhum

ARTICLE INFO

Keywords:
Biodiversity Hotspot
ভাস্কুলার উদ্ভিদ
পশ্চিমঘাট পর্বতমালা
প্রাকৃতিক আবাসস্থল

Article history

Received: 8th July, 2021
Revised: 30th July, 2021
Accepted: 12th August, 2021
© ***Dept. of Geography, Hiralal Bhakat College***

ABSTRACT

সাধারণভাবে জীববৈচিত্র্য হটস্পট অঞ্চল হল এমন অঞ্চল যেখানে অন্তত 1500 ভাস্কুলার উদ্ভিদের সমাবেশ থাকে এবং এদের 75 শতাংশ আবাসস্থল নষ্ট হয়ে গেছে। বর্তমানে সারা পৃথিবীতে 34 টি জীববৈচিত্র্য হটস্পট রয়েছে।ভারতের উল্লেখযোগ্য জীববৈচিত্র্য হটস্পট হল পশ্চিমঘাট পর্বতমালা।উপদ্বীপীয় ভারতের প্রান্তদেশ বরাবর বৃষ্টি অরন্য যুক্ত এবং আদ্র পর্নমোচি বৃক্ষের সমাবেশ এই অঞ্চল। এখানে 77 শতাংশ উভচর এবং 62 শতাংশ সরিসেপ প্রজাতির সমাবেশ।

Introduction

কোনো একটি অরণ্য, হ্রদ, পুকুর, ধানক্ষেত ইত্যাদি অঞ্চলে বিভিন্ন ছোটো বড় বৈচিত্রময় উদ্ভিদ ও প্রাণীর সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। এছাড়াও কিছু আণুবীক্ষণিক জীবও ওই স্থানে বসবাস করে। তাই যে কোনো স্থানের বিভিন্ন জীবের এই বৈচিত্র্যপূর্ণ সমাবেশকে ওই স্থানের জীববৈচিত্র্য বলা হয়। বায়ো ডাইভারসিটি শব্দটির "bio" অর্থ life বা জীবন এবং "diversity" অর্থ " variety" বা বৈচিত্রতা।

বিশিষ্ট বন্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞ এবং সংরক্ষণবাদী ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক রেমন্ড দাসমান ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে"একটি ভিন্ন ধরনের দেশ"গ্রন্থে প্রথম জীব বৈচিত্র কথাটি ব্যবহার করেন। আর এর সংক্ষিপ্ত রূপ biodiversity শব্দটি সম্ভবত ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে
আমেরিকার ওয়াস্টিং ডিসিতে অনুষ্ঠিত "national forum of biodiversity" শীর্ষক সভাতে ওয়াল্টার রোজেন সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন।

পরবর্তীকালে ও উইলসন জীববৈচিত্রের ব্যাপক অনুসন্ধান ও গবেষণা করেন। তাই উইলসনকে জীববৈচিত্র্যের ধারনার পিতা (*Father of Biodiversity)* বলে আখ্যা দেওয়া হয়। ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোতে অনুষ্ঠিত বসুন্ধরা সম্মেলন এ জীববৈচিত্র্যের একটি সঠিক উপস্থাপিত হয়।

*Corresponding author
E-mail address: tusebibi94228@gmail.com

সংজ্ঞা অনুসারে বলা হয় কোন জলজ বা স্থলজবাস্তুতন্ত্রে বা সব রকম বাস্তু তন্ত্রের অঙ্গ হিসাবে বিভিন্ন জীবের মধ্যে প্রজাতিগত দিকে আন্তঃপ্রজাতি কত দেখে বা বাস্তু তন্ত্র গত দিকে যেরূপ বিভিন্নতা প্রকাশ পায় তাকে জীবৈচিত্র্য বলে।

চিত্র ১

চিত্র ২

What is Biodiversity Hotspot

পৃথিবীর বিশেষ কতগুলি অঞ্চলে বিশেষ ধরনের প্রাকৃতিক পরিবেশে স্থানীয় উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতির সমাবেশে এক উল্লেখযোগ্য বৈচিত্র লক্ষ্য করা যায়। জীববৈচিত্র সমৃদ্ধ এ অঞ্চল গুলি বাস্তুতান্ত্রিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।নিত্যপ্রয়োজনীয় এই রোগ জীববৈচিত্র সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলিতে মানুষের অগাধ অনুপ্রবেশ ও হস্তক্ষেপে জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হচ্ছে। ফলে এই অঞ্চলে সমস্ত প্রজাতির জীব সংখ্যা অত্যন্ত দ্রুত হারে হ্রাস পাচ্ছে অদূর ভবিষ্যতে এই সকল বিপন্ন প্রজাতির বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা অধিক এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের তৎপরতা বাড়ি। এইরূপ অঞ্চলকে জীববৈচিত্র্য হটস্পট বা biodiversity বলে।

চিত্র ৩

১৯৮৮ সালে ব্রিটিশ পরিবেশ বিজ্ঞানীনরম্যান মায়ার্স"দা এনভায়রনমেন্ট ডে লিস্ট নামক বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা সর্বপ্রথম বায়ো ডাইভারসিটি হটস্পট শব্দটি প্রচলন করেন। এই পত্রিকায় তিনি প্রথম জীববৈচিত্র্য হটস্পট সম্পর্কে ধারণা দেন। উদ্ভিদ প্রজাতির প্রাচুর্য এবং খয়ের মাত্রা বিচার করে মায়া সর্বাধিক বিপদগ্রস্ত বাস্তুতান্ত্রিক অঞ্চল গুলিকে হট স্পট হিসেবে চিহ্নিত করেন।

যে সমস্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে অসংখ্য এন্ডেমিক প্রজাতি অবস্থান করে এবং যেখানে উক্ত প্রজাতির প্রাচুর বেশিসেই সমস্ত প্রাকৃতিক অঞ্চল কে জীববৈচিত্র্য হটস্পট বলে।

চিত্র ৪

Basic conditions for called Biodiversity Hotspot

হটস্পট ঘোষণার ক্ষেত্রে দুটি বিষয়কে বেশি করে গুরুত্ব দেওয়া হয়:-১) সেখানে অন্তত ১৫০০ ভাস্কুলার উদ্ভিদ হবে। ২) এদের অন্তত ৭০% প্রাকৃতিক আবাসস্থল নষ্ট হয়ে গেছে। এছাড়াও আরও রয়েছে যেমন-বাস্তুতন্ত্রে কোন স্থানকে হটস্পট হতে গেলে যে শর্তগুলো পূরণ করা আবশ্যক সেগুলি হল:-(a)

অঞ্চলটিকে প্রজাতি বৈচিত্র্য সমৃদ্ধ হতে হবে। (b) অঞ্চলটিতে জীবদের মধ্যে আন্তঃপ্রজাতি সংগ্রাম সাধারণত থাকবে না। (c) জায়গাটিতে প্রচুর সংখ্যক স্থানিক প্রজাতি থাকতে হবে। (d) অন্য কোন অঞ্চল থেকে প্রজাতির অনুপ্রবেশ ঘুটিয়ে প্রজাতির সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায় না।

পরবর্তীকালে আমেরিকান পরিবেশ সংক্রান্ত সংস্থা কনজারভেশন ইন্টারন্যাশনাল অনুযায়ী জীব বৈচিত্রের হটস্পট রূপে স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য হিসেবে দুটি বিশেষ দিকের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। এগুলি উপরে আলোচনা হল। সাধারণত হটস্পট অঞ্চলের এন্ডেমিক প্রজাতি কে সমৃদ্ধ সারা পৃথিবীতে জীব বৈচিত্রের হটস্পট এর সংখ্যা ৩৪ টি। এইগুলি ভূভাগের মাত্রা ২.৩% অংশ জুড়ে আছে পৃথিবীর ৫০% এর বেশি উদ্ভিদ প্রজাতি এবং ৪.২% এর বেশি স্থলজ মেরুদন্ডী প্রাণী এই সমগ্র হটস্পট অংশে বিদ্যমান। পৃথিবীর এই৩৪ টি হটস্পট এর মধ্যে চারটির অবস্থান ভারতে। সেগুলি হল:-পূর্ব হিমালয়, ইন্দো বার্মা, পশ্চিমঘাট ও শ্রীলঙ্কা, সুন্দাল্যান্ড।

World some Major Biodiversity Hotspot:

ব্রিটিশ বাস্তুবিদ্যা বিশেষজ্ঞনরম্যান মায়ারস ১৯৮৮ খ্রীস্টাব্দে সর্বপ্রথম বায়োডাইভারসিটি হটস্পট এর ধারণা প্রদান করেন। বর্তমানে সমগ্র পৃথিবীতে মোট ৩৪ টি হটস্পট এর সন্ধান পাওয়া গেছে। ভারতের পশ্চিমঘাট পর্বতমালার সাইলেন্ট ভ্যালি পেরিয়ার জাতীয় উদ্যান ও অগস্ত মালাই হলো উল্লেখযোগ্য জীববৈচিত্র্য হটস্পট এর উদাহরণ। পৃথিবীর প্রায় ২০০ টি দেশের মধ্যে ১৭ টি দেশে সর্বাধিক (৬০%৭০%) জীববৈচিত্র্য বিদ্যমান। বিশ্বের অধিক জীববৈচিত্র সমৃদ্ধ দেশ গুলির মধ্যে অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া মাদাগাস্কার, মেক্সিকো, পেরু প্রভৃতি প্রধান। ভারতের হিমালয়ের পূর্বাঞ্চল, পশ্চিমঘাট পর্বতমালা এবং আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ জীববৈচিত্র্য সবচেয়ে বেশি সমৃদ্ধ। এরা অধিকাংশই ক্রান্তীয় নিরক্ষীয় অঞ্চলে অবস্থিত। এর মধ্যে ভারতে দুটি অবস্থিত। কিছু উদাহরণ স্বরূপ:-

South America:-1) Atlantic forest 2) Cerrado.3) Chilean winter rainfall-valdivian forest .4) Tropical Andes.
South Asia:-(1)Eastern Himalayan,india(2)indo-barma (3)india and mayanmar (4) Western ghat and srilanka.
North and Central America :-(1) California Floristic province.(2)Caribbean Island .(3) Madrean pine oak woodlands.
Eupore and Central Asia:-1) Caucasus 2) Irano - Anatolian 3) Mediterranean basin 4) mountains of central Asia.
South East Asia and Asia Pacific:-1) East Melanesian Island 2) New Calendonia.3) New Zealand.
East Asia:- 1) Japan .2) Mountains of Southwest China.
America:-1) Cape Floristic Region. 2) Coastal Forests of Eastern American 3) Eastern Afromontance 4) Guinean Forrest of West Africa.

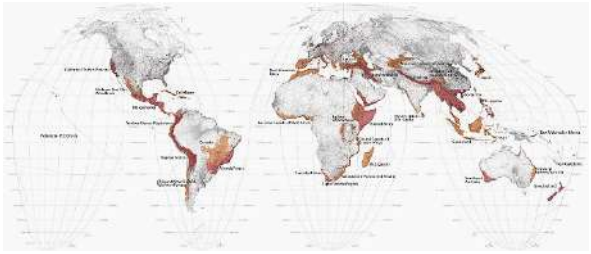

চিত্র ৫

Western Ghat এবং শ্রীলঙ্কা:-১) অবস্থান:-উপদ্বীপীয় ভারতের পশ্চিম প্রান্ত দেশ বরাবর অসংখ্য পাহাড়ের সিঙ্গারা গঠিত পশ্চিমঘাট।উক্ত অঞ্চলে প্রচুর শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টিপাত ঘটে। ফলে বৃষ্টি অরণ্য অঞ্চল ও আদ্র পর্ণমোচী বৃক্ষের বনভূমির আদিত্য লক্ষ্য করা যায়।এই অঞ্চলে সর্বাধিক বই প্রজাতির বৈচিত্র লক্ষ্য করা যায়। এবং বেশিরভাগ প্রজাতির এন্ডেমিক প্রকৃতির। এখানে ৭৭% উভচর এবং ৬২ % সরীসৃপ প্রজাতি দেখা যায় যার অন্যত্র দেখা যায় না। শ্রীলঙ্কা ভারতের দক্ষিণ অবস্থিত। এদেশে জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধির দেখা যায় এবং দেশটিভারতের সঙ্গে ১৪০ কিমি চওড়াস্থলসেতু দ্বারা সংযুক্ত।

জীববৈচিত্র্য

এই জীববৈচিত্র্য হটস্পট অঞ্চলের ৬০০০ টি ভাস্কুলার উদ্ভিদ রয়েছে যার মধ্যে ২৫০০ প্রজাতি আজ বিপন্ন। উক্ত অঞ্চলটি বড় এলাচ এবং কালো মরিচ এর আদি বনভূমি। পশ্চিমঘাট পর্বতের আগস্ট মালায় পাহাড়ে সর্বাধিক জীব বৈচিত্র উপস্থিতি দেখা যায়। এই অঞ্চলে ৪৫০ টিপক্ষী প্রজাতি।

১৪০ টি স্তন্যপায়ী, ২৬০ টি সরীসৃপ, ১৭৫ টি উভচর এর অস্তিত্ব ছিল। এদের মধ্যে আবার ৬০% সরীসৃপ ও উভচর এন্ডেমিক প্রকৃতির। বর্তমানে এই প্রজাতিগুলো সম্পূর্ণরূপে বিপদগ্রস্ত। এই অঞ্চলে ১৯০০০০ বর্গ কিমি অঞ্চলজুড়ে উদ্ভিদ প্রজাতির অস্তিত্ব ছিল। বর্তমানে এই আয়তন কম হয়েছে ৪৩,০০০ বর্গ কিমি। অপরদিকে শ্রীলংকা শুধুমাত্র ১.৫% বনভূমি অবশিষ্ট রয়েছে। এই অঞ্চলের বিশেষ কিছু উল্লেখযোগ্য প্রজাতি বর্তমানে দেখতে পাওয়া যায় না। যাদের মধ্যে পার্পেল ব্যাং, শ্রীলংকান টিকটিকি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

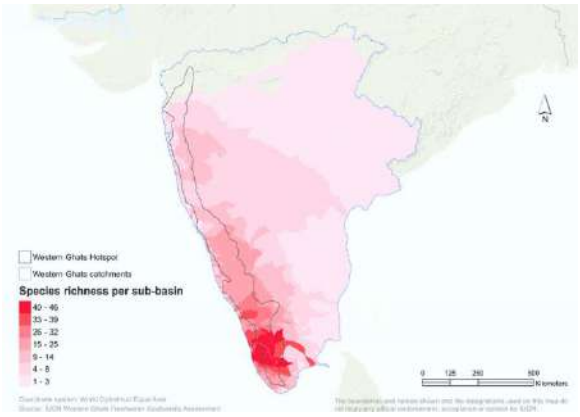

চিত্র ৬

Biodiversity Loss:

জীববৈচিত্র্য রক্ষঅন্তর্ভুক্ত বিলুপ্তি এর প্রজাতি বিশ্বব্যাপী, পাশাপাশি স্থানীয় একটি হ্রাস বা একটি নির্দিষ্ট প্রজাতির ক্ষতি আওয়াজ যার ফলে ক্ষতি হয় জীববৈচিত্র্য। পরবর্তী ঘটনাটিকে অস্থায়ী বা স্থায়ী হতে পারে তার ওপর নির্ভর করে পরিবেশগত অবনতি যে ক্ষতির দিকে নিয়ে যায় তার মাধ্যমে বিপরীত হয় পরিবেশগত পুনরুদ্ধার পরিবেশগত স্থিতিস্থাপকতা, বা কার্যকরভাবে স্থায়ী। বৈশ্বিক বিরুদ্ধে এখনও পর্যন্ত অপরিবর্তনীয় বলে প্রমাণিত হয়েছে।

স্থায়ী হলেও গ্লোবাল প্রজাতি আঞ্চলিক পরিবর্তন এসেছে আরো নাটকীয় ঘটনা প্রজাতি রচনা এমন কি, স্বাস্থ্যকর স্থিতিশীল রাষ্ট্র থেকে আশা ছোটখাটো পরিবর্তনগুলি এর উপর নাটকের প্রভাব ফেলতে পারে। খাদ্য ওয়েব এবং খাদ্য শৃংখল ইনভার শুধুমাত্র একটি প্রজাতির হ্রাস* চেনকে বিরূপ প্রভাবিত করতে পারে। যা সামগ্রিকভাবে হ্রাস সঞ্চারিত করে জীববৈচিত্র্য সম্ভব বিকল্প স্থিতিশীল রাষ্ট্র ইকোসিস্টেমের সত্বেও। জীববৈচিত্রের পরিবেশগত প্রভাব সাধারণত এই ক্ষতির মুখোমুখি হয়। বিশেষত জীববৈচিত্র্যের হ্রাস হওয়ার দিকে নিয়ে যায় বাস্তুসংস্থান সেবা এবং অবশেষে এর জন্য তাৎক্ষণিক বিপদ ডেকে আনে খাদ্য নিরাপত্তা মানবজাতির জন্য।

Biological Hotspot এর গুরুত্ব:

প্রতি মিনিটে জীব এবং উদ্ভিদ একটি বড় স্তন্যপায়ী বা গাছ বাস্তুতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এই জীববৈচিত্র্য হটস্পট গুলি হল হাজার হাজার স্থানীয় জীব উদ্ভিদ এবং গাছ পালার আবাস। সুতরাং ইকোসিস্টেম এবং বায়োস্ফিয়ার বিশাল প্রভাব ফেলে। পৃথিবীর এই সমস্ত হটস্পট গুলিহল পৃথিবীর পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্র এবং মানুষের জন্য জীবন সহায়ক এই হটস্পট গুলি প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন বিশুদ্ধ জল, মাটি বাস্তুতন্ত্রের রক্ষণাবেক্ষণ, দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং বাস্তুতন্ত্রের পুষ্টি পুনপুনর্ব্যবহা প্রভৃতিতে সহায়ক। জীববৈচিত্র্য হটস্পট গুলি ওষুধ ও কাঠেরপণ্যগুলির একটি ভালো উৎস। হটস্পট গুলি মানব জাতির উন্নতির জন্য গবেষণা এবং শিক্ষা সম্পর্কিত ক্রিয়া-কলাপ গুলির একটি দুর্দান্ত জায়গা এছাড়াও বিশ্বের প্রায় ৩৬ টি জীব বৈচিত্র হটস্পট এ বসবাস করে এমন প্রায় ২ বিলিয়ন মানুষ রয়েছে। তারা বাস করে এবং তাদের জীবন যাপনের জন্য এখানে কাজ করে। এই উপজাতি গুলির বেশিরভাগই এই হটস্পট গুলির স্থানীয়। এই জীববৈচিত্র্য অনেকেরই পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় মানুষের উচ্চতর ঘনত্ব রয়েছে এবং এই হটস্পট গুলির সাথে তাদের সম্পর্ক আমাদের ধারণার চেয়ে অনেক বেশি দৃঢ়।

এই জীববৈচিত্র্য আমাদের পরিবেশে এক গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই জীববৈচত্র্য এর ফলে আমাদের পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকে। কিন্তু বর্তমান এ আমাদের মনুষ্য সৃষ্ট অনেক কারণের ফলে এই ভারসাম্য বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে না। আমরা আমাদের সবার স্বার্থের জন্য বনজঙ্গল থেকে অনেক গাছ কাটিং এবং সেখানে আবাসস্থল সৃষ্টি করে এর ফলে ওই স্থানে বসবাসকারী অনেক জীবজন্তু তাদের বাসস্থান এর জায়গা হারায়। আবার অনেকে বন্য প্রাণীকে মেরে জীবিকা অর্জন করে। এই ভাবে চলতে চলতে আজ আমাদের পরিবেশে এমন অনেক জীবজন্তু পশু পাখি রা বিপদের মুখে। তারা বিজ্ঞাপন, অনেক জীব জন্তু ও আজ পরিবেশ থেকে অবলুপ্ত হয়ে গেছে। এখন সময় এসেছে এসববন্ধ করার যাতে এসব অপকর্ম না হয় তার দিকে

লক্ষ্য রাখতে। যেসমস্ত প্রাণী গুলি আজ অবলুপ্ত এর মুখে তাদের বিশেষ ভাবে সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করতে হবে।
0

GEO-TALK
A Journal of Man and Environment
Journal available at: http://www.hbcnht.edu.in/college_magazine.php

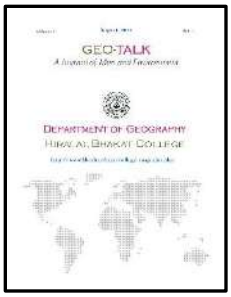

পৃথিবীর ফুসফুস অগ্নিদগ্ধ সমস্ত পৃথিবীর চিন্তার কারণ অ্যামাজন বনভূমিতে দাবানল-23 আগস্ট, 2019

এম. ডি. আখতার আনসারী*

Semester-IV, Department of Geography, Hiralal Bhakat College, Nalhati, Birbhum

ARTICLE INFO

Keywords:
রেইন ফরেস্ট
পৃথিবীর ফুসফুস
জীববৈচিত্র্য
Amazon Forest

Article history

Received: 8th July, 2021
Revised: 30th July, 2021
Accepted: 12th August, 2021
© ***Dept. of Geography, Hiralal Bhakat College***

ABSTRACT

বিশ্বের বৃহৎ রেইন ফরেস্ট আমাজান কে ‘‘পৃথিবীর ফুসফুস’’ বলা হয়। পৃথিবীর মত প্রাপ্য অক্সিজেনের 20 শতাংশ অক্সিজেন এই জঙ্গল থেকে পাওয়া যায়। 2019 সালে এই জঙ্গল এ দাবানল সমস্ত পৃথিবীর চিন্তার কারণ হয়ে পরে। এই দাবানল এ জীববৈচিত্রের অনেকটাই ক্ষতি হয়। পৃথিবীর এই কার্বন সিঙ্ক কে রক্ষা করা আমাদের একান্ত দরকার।

Introduction

অ্যামাজন নামটি স্প্যানিশ পর্যটক ফ্রান্সেস্কো দ্যা ওরেলানার দেওয়া। তিনি প্রথম ইউরোপীয় হিসাবে অ্যামাজন নদীর ধারে চিরহরিৎ এই বনে গিয়েছিলেন। অভিযানের সময় স্থানীয় ইকামিয়াবাস নামের নারী যোদ্ধাদের দ্বারা আক্রান্ত হন। তার পরই মূলত অ্যামাজন নামটি তিনি গ্রিক পুরাণ থেকে দেন।

দক্ষিণ আমেরিকায়অবস্থিত অ্যামাজন বন পৃথিবীর-সবচেয়ে-বড়-বনঅঞ্চল। আমাজন নদীই আমাজন বনের জীবনশক্তি। মহাবন আমাজন ৯টি দেশের প্রায় ৭০ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত।পৃথিবীর আয়তনের দিক থেকে অ্যামাজনবাংলাদেশের তুলনায় ৩৮ গুন বড়।সমগ্র পৃথিবীতে যত রেনফরেস্ট আছে তার অর্ধেক এই হল অ্যামাজন। এই বনে ৪০ হাজার প্রজাতির প্রায় ৩ হাজার ৯00 কোটি বৃক্ষ রয়েছে। বাতাসে রয়েছে ৭৭.৭৮% নাইট্রোজেন এবং ২২ শতাংশ অক্সিজেন গ্যাস। বাকি ১% রয়েছে নানা ধরনের গ্যাস। পৃথিবীতে যত টুকু অক্সিজেন আছে তার২০% যেহেতু উৎপাদিত হয় অ্যামাজনের জঙ্গল থেকে। তাই অ্যামাজন কে পৃথিবীর ফুসফুস বলতে হয়।

চিত্র ১ অ্যামাজন জঙ্গল (অ্যামাজন রেইন ফরেস্ট) : বিশ্বের সবচেয়ে বড রেনফরেস্ট

*Corresponding author
E-mail address: akhtarsonju1999@gmail.com

Why Amazon Forest Chose

ভয়াবহ দাবানলে পুড়ছে আমাজন জঙ্গল। বিশ্বে গনমাধ্যমের কল্যানে অ্যামাজন জঙ্গল এখন কেন্দ্রবিন্দুতে। তবে অ্যামাজন রেইন ফরেস্ট গুরুত্বপূর্ণ কেন তার কিছু তথ্য আমরা জেনে নিব।

দা অ্যামাজন রেইন ফরেস্ট বৃহত্তম রেনফরেস্ট বিশ্বে ৫,৫০০,০০০ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে (২,১০০,০০০ বর্গমাইল) এটি গ্রহের বৃষ্টিপাতের অর্ধেকেরও বেশি প্রতিনিধিত্ব করে, এবং বৃহত্তম এবং সর্বাধিক সম্বন্ধিত জৈব বিবিধট্রাক্টক্রান্তীয় বৃষ্টিপাত এ পৃথিবীতে অ্যামাজন জঙ্গল টি ছড়িয়ে আছে ৯ টিরও বেশি দেশজুড়ে। এটি বিশ্বের সবচেয়ে বড় রেনফরেস্ট।

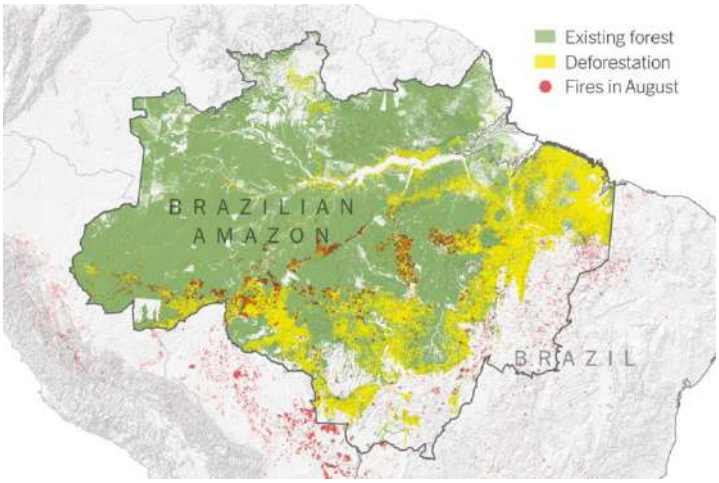

চিত্র ২

পৃথিবীর মোট ভূপৃষ্ঠের প্রায় ৬ ভাগ অংশ জুড়ে আছে আমাজন রেনফরেস্ট। সারা বিশ্বে যত পরিমাণে অক্সিজেন, জল এবং বন রয়েছে।তার মধ্যে ২০ শতাংশ অক্সিজেন অ্যামাজন বন থেকে উৎপন্ন হয়। এবং অ্যামাজন বন রয়েছে ৪০% এবং জল রয়েছে ২০% বলে অনুমান করা যায়। প্রতিবছর পৃথিবীতে যে বৃষ্টিপাত হয় তার মধ্যে অ্যামাজনে প্রতিবছর প্রায় ৯ ফুট পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয় এই অ্যামাজন জঙ্গলে। বছরের ১২ মাসিই উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়া বিরাজ করে, তাই অ্যামাজন রেনফরেস্ট নামে পরিচিত লাভ করেছে।

১. অ্যামাজন জঙ্গলের৬০ ভাগ অংশই পড়েছে ব্রাজিলে।

২. অ্যামাজন আবহবিকা প্রায় ২৭ লাখ ২০ হাজার বর্গমাইল জুড়ে এর অবস্থান।

৩. এই জঙ্গলে প্রচুর গাছ গাছালি থাকলেও এর ভূমির প্রকৃতপক্ষে ততটা উর্বরনয়।

৪. অ্যামাজন রেইন ফরেস্টে প্রায় ৪০ হাজার কোটি গাছ রয়েছে।

৫. অ্যামাজনে সাড়ে ৩৫০ রকম আদিবাসী বাস করছে।

৬. পৃথিবীতে যত প্রজাতির পাখি রয়েছে তার প্রায় পাঁচ ভাগ প্রজাতি অবসস্থল আমাজন রেনফরেস্ট ।কারণ এখানকার আবহাওয়া উষ্ণ ও আর্দ্র এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ভালো তাই এখানে উদ্ভিদ ও প্রাণী অধিক স্ব-ইচ্ছায়জন্মাতে পারে।

৭. প্রতি মিনিটে অ্যামাজন রেইন ফরেস্টের যে পরিমাণে বনভূমি উজাড় হচ্ছে তার আকার২০ ফুটবল মাঠের সমান।

৮. রেইন ফরেস্টের গাছ গুলোর ঘনত্ব এতটাই বেশি যে আকাশ থেকে নেমে আসা বৃষ্টির ফোঁটা এই গাছ ভেদ করে মাটি পর্যন্ত পৌঁছাতে ১০ মিনিট সময় লাগে।

৯. অ্যামাজন রেইন ফরেস্টের গাছের ঘনত্ব এতটাই বেশি যে এই জঙ্গলের মাত্র ২ থেকে ৫ ভাগ অঞ্চলে সূর্যের আলো পৌঁছায়।

১০. অ্যামাজন রেইন ফরেস্টের যদি একটি দেশ হতো তবে এটি হতো বিশ্বের নবম বৃহত্তম রাষ্ট্র।

১১. অ্যামাজন রেইন ফরেস্ট কে কেন্দ্র করে জীবিকা নির্বাহ করছে প্রায় ১৬০ কোটি মানুষ।

চিত্র ৩

Flora and fauna share % World

বর্তমানে ৮৭ লাখ প্রজাতির জীব রয়েছে বলে দাবি করেছেন একদল ক্যানাডিয়ান বিজ্ঞানী। একটি উচ্চতর গাণিতিক মডেল ব্যবহার করে হিসাব কষে এই সংখ্যা পাওয়া গেছে বলে জানান তারা।

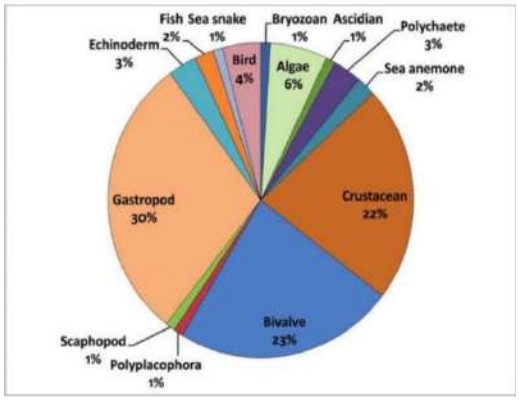

চিত্র ৪

প্রানী বিজ্ঞানে ও উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরা প্রায় আড়াইশো বছর ধরে প্রজাতির সংখ্যা গণনা করে আসছেন আসছেন। গবেষণায় দেখা গেছে যে, পৃথিবীতে মোট ৩ লক্ষ ৯০ হাজার৯০০ প্রজাতির উদ্ভিদ রয়েছে। তার মধ্যে ২০১৫ সালে ২হাজার৩৪ টি নতুন উদ্ভিদ প্রজাতির আবিষ্কার করা হয়েছে। তবে সারা বিশ্বে উদ্ভিদ ও প্রাণীযত পরিমাণ রয়েছে তার মধ্যে এই আমাজন বনে রয়েছে প্রায় ৩০ লক্ষ প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী।

Cause of Amazon Forest Fire

দাও দাও করে পুড়ছে আমাজন জঙ্গল। পৃথিবীর ফুসফুস বলা হয় অ্যামাজন জঙ্গল কে। অর্থাৎ অ্যামাজন জঙ্গল পুড়ে যাওয়া মানে পৃথিবীর অক্সিজেনের ব্যাঘাত ঘটে যাওয়া।

চিত্র ৫

পরিবেশ বিজ্ঞানীরা আমাজনের জঙ্গলের ভয়াবহ আগুনের কয়েকটি কারণকে যথার্থভাবে চিহ্নিত করেছেন:-

প্রথমত, বিভিন্ন কারণে বৃক্ষছেদন করে বনভূমি উজাড়, মনুষ্য প্রজাতির বসতিস্থাপন সহ বিভিন্ন নির্মাণের উদ্দেশ্যে মানুষ নির্বিচারে এখানকার ঘন চিরহরিৎ বৃক্ষের বনভূমি কে ধ্বংস করে দিচ্ছে। বৃক্ষ পুড়িয়ে ফেলার সময় আগুন ছড়িয়ে পড়ছে আশেপাশে জঙ্গলে। যা রূপ নিচ্ছে ভয়াবহ দাবানল এর।

দ্বিতীয় কারণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়, কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা কে কৃষিজাত দ্রব্যের জোগান দেওয়ার জন্য মানুষ সরাসরি কোন বিবেচনা না করে জঙ্গলেআগুন লাগিয়ে দিচ্ছে। গবাদিপশুর চরণভূমি তৈরি করার জন্যই

একই পন্থা অবলম্বন করছে মানুষ। “ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ডলাইফ ফান্ড” ইতিমধ্যেই সন্দেহ প্রকাশ করেছে য, বনভূমি ছেদন করতে যেখানে যান্ত্রিক প্রয়োগ ব্যর্থ হচ্ছে, সেখানে মানুষই বনভূমিতে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে। যার ফলে মনুষ্যসৃষ্ট দাবানল।

তৃতীয়কারণহিসেবেউল্লেখকরাযায়, লাগাতার করার ঘটনাকে যথেচ্ছভাবে বৃক্ষ নিধনের ফলে জলবায়ুর ব্যাপক পরিবর্তন করার তীব্র থেকে তীব্রতর করে তুলছে তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জমি মাফিয়াদের একটি দুষ্টচক্র।

কিছু ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় জলের অপ্রতুলতার কারণে জঙ্গল শুষ্ক হয়ে আগুন লেগেথরার তীব্রতা আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক সময় যে অরণ্য “ফায়ারপ্রফ” নামে পরিচিত ছিল, আড়াই লক্ষ পতঙ্গ এবং চার লক্ষ উদ্ভিদ প্রজাতি এবং নৃ-প্রজাতির আদিম অধিবাসীমুরা, গুয়াত, নাবিকওয়ালাপ্রকৃতি আজ তাদের রেহাই নেই এই বনভূমিতে। সেই অবস্থায় স্থল আজ এক অগ্নিকুন্ডে পরিণত হয়েছে।

চিত্র ৫

Destroyed Biodiversity

অ্যামাজনের মূল বৈশিষ্ট্য হলো জীব বৈচিত্র। বায়ো ডাইভারসিটি হলো প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের নানা রকম বিভিন্নতার একটা পরিমাপ। বৈজ্ঞানিকরা বলেন এই জীব-বৈচিত্র যত বেশি থাকবে, ততবেশি মানবজীবনে সংকট কম।কিন্তু অ্যামাজনে আগুন লাগার ফলে যেমন কীট পতঙ্গ ধ্বংস হচ্ছে তেমনি তাদের খাদ্য প্রাণী ও খাদ্যের অভাবে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও লক্ষণয়েরদেখা যাচ্ছে। যেমন:- চরম খরা, বন্য, ভূমিকম্প ইত্যাদির কারণে জীব বৈচিত্রের বিলুপ্তি ঘটছে।

চরম খরার ঘটনাগুলি অ্যামাজনে বনে আগুনএর প্রভাবকে আরো বাড়িয়ে তোলে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এই খরার ঘটনাগুলির আরো ঘন ঘন হয়ে যাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়া হয়। বন উজাড় করা অঞ্চল গুলি নব্য নদী গুলির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল ২০০০-২০১৮ অব্দি মোট বনভূমির ৬২% নদীর ২ কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত। বিগত বছরগুলোর তুলনায় ২০১৫ এল নিনো চলাকালীন বন উজাড় ও বনজ ও আগুনে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পেয়েছিল। দাবানলের পরের বছরগুলিতে আগুনে পোড়ানো বনের কেবলমাত্র একটি ছোট অংশ বনজমিটে ছড়িয়ে পড়েছিল:৭% (১৯৯৭), ৩% (২০০৯) এবং ১.৫% (২০১৫)। বন্দোবস্ত প্রকল্পের মোট ক্ষেত্রের মধ্যে, ৪০% বন আগুনে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল এবং ১৭% বন উজাড় হয়েছিল ।

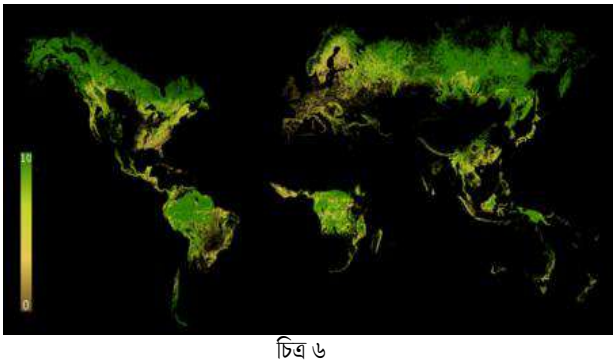

চিত্র ৬

জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক পরিবেশের মারাত্মক প্রভাব সৃষ্টি হয় সেগুলি হল নিম্নরূপ:-

প্রাকৃতিক সম্পদের অত্যাধিক প্রদর্শনী:-

অ্যামাজনে আগুন লাগার ফলে প্রাকৃতিক সম্পদের বিশাল ক্ষতি হচ্ছে যার ফলস্বরূপ সেখানকার স্থায়ী আদিবাসীদের খাদ্য সংকট দেখা দিচ্ছে।

জলবায়ু পরিবর্তন

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সমস্ত জীবকুল মারা যায়। জলবায়ু পরিবর্তনে বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয় লক্ষ্য করা যাচ্ছে যার ফলে সমস্ত স্কুলকে নিজেদের মানিয়ে নিতে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

অক্সিজেন এর প্রভাব:– অ্যামাজনে আগুন লাগার ফলে উদ্ভিদকুল ধ্বংস হচ্ছে যার ফলস্বরূপ

অক্সিজেনের প্রভাব পড়ছে এবং জলে বসবাসকারী প্রাণী অক্সিজেন ঠিকভাবে সরবরাহ করতে না পারায় বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

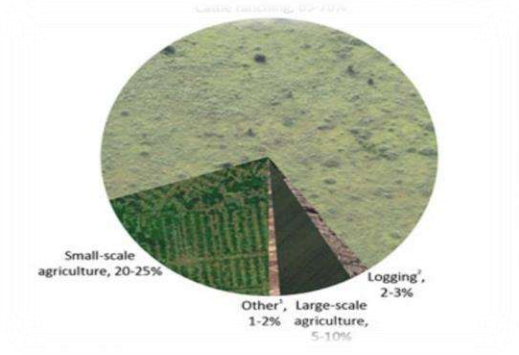

চিত্র ৭

দূষণ:-আগুন লাগার ফলে জল, মাটি এবং বাতাস দূষিত হচ্ছে।দূষণের ফলে জীবনযাত্রার মান এবং বাস্তু তন্ত্রের ব্যাঘাত ঘটেছে।

ব্রাজিলের স্যাটেলাইট এজেন্সি, বনভূমি জ্বালানোর চেয়েও খারাপ বলে মনে করা হচ্ছে, মহাকাশ গবেষণা জন্য জাতীয় ইনস্টিটিউট কমপক্ষে 7,747 কিলোমিটার অনুমান করে ব্রাজিলিয়ান অ্যামাজন রেইন ফরেস্টের ইতিমধ্যে এ বছর পরিষ্কার করা হয়েছে, এবং এই সংখ্যাটি আরও বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে।

চিত্র ৮

অ্যামাজন বনভূমির অরণ্যাবৃত অংশের পরিমাণ

পিরিয়ড	আনুমানিক অবশিষ্ট বন ব্রাজিলিয়ান আমাজনে (কিমি)২	বার্ষিক বনের ক্ষতি (কিমি)২	১৯৭০ এর শতাংশ আবরণ বাকি	মোট ক্ষতি ১৯৭০ সাল থেকে (কিমি)২
প্রাক ১৯৭০	৪,১০০,০০০	-	-	-
১৯৭৭	৩,৯৫৫,৮৭০	২১,১৩০	৯৬.৫	১৪৪,১৩০
১৯৭৮-১৯৮৭	৩,৭৪৪,৫৭০	২১,১৩০	৯১.৩	৩৫৫,৪৩০
১৯৮৮	৩,৭২৩,৫২০	২১,০৫০	৯০.৮	৩৭৬,৪৮০
১৯৮৯	৩,৭০৫,৭৫০	১৭,৭৭০	৯০.৪	৩৯৪,২৫০
১৯৯০	৩,৬৯২,০২০	১৩,৭৩০	৯০.০	৪০৭,৯৮০
২০১৪	৩,৩৩৬,৮৯৬	৫,০১২	৮১.৪	৭৬৩,১০৪
২০১৫	৩,৩৩০,৬৮৯	৬,২০৭	৮১.২	৭৬৯,৩১১
২০১৬	৩,৩২২,৭৯৬	৭,৮৯৩	৮১.০	৭৭৭,২০৪
২০১৭	৩,৩১৫,৮৪৯	৬,৯৪৭	৮০.৯	৭৮৪,১৫১
২০১৮	৩,৩০৮,৩১৩	৭,৫৩৬	৮০.৭	৭৯১,৬৮৭
২০১৯	৩,২৯৮,৫৫১	৯,৭৬২	৮০.৫	৮০১,৪৪৯

How to Overcome

পৃথিবীর সবুজ ফুসফুস অবিরাম বললেও তথাকথিত মনুষ্য জাতির তেমন প্রক্ষেপ নেই। তথাকথিত মোড়ল দেশগুলো একজন আরেকজনের দিকে তাকিয়ে আছেন।অ্যামাজনের বাঁচার আর্ত চিৎকারে সমগ্র পৃথিবী আজ বিভীষিকাময়। অ্যামাজনের পোড়ার গন্ধ আজ মহা দেশ থেকে অন্য দেশে ছড়িয়ে পড়ছে।

অ্যামাজনের আগুন অর্থাৎ পৃথিবীর ফুসফুস কিভাবে রক্ষা করা যেতে পারে? তার জন্য একটি জিনিস করা যেতে পারে বা করতে পারেন:-

১. ইকর জমি রক্ষা করা। 2. কিছু জমি কিনা। ৩. আদিবাসী জনগোষ্ঠী কে সমর্থন করা। ৪. কাঠ এবং কাগজের ব্যবহার হ্রাস। ৫. নৈতিক ভাবে খাওয়া। ৬. ভোটদান। ৭. এছাড়াও আরো বেশি রাজনৈতিক হয়ে উঠতে হবে। ৪. চ্যালেঞ্জ কর্পোরেশন।

উপরের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ গুরুত্বপূর্ণ এবং এগুলি পৃথক স্তরে সমুদ্রের একটি ছোট ড্রপের মতো মনে হলেও সম্মিলিতভাবে আমরা একটি বড় পার্থক্য করতে পারি। পরিবর্তনের জন্য চাপ দেওয়া, অ্যাকাউন্টে শক্তি ধরে রাখা এবং পরিবেশ ধ্বংস বন্ধ করতে এখনও সময়

রয়েছে – তবে আমাদের অবশ্যই দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে।

My suggestion and recommended

বৃহস্পতিবার “নেচার ক্লাইমেট চেঞ্জ” জার্নালে প্রকাশিত এক গবেষণা পত্রে ২০১০ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত সময়কালে হিসাব দেওয়া হয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, এই সময়ে১৬.৬ বিলিয়ন টন কার্বন ডাই অক্সাইড ত্যাগ করেছে অ্যামাজন। আর টেনে নিয়েছে মাত্র ১৩.৯ বিলিয়ন টন। সুতরাং, বাকিটা থেকে যাচ্ছে পরিবেশে। এর থেকে পরিষ্কার পৃথিবীব্যাপী বিশ্ব উষ্ণায়ন ও পরিবেশ দূষণ থেকে বাঁচতে অ্যামাজনের উপর ভরসা করা আর সম্ভব হচ্ছে না।

অ্যামাজন আগুনে জ্বলছে যেহেতু প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে এবং কেউ এই সম্পর্কে কিছুই করছে না। আপনি কি জানেন যে অ্যামাজন আমাদের গ্রহটির অক্সিজেন এর ২০% বেশি উৎপাদিত করেছিল বা এটি পুরো পৃথিবীর বৃহত্তম জীববৈচিত্র্য। এবং সবচেয়ে কৌতুহল জনক বিষয় এটি : এটি ৩০ মিলিয়নের বেশি লোকের বাড়ি এটি।এটি সমস্ত রাষ্ট্রপতি, রাজনীতিবিদদের সংগঠনের কাছে একটা বার্তা, সরকার আসলে এই আগুন বন্ধ করার ক্ষমতা রাখে।

আমি এখনো মানবতাকে বিশ্বাস করি যে বুদ্ধি এবং শক্তি আমাদেরকে দিয়েছিল কেবল মানুষই তা করতে পারে না ধ্বংস করার পাশাপাশি আমাদের গ্রহের নির্মাণ ও সুরক্ষার জন্য ব্যবহার করতে হবে। যদি আমরা মানুষেরা একসাথে না দাঁড়িয়ে থাকি তবে একটা সুন্দর সমাজ গড়ে তুলতে পারব না। তবে আমরা যদি সাহায্যের হাত বাড়াই একসঙ্গে মিলে অ্যামাজনের পরিবেশ রক্ষার জন্য সচেতন হয় তাহলেআমার ধারণা যে অ্যামাজনে ঘনঘন আগুন আর লাগবেনানা।

চিত্র ৯

চিত্র ১০

GEO-TALK
A Journal of Man and Environment
Journal available at: http://www.hbcnht.edu.in/college_magazine.php

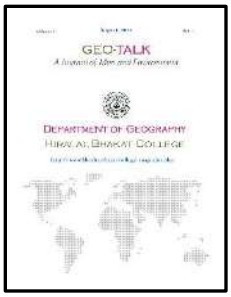

শহুরে তাপ দ্বীপ

রঘুনাথ মণ্ডল*

Semester-IV, Department of Geography, Hiralal Bhakat College, Nalhati, Birbhum

ARTICLE INFO

Keywords:
Urban Heat Island
নগরাঞ্চল
কংক্রিট
লন্ডন

Article history

Received: 8th July, 2021
Revised: 30th July, 2021
Accepted: 12th August, 2021
© ***Dept. of Geography, Hiralal Bhakat College***

ABSTRACT

শহরের আবহাওয়া মূলত দহনের ফলে এবং কংক্রিট এর মাধ্যমে বাড়িঘর নির্মাণের ফলে নির্গত গ্যাস গুলি সূর্যের তাপমাত্রাকে ধরে রাখে। ফলে নগর অঞ্চলের তাপমাত্রা অধিক হয়। এর ফলে সমগ্র বায়ুমণ্ডলের এক অস্বাভাবিক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়।বাস্তুতন্ত্র বলা হয়।

ভূমিকা

নগর হল এমন একটি স্থান যেখানে প্রচুর জনগণের সমাগম ও অর্থনৈতিক কার্যকলাপ লক্ষ্য করা যায়। ফলে মানুষের জীবনযাত্রার মানও এখানে উন্নত হয়। বিভিন্ন স্বার্থকে সংরক্ষিত রাখার জন্য পরিবেশ কে দূষিত করে চলেছে। ফলে নগরাঞ্চলের তাপমাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাঁর নাম হল নগরতাপদ্বীপ।

উপস্থাপক

১৮১০ সালে লুক হাওয়ার্ড নামে এক বিজ্ঞানী নগরতাপদ্বীপ প্রথম লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন লন্ডনের নগর কেন্দ্রটির প্রায় আশেপাশের গ্রামাঞ্চলের তুলনায় ২.১° বেশি উত্তপ্ত।

পরিবেশ দূষণ ও নগর তাপদ্বীপ: শহরের আবহাওয়া মূলত দহনের মাধ্যমে ধোঁয়া, ধুলো, কার্বন- ডাই- অক্সাইড, সালফার- ডাই- অক্সাইড, নাইট্রোজেন-ডাই- অক্সাইড ইত্যাদি দ্বারা দূষিত হয়। এই গ্যাসগুলি সূর্যরশ্মির তাপমাত্রাকে ধরে রাখে।এছাড়াও সূর্যরশ্মির প্রবেশপথে বাধা প্রদান করে ঘনীভবনের জলাকর্ষী কণা সরবরাহ করে ।কণাগুলি শুধু সৌরবিকিরণকে কেবল বিচ্ছুরিত ও শোষন করে না , ভূপৃষ্ঠ থেকে বর্হিগামী অবলোহিত বিকিরণে প্রভাবিত করে।ফলে গ্রামাঞ্চলের তুলনায় শহরাঞ্চলে অধিক উত্তপ্ত হয়।

*Corresponding author
E-mail address: mondalraghu62@gmail.com

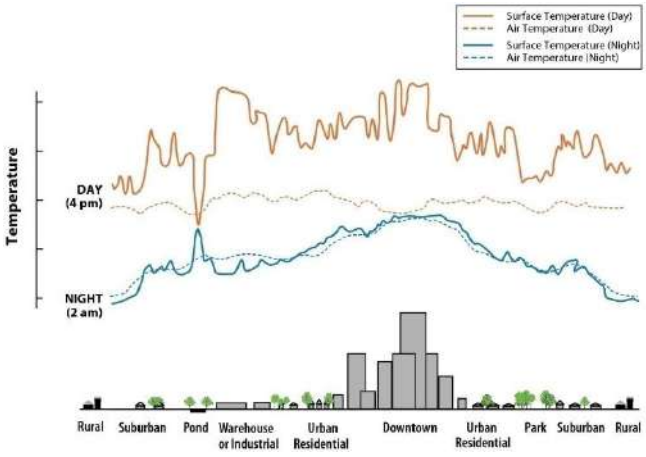

চিত্র ১

সৃষ্টির কারণ

নগর তাপদ্বীপ সৃষ্টির কয়েকটি কারণ রয়েছে। যেমন-

১। নগর অঞ্চলের ফুটপাথও ছাদের জন্য সাধারণত কংক্রিট ও অ্যাসফাল্ট ব্যবহৃত হয়। এগুলির তাপধারণক্ষমতা ও তাপ পরিবাহিতা ও পৃষ্ঠের রেডিয়েটিভ বৈশিষ্ট্য আছে। এর ফলে শহরাঞ্চলে গ্রামাঞ্চলের তুলনায় অধিক পরিমাণে উত্তপ্ত হয়।

২। নগরাঞ্চলে গাছপালার অভাব দেখা যায়।গাছপালার অভাবের জন্য ছায়ার অভাব হয় ও বাষ্পীভবনের শীতলভাব কমে যায়। USA Forest servicity 2018 সালে পাওয়া তথ্যানানুযায়ী আমেরিকা প্রতিবছর ৩৬ মিলিয়ন গাছ হারাচ্ছে ফলে আমেরিকার বহু স্থান আজ শহুরে তাপদ্বীপের অধীন

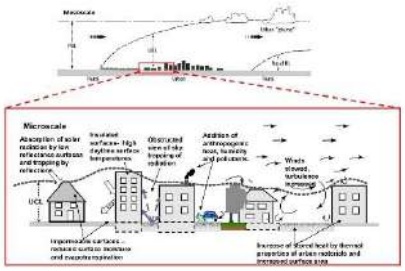

চিত্র ২

৩। বড় বড় শহর লম্বা বিল্ডিং ও বহুতলবিশিষ্ট হয়। উঁচু বিল্ডিং সূর্যের আলোর প্রতিবিম্ব শোষনের জন্য একাধিক পৃষ্ঠতল পায়। ফলে নগরাঞ্চল প্রচুর পরিমাণে উত্তপ্ত হয়।একে Urban Canyon Effect বলে।বহুতলগুলি বাতাসকে বাধা প্রদান করে ফলে বৃষ্টির প্রাধান্য কমে যায় এবং শীতলভাব কমে ক্রমশ উষ্ণ হয়ে পড়ছে।

ভারতের তাপদ্বীপের উদাহরণ:- বড়, ছোট, মাঝারী শহরগুলির মধ্যে ভারতের উষ্ণতম দ্বীপ হয়ে উঠেছে কলকাতা শহর। গত তিন দশকে দিনে আর রাতে কলকাতার গা জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে তীব্র দহনজ্বালায়। ব্যবধান বেড়ে চলেছে রাত ও দিনের তাপমাত্রার মধ্যে। মত দিন অতিবাহিত হচ্ছে এটি আরো তীব্রতর হচ্ছে। শীত , গ্রীষ্ম, বর্ষা সহ বছরের বারোমাসই কলকাতার গড় তাপমাত্রা ২° সেলসিয়াস বেড়ে গেছে। এছাড়াও চেন্নাই, মুম্বাই ও দিল্লিতে তাপমাত্রা ক্রমবর্ধমান।

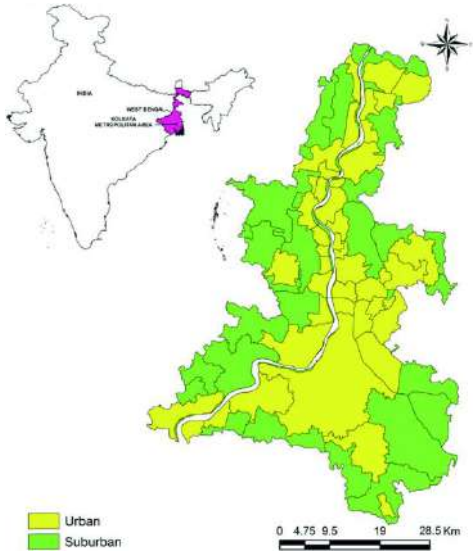

চিত্র ৩

প্রভাব

নগর তাপদ্বীপ প্রতিনিয়তই আবহাওয়া, মানুষ, জীবজন্তু, এবং পরিবেশের উপর প্রভাব বিস্তার করে চলেছে।

১| নগর তাপদ্বীপ বৃদ্ধির ফলে আবহবিদ্যার ওপর গৌণ প্রভাব পড়ে। মেঘ ও কুয়াশার বিকাশ, আর্দ্রতাও বৃষ্টিপাতের হার UHI দ্বারা সরবরাহকৃত তাপের প্রভাবে আরো উর্ধ্বমুখী হচ্ছে।

২| চীনা গবেষণা ইঙ্গিত দেয় যে নগর তাপদ্বীপ জলবায়ু উষ্ণায়নে প্রায় 30% অবদান রাখে। আরও একটি সমীক্ষায় জানা গেছে যে শহরগুলির তাদের অঞ্চলের থেকে 2- 8 গুণ বড়ো অঞ্চলের জলবায়ুকে পরিবর্তন করতে পারে।

৩| UHI বৃদ্ধির ফলে আজ বহু প্রাণী প্রজাতি আজ বিলুপ্তির পথে। যেমন অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে পাওয়া ধূসর মাথাযুক্ত উড়ন্ত শিয়াল।ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রা, গরম শীতের পরিস্থিতি সৃষ্টি করে শহরটি জলবায়ুর সাথে আরও বেশি প্রজাতির বাসস্থান বন্যভূমিকে ধ্বংস করে চলেছে।

৪| UHI শহরের জনগণের স্বাস্থ্য ও শরীরের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে ।এর ফলে তাপ স্টোক, হীট সিনকোপ প্রভৃতি রোগের সৃষ্টি হয়

৫| ফুটপাথ ও ছাদপৃষ্ঠের উষ্ণতা জলের প্রবাহকে উত্তপ্ত করে রাখে। এই জল প্রবাহিত হয়ে নদী, হ্রদ, সমুদ্রের প্রচভূতি জলাশয়ে গিয়ে পড়ছে। ফলে জলাশয়ের তাপমাত্রা ক্রমশই বেড়ে চলেছে। এর ফলে জলজ বাস্তুতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

কমানোর উপায়:- UHI কমানোর জন্য আন্তর্জাতিক ও জাতীয় স্তরে বহু প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। যেমন-

১| ক্যালিফোর্নিয়ার Air Resources Board কম কার্বন জ্বালানির মানকে নিয়ন্ত্রণ করে।এবং উক্ত শহরে ক্লিনার জ্বালানীকে পছন্দ করা হয়। পেট্রোলিয়াম ভিত্তিক জ্বালানী গুলিতে 2020সালের মধ্য কার্বনের তীব্রতা 10% হ্রাস করতে হবে।

২| বায়ুমণ্ডলে প্রকাশিত গ্রিন হাউস গ্যাস ক্যাপস্থাপন করে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব হ্রাস করার চেষ্টা করা হচ্ছে। প্রতি বছর ক্যাপটি 3% হ্রাস পাবে।

৩| UHI কমানোর আরও একটি উপায় হল ক্লিন এয়ার অ্যাক্টকে কঠোরভাবে মেনে চলা।এই আইনে বলা হয়েছে যে সমস্ত রাজ্যকে অবশ্যই একটি রাজ্য বাস্তবায়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবেমা সমস্ত রাজ্যের বায়ুর গুণমান পর্যালোচনা করে।

৪| গ্রিসের রাজধানী তেহরানে শহুরে তাপদ্বীপের প্রভাব হ্রাস করার জন্য ও যানবাহন থেকে দূষণের প্রভাব হ্রাস করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছে। শহরটিকে শীতল করার জন্য সবুজ স্পেস তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে। এবং ছোট অব্যবহৃত জমিগুলিকে বৃক্ষরোপণের কাজে লাগানো হয়েছে।

৫| শীতল ছাদ স্থাপন করলে একে খুব সহজেই নিয়ন্ত্রন করা যেতে পারে। এই শীতল ছাদ সূর্যের আলো ও তাকে প্রতিবিম্বত করতে সাহায্য করে। ফলে সূর্যের সরাসরি শহরাঞ্চলে উত্তপ্ত করতে পারে না। ক্যালিফোর্নিয়া পরিচালিত একটি সমীক্ষায় জানা গেছে যে শীতল ছাদগুলি প্রতি বর্গফুটের প্রায় 50 সেন্ট শক্তি সঞ্চয় করতে পারে। এজাতীয় শক্তি সাশ্রয়ের ফলে বায়ুর গুণমান উন্নত হয়ও বায়ুমণ্ডলে কম পরিমাণে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গত হয়।

মতামত:- নগর তাপদ্বীপ মূলত পরিবেশ দূষনের সঙ্গে সম্পর্কিত। পরিবেশ দূষিত হলে প্রচুর পরিমাণে ক্ষতিকারক গ্যাস তৈরী হয়।মা বায়ুর তাপমাত্রাকে শোষণে সক্ষম হয়। পরিবেশ দূষণ পরিলক্ষিত হয় মহানগর বা শহরাঞ্চলে।তাপমাত্রা বাড়ার ফলে যেমন মানবজাতির অস্তিত্ব অসহনীয় হয়ে পড়ছে ঠিক তেমনি আবহাওয়া, জীবজন্তুর ওপরও এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। শহুরে তাপদ্বীপমুক্ত পৃথিবী গড়ে তুলতে হলে জনসাধারণকে সতর্ক করে তুলতে হবে পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে। কারণ পরিবেশ যতই দূষিত হবে মানুষের আবাসস্থল এই পৃথিবী একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে।

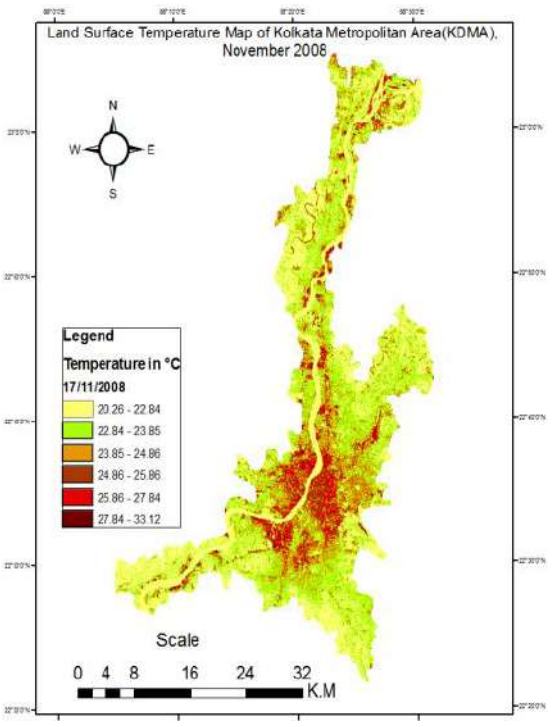

চিত্র ৪

GEO-TALK
A Journal of Man and Environment
Journal available at: http://www.hbcnht.edu.in/college_magazine.php

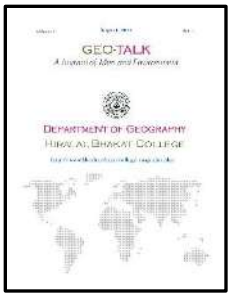

সুন্দরবন ভঙ্গুর বাস্তুতন্ত্র

রাজীব হেমব্রম*

Semester-IV, Department of Geography, Hiralal Bhakat College, Nalhati, Birbhum

ARTICLE INFO

Keywords:
ভঙ্গুর বাস্তুতন্ত্র
উপকূলীয় ক্ষয়
জীববৈচিত্র্য
নদীপার ভাঙ্গন নাগারতাপদ্বীপ

Article history

Received: 8th July, 2021
Revised: 30th July, 2021
Accepted: 12th August, 2021
© ***Dept. of Geography Hiralal Bhakat College***

ABSTRACT

গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা এবং তাদের শাখানদি সমূহের পলি সঞ্চয়নের দ্বারা গঠিত গঙ্গা বদ্বীপের প্রায় 10 লক্ষ স্থলভূমি ও জলভাগ নিয়ে সুন্দরবন বনাঞ্চল গড়ে উঠেছে। এই সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্র একটি Aqua-Terrestrial ecosystem, উপকুলীয় ক্ষয়, ডিপ্রেশন, সুনামী, সামুদ্রিক ঝড় ও সাইক্লোন এখানকার ম্যানগ্রোভ বানাভুমিকে শেষ করে দিচ্ছে। মৃত্তিকা ও জলের লবনতার পরিবর্তন, নদীপার ভাঙ্গন এখানকার নিয়মিত সমস্যা , তাই এখানকার বাস্তুতন্ত্র কে ভঙ্গুর বাস্তুতন্ত্র বলা হয়।

ভূমিকা

সুন্দরবনের উপকূলীয় জলাভূমিগুলি, বাংলাদেশ এবং ভারত জুড়ে ১০,০০০ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে ,পরিবেশগত ভারসাম্য এবং স্থানীয় আর্থসামাজিক উন্নয়নে সম্ভাব্য ভূমিকা পালন করছে। উপকূলীয় ম্যানগ্রোভ বিশ্বের সর্বাধিক গতিশীল এবং সম্ভাব্য পরিবেশ অঞ্চল সুন্দরবন বিশ্বের বৃহত্তম বন যা ১৯৯৭ সালে ইউনেস্কো দ্বারা বাংলাদেশ বিশ্ব প্রাকৃতিক ঐতিহ্য স্থান (ডাব্লু.এন.এইচ.এস.) এবং ম্যানগ্রোভ বনের ভারতীয় অংশে ১৯৮৭ সালে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসেবে ঘোষিত হয়েছিল। এটি জীববৈচিত্র্যের হটস্পট হল ৩৩৩ ফিউনাল এবং ৩২৪টি ফুলের প্রজাতি। এপারের অঞ্চলটি আন্তর্জাতিকভাবে রামসার সাইট হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ এবং বিশ্বব্যাপী উল্লেখযোগ্য জীববৈচিত্র্য এবং গতিশীল সংবেদনশীল বাস্তুসংস্থান(রিচার্ডসন ১৯৯০) এর ভান্ডার হিসেবে স্বীকৃত।

নামকরণ

বাংলায় সুন্দরবন এর আক্ষরিক অর্থ সুন্দর জঙ্গল বা সুন্দর বনভূমি। সুন্দরী গাছ থেকে সুন্দরবনেরনাম করন হতে পারে , এর নামকরণ হয়তো হয়েছে "সমুদ্র বন" বা "চন্দ্র-বান্ধে(বাঁধে)" (প্রাচীন আদিবাসী) থেকে।তবে সাধারণভাবে

*Corresponding author
E-mail address: rajibhembram2000@gmail.com

ধরে নেওয়া হয় যে সুন্দরী গাছ থেকেই সুন্দরবনের নামকরণ হয়েছে।

সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য

নদী গুলির বহনকারী প্রচুর পরিমাণে পললগুলি এর সম্প্রসারণ এবং গতিশীলতায় অবদান রাখে। লবণাক্ততার গ্রেডিয়েন্টগুলি স্থানিক এবং অস্থায়ী স্কেল এর বিস্তৃতি পরিসরে পরিবর্তিত হয়। জীব বৈচিত্র প্রায় ৩৫০প্রজাতির ভাস্কুলার উদ্ভিদ,২৫০মাছ এবং ৩০০পাখি রয়েছে, এছাড়াও রয়েছে, অসংখ্য প্রজাতির ফাইটোপ্লাংটন, ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া, জুপ্লাংকটন বেন্টিক ইনভারট্রেটস, মল্লাস্কস, সরীসৃপ, উভচর এবং স্তন্যপায়ী প্রাণীরা।

চিত্র ১

প্রজাতি রচনা এবং সম্প্রদায় কাঠামো পূর্ব থেকে পশ্চিমে এবং হাইড্রলজিক্যাল এবং লবণাক্ততার গ্রেডিয়েন্ট গুলির সাথে পৃথক হয়। সুন্দরবন হলো বিরল ও বিপন্ন প্রাণীর আবাসস্থল (বাটাগুর বাসকা, পেলোচেলিস বিব্রোনি, চেলোনিয়া মাইডাস) বিশেষত রয়েল বেঙ্গল টাইগার (পান্থের টাইগ্রিস)। গন্ডার ,বুনো মহিষ, হরিণ এখন অঞ্চল থেকেবিলুপ্ত। সুন্দরবন ম্যানগ্রোভ এর বৃহৎ অঞ্চলগুলি গত দুই শতাব্দীতে ধানক্ষেত এবং আরো সম্প্রতি চিংড়ি খামারে রূপান্তরিত হয়েছে। বিভিন্ন মানব প্রয়োজনে এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য জল উজানে প্রবাহিত করার জন্য ধারাবাহিক বাঁধ, ব্যারেজ ও বাঁধ দিয়ে নদীর প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ এবং লবণাক্ততা বৃদ্ধি ও পলল পরিবর্তনের কারণে মিঠা পানির প্রবাহ কে ব্যাপক হারে হ্রাস পেয়েছে এবং জীব বৈচিত্রের মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ অরণ্য

সুন্দরবন একটি হল ম্যানগ্রোভ এলাকা বদ্বীপ সঙ্গমস্থলে দ্বারা গঠিত গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনা নদীর মধ্যে বঙ্গোপসাগরে। সর্বাধিক প্রচুর গাছের প্রজাতি হল সুন্দ্রি (হেরিটিয়র ফোমস) এবং গেওয়া।২০০৭ সালে ঘূর্ণিঝড় সিডরের অনুধাবন সুন্দরবনের প্রায় ৪০% ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। আবার ২০০৯সালের মে মাসে ঘূর্ণিঝড় আইলা সুন্দরবনে ব্যাপক হতাহতের ঘটনা ঘটায়। কমপক্ষে ১০লক্ষ মানুষ এই ঘূর্ণিঝড় দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল। ২০২১সালে যশ ঝড়ের মাধ্যমে প্রায় ২০ লক্ষ মানুষ এই ঘূর্ণিঝড় দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল। ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের আরো ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে ইউনেস্কো দ্বারা।

সুন্দরবন একটি সীমিত স্থান: স্থানান্তরিত স্থান, জমি বা জল নয়। একদিন যা সৃষ্টি হয় তা অন্য দিন ধ্বংস হয়ে যায়। সুন্দরবন সুন্দর হলেও এটি বিপদজনকও। কেউ প্রতিদিন প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে না, তবে বেঁচে থাকার জন্য তাদের প্রতিদিনের সংগ্রামে জাতী ও ধর্মে র বৈষম্যমূলক পার্থক্যকে ও স্পষ্ট করে বাঁচার জন্য সেখানকার মানুষদের অবশ্যই তা করতে হবে। কোন ব্যক্তি স্ক্র্যাচ তার ঘরটি কতবার তৈরি করতে পারে ?প্রতিবছর সমুদ্র তাদের পায়ের নিচ থেকে আরও কিছু জমি খায় বা একটি ঘূর্ণিঝড় তাদের উপরে আকাশ থেকে আঘাত করে। ভারতের এই অংশটি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গল্পের অংশ নয়, তবে সুন্দরবনের লোকেরা আমাদের তাৎক্ষণিক মনোযোগের প্রাপ্ত ,কারণ এগুলি সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে বেচেঁ থাকার মহাকাব্য কথা।

ভঙ্গর বাস্তুতন্ত্র বলার কারণ

বাস্তুস্থান ধ্বংস এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একটি প্রাকৃতিক আব্বাস তার মূল প্রজাতিগুলো কে সমর্থন করতে অক্ষম হয়ে যায়। যে জীব গুলি আগে সাইটে বাস করত তারা বাস্তুচ্যুত বা মৃত ,যার ফলে জীব বৈচিত্র এবং প্রজাতির প্রাচুর্য হ্রাস পায়। বাস্তু স্থান ধ্বংস হল জীববৈচিত্র্য ক্ষয়ের অন্যতম প্রধান কারণ।স্থান ধ্বংস হল জীব বৈচিত্রের অন্যতম প্রধান কারণ।প্রাকৃতিক সম্পদ সংগ্রহ, শিল্প উৎপাদন এবং নগরায়নের মত ক্রিয়া-কলাপ আব্বাস ধ্বংসের মানুষের অবদান। কৃষি ক্ষেত্রের চাপ প্রধান কারণ মানুষের কিছু অন্যের মধ্যে খনন, লগিং, ট্রলিং এবং শহরে ছড়িয়ে পড়া অন্তর্ভুক্ত।

বাসস্থান ধ্বংসকে বর্তমানে বিশ্বজুড়ে প্রজাতি বিলুপ্তির প্রাথমিক কারণ হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

চিত্র ২

সামুদ্রিক ঝড়

"এটি আপনার চেয়েও খারাপ আরো খারাপ, আরওখারাপ," ডেভিড ওয়ারলেস ওয়েলস তার২০১৯সালেরজলবায়ু পরিবর্তন, আনইনহ্যাবটেবল আর্থ বইটিতে লিখেছেন। শতাধিক জলবায়ু বিশেষজ্ঞের সাথে সাক্ষাৎকার এর পরে তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন, জলবায়ু পরিবর্তন আনুপাতিকভাবে উন্নয়নশীল বিশ্বকে ধ্বংস করে এবং তা অব্যাহত রাখবে, যেহেতু সে পৃথিবীর যে কোনও দেশ সবচেয়ে বেশি আঘাত হানবে।

ওয়েলস জলবায়ু ক্যাস্ক্যাডের ধরনের বর্ণনা দেয় যা আমরা দেখতে পাব!"আরো বেশি করে নোনাজলের সাথে শস্যক্ষেত্রের সমুদ্রস্তরের উল্খান, কৃষিক্ষেত্রগুলিকে ঝাঁকানো স্পন্দনে রূপান্তরিত করে তাদের জীবিতদের পর্যাপ্ত পরিমাণে খাওয়ানো সম্ভব নয় ;বন্যার বিদ্যুৎ কেন্দ্র গুলি অঞ্চলে অফলাইনে দিকটি যেমন বিদ্যুতের সর্বাধিক প্রয়োজন হতে পারে ;এবং বিকলাঙ্গ রাসায়নিক এবং পারমাণবিক উদ্ভিদ যা দূষিত হয়ে তাদের বিষাক্ত গ্রামগুলি শ্বাস নেই/"

বঙ্গবসাগর সাগরদ্বীপে এর মধ্যে অনেক জলবায়ু ক্যাসকেড ইতিমধ্যেই বাড়ছে এবং আগামী দশক গুলিতে আরো খারাপ হওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। ১০০টিরও বেশি দ্বীপজুড়ে ভারতীয় সুন্দরবন (৪৫ মিলিয়ন জনসংখ্যার একটি অঞ্চল) গঠন করে, সাগর দ্বীপ টি বৃহত্তম এবং সর্বাধিক জনবহুল যা প্রায় ২০০০০০ এরও বেশি বাসিন্দা। বাংলাদেশের সাথে যুক্ত বিশ্বের বৃহত্তম ব-দ্বীপ অঞ্চল হিসাবে, সাগর জলবায়ু বিজ্ঞানী এবং গবেষকদের কাছে একটি জলবায়ু " হৎস্পট" হিসাবে প্রত্যেকটি হয়ে উঠেছে এবং ভারতের জলবায়ু ভবিষ্যতের চেহারা কেমন হতে পারে তার এক ঝলক।

ভারতের জনসংখ্যার ২০ শতাংশেরও বেশি (প্রায় ২৫০ মিলিয়ন মানুষ) সমুদ্রের ৫0 কিলোমিটার (৩১ মাইল) এর মধ্যে বসবাস করে, বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাব কে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। চরম তাপমাত্রা , বৃষ্টির পরিবর্তন চরম, আবহাওয়ার ঘটনা এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উল্খান সবই বাড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

নদীপাড় ভাঙন

উচ্চ ও নিম্ন জোয়ারের সময় লবণাক্ত জলের নিমজ্জিত বাড়িঘর এবং কৃষি ক্ষেত্র গুলি প্রতিদিন দুইবার। নদী-নালা গুলির মাঝে হঠাৎ বালির গুলি উপস্থিতি বা নদীর তীরগুলির দ্রুত ক্ষয় হওয়া একটি প্রাকৃতিক ঘটনা। তথ্যগুলি দেখায় যে গত ১০০ বছরে সুন্দরবন ৪০০ বর্গকিলোমিটারও বেশি জমি হারিয়েছে। লোহাচারা এবং সুপারি ভাঙার মতো দ্বীপপুঞ্জ মানচিত্র থেকে সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে গেছে। ক্ষয় এর ফলে ঘোড়ামারা দীপ্তি ৮.৮৫ বর্গকিলোমিটার থেকে প্রায় ৪.৪৩ বর্গ কিলোমিটার হ্রাস পেয়েছে। একবার ৪০০০০ লোকের বাসায় থাকার পরে ঘোড়ামারা আব্বা স্থলের ক্ষতির কারণে ব্যাপক যাত্রা শুরু করেছে।২০১১ সালের আদমশুমারিতে এই দ্বীপে লড়াই করা মাত্র ৫০০ বিজোড় লোককে গণনা করা হয়েছে।

সুন্দরবনের ভারতীয় পাশের মোট ১০২টি দ্বীপের মধ্যে ৫৪টি দ্বীপ রয়েছে। যদিও একটি জলাভূমিতে অবস্থিত, সুন্দরবন টিপে জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি। অনেক ছোট বড় শিল্প এখানে কাজ করে। ইটভাটা এবং ভেড়ির(পিসিকালচার এর জন্য পুকুর) অসাধু মালিকরা তাদের চত্বরে নদীর জল প্রায়শই বাঁধ গুলিতে গর্ত তৈরি করেন। নদীর পানি মাছ নিয়ে আসে ,যা মৎস্য চাষে সহায়তা করে ,যখন পলি পলিইটভাটা গুলিকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে কাঁচামাল সরবরাহ করে। যাইহোক, এই জাতীয় অবৈধ কার্যকলাপ বাঁধ গুলি দুর্বল করে এবং শেষ পর্যন্ত সেগুলি লঙ্ঘন হয়।

গঙ্গা নদী বঙ্গোপসাগরে প্রবেশের মাধ্যমে সুন্দরবনের ব-দ্বীপ গঠিত হয়েছিল। যাত্রার এই শেষ পর্যায়ে, নদীতে বিছানায় প্রচুর পরিমাণে পলি জমা করে দেয়। দীর্ঘমেয়াদী পলি জমে জলের স্তর ধীরে বাড়ছে। বর্তমানে গ্রামগুলি গড় সমুদ্রতল থেকে মাত্র১.৫থেকে ৩ মিটার উপরে পূর্ণিমা বা অমাবস্যার

সময়, জোয়ার গুলি যখন ৫ থেকে ৬ মিটার উঁচুতে পৌঁছাতে পারে তখন অনেকগুলি গ্রাম প্লাবিত হয় এবং কখনও কখনওইতিউর গ্রামগুলি ভেঙ্গে পড়ে যায় এবং কোন চিহ্ন ছাড়াই ডুবে যায়। অপরিশোধিত মাটির বাঁধ গুলি উচ্চ জলের স্তর থেকে একমাত্র সুরক্ষা তৈরি করে। যদিও ঘূর্ণিঝড়, আইলার, আম্ফান, যশ পরে কয়েকটি স্থানে কংক্রিট বাঁধ গুলি নির্মিত হয়েছিল, সেগুলি খুব খারাপ অবস্থায় বা এখনো অসম্পূর্ণ। ক্রমবর্ধমান জলের স্তর দ্বারা নিমজ্জিত হওয়ার আশঙ্কা এখানকার মানুষের পক্ষে এটিই বাস্তব।

রক্ষার উপায়

১) সুন্দরবন পরিবেশগত সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে যেমন সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, লবণাক্ততা বৃদ্ধি, মানুষ ঝুঁকিপূর্ণ , বন উজাড় ইত্যাদি সমস্যা দেশের অন্যান্য অঞ্চলে মানুষের হিজরত কে সৃষ্টি করে।

২) সুন্দরবনের সমস্যা গুলি সম্পর্কে এলাকার মানুষকে সচেতন করতে হবে। কৃষক এবং তাদের পরিবারকে বুঝতে হবে যে তারা যে সমস্যাগুলো বা পরিবর্তনগুলো মুখোমুখি হচ্ছে তারা তাদের আলিঙ্গন করা উচিত। বনভূমি কাটা ইত্যাদির মত মানুষের দ্বারা সৃষ্ট বিপদগুলির পরিণতি সম্পর্কে তাদের সচেতন হওয়া উচিত।

৩) উভয় দেশের মধ্যে সুন্দরবনকে বাঁচাতে একটি যৌথ সভা করা উচিত। এর মধ্যে বিজ্ঞানী বা পরিবেশবিদ এবং এনজিওর মত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জড়িত হওয়া উচিত।

৪) বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা, এনজিও বা অন্যান্য ব্যাংকের সুন্দরবন বাঁচাতে তহবিল অনুমোদনের জন্য এগিয়ে আসা উচিত। স্থানীয় সম্প্রদায়গুলীকে তহবিল সরবরাহ করা উচিত যাতে তারা অন্যান্য পুষ্টির উৎস গ্রহণ করতে পারে।

৫) চিত্তাকর্ষক আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ভারত এবং বাংলাদেশ ও বেসরকারি প্রয়োগ করতে হবে। নেপাল ,ভুটান ,চীন ইত্যাদির মতো প্রতিবেশী দেশগুলির কেউ সুন্দরবনের অবস্থার উন্নতি করতে যে কোন উপায়ে অবদান রাখতে হবে।

উপসংহার

ভূমি সমুদ্রের ইন্টারফেসে ম্যানগ্রোভ গুলি বিচিত্র এবং উচ্চ উৎপাদনশীল পরিবেশগত সম্প্রদায়; এগুলি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইকোসিস্টেম পরিষেবাগুলি সরবরাহ করে, যার মধ্যে রয়েছে: এর কয়েক মিলিয়ন বাসিন্দাদের জন্য খাদ্য ও জলের ব্যবস্থা, ঘূর্ণিঝড় এবং সুনামির মতো প্রাকৃতিক ক্ষতির সবচেয়ে খারাপ প্রভাবগুলির বিরুদ্ধে সুরক্ষা :দৈত্য দীর্ঘমেয়াদি কার্বন সিঙ্ক হিসাবে কাজ করার ক্ষমতা: পার্থিব পলল ধরে রাখা এবং বিরল ও সুরক্ষিত রয়েল বেঙ্গল বাঘ সহ অনেক প্রজাতির আবাস্থল হিসেবে। শিল্প দূষণ, প্রবাহিত বাঁক প্রকল্প,বন সাফাইকরন এবং গুরুত্বপূর্ণভাবে স্থানীয় জীবিকার প্রয়োজনের সমাধান না করে ইকোসিস্টেমকে অপূরণীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

চিত্র ৩

GEO-TALK
A Journal of Man and Environment
Journal available at: http://www.hbcnht.edu.in/college_magazine.php

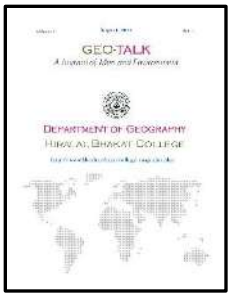

প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার; পরবর্তীপ্রজন্মেরবিঘ্ন না ঘটিয়ে

সাদিরুল সেখ*

Semester-IV, Department of Geography, Hiralal Bhakat College, Nalhati, Birbhum

ARTICLE INFO

Keywords:
জীববৈচিত্র্য
Sustainable Development
Earth Summit
এজেন্ডা-21

Article history

Received: 8th July, 2021
Revised: 30th July, 2021
Accepted: 12th August, 2021
© ***Dept. of Geography, Hiralal Bhakat College***

ABSTRACT

গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা এবং তাদের শাখানদি সমূহের পলি সঞ্চয়নের দ্বারা গঠিত গঙ্গা বদ্বীপের প্রায় 10 লক্ষ স্থলভূমি ও জলভাগ নিয়ে সুন্দরবন বনাঞ্চল গড়ে উঠেছে। এই সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্র একটি Aqua-Terrestrial ecosystem, উপকুলীয় ক্ষয়, ডিপ্রেশন, সুনামী, সামুদ্রিক ঝড় ও সাইক্লোন এখানকার ম্যানগ্রোভ বানাভুমিকে শেষ করে দিচ্ছে। মৃত্তিকা ও জলের লবনতার পরিবর্তন, নদীপার ভাঙ্গন এখানকার নিয়মিত সমস্যা , তাই এখানকার বাস্তুতন্ত্র কে ভঙ্গুর বাস্তুতন্ত্র বলা হয়।"Sustainable Development" হল ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কোনোরকম ক্ষতি না করে বর্তমানে সম্পদ ভোগ করা। এই উন্নয়নের তিনটি লক্ষ্যে রয়েছে সামাজিক উন্নয়ন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং পরিবেশ উন্নয়ন। সুস্থায়ী উন্নয়ন এর জন্য 17 টি Goal নেওয়া হয় এবং 1992 সালে Rio-De Janeiro তে Agenda-21 গৃহীত হয় যেটা সুস্থায়ী উন্নয়ন কে সম্ভবপর করে তুলবে।

ভূমিকা

1950 খ্রিস্টাব্দের পূর্বে পৃথিবীর সমস্ত বস্তুকেই সম্পদ বলে মনে করা হত। 1950 এর পর এই ধারণা পরিবর্তন হয়। ভূগোলে সম্পদ বলতে কোন বস্তু বা পদার্থকে বোঝায় না, কোন বস্তু বা পদার্থের মধ্যে যে কার্যকারিতা ও উপযোগিতা থাকে, তাকে সম্পদ বলে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদানগুলি পৃথিবী সৃষ্টির সময় থেকেই প্রকৃতিতে মজুত থাকলেও মানুষের হস্তক্ষেপ ছাড়া কোন বস্তু সম্পদে পরিণত হয় না। সম্পদ যেহেতু মানুষের চাহিদা পূরণ করে,তাই মানুষ তার নিজের প্রয়োজনে সম্পদ সৃষ্টি করে নেয়। তাই মিচেল বলেছেন – ***" Greatest among human resources is knowledge . "***

জিমারম্যান 1951 সালে 'The World Resource Industries' গ্রন্থে বলেছেন 'সম্পদ হল বস্তুর সেই কাম্য শক্তি যা মানুষের অভাব মোচন করে, চাহিদা মেটায়' অর্থাৎ সম্পদ কোন বস্তু বা পদার্থ নয়, বস্তু বা পদার্থের মধ্যথিত কার্যকরী শক্তি'

সম্পদ:- কোন বস্তুকে আমরা তখনই সম্পদ বলব যখন সেটি মানুষের প্রয়োজন বা অভাব মেটাতে সক্ষম । অর্থাৎ যার মধ্যে অভাব পূরণের ক্ষমতা রয়েছে তাকে আমরা সম্পদ বলবো।

*Corresponding author
E-mail address: sadirulsk2017@gmail.com

সম্পদ সষ্টির উপাদানগুলি:- প্রকৃতি (Nature), মানুষ (Man) ওসংস্কৃতি (Caplet) – এই ত্রিশক্তির সুষম সমষ্টিতে সম্পদ সৃষ্টি।

A) প্রকৃতি: প্রকৃতিই সম্পদ সৃষ্টির মূল উপাদান বা সম্পদ সৃষ্টির ভিত্তি। জিমারম্যানের মতে, "প্রকৃতির সাহায্য , নির্দেশ ও সম্মতি নিয়েই সম্পদ সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে অনুঘটক প্রয়াোজন মানুষ ও সংস্কৃতির।

B) মানুষ: মানুষওসম্পদসৃষ্টিরঅন্যতমউপাদান।মানুষের ভাোগের মাধ্যমেই সম্পদের | সার্থকতা। মানুষই আপন শ্রম ও বুদ্ধি বলে প্রাকৃতিক বস্তুকে সম্পদে পরিণত করে। যেমন | প্রতিকূল পরিবেশ সত্ত্বেও জাইরেতেমানুষেরচেষ্টায়রবার উৎপাদিত হচ্ছে। কিন্তু মনুষ্য সম্পদের অভাবে ব্রাজিলে তা সম্ভব হয়নি।

C) সংস্কৃতি : জিমারম্যানের ভাষায় – " শিক্ষা , পাণ্ডিত্য , অভিজ্ঞতা , ধর্ম , সভ্যতা , বুচি , সহযাোগিতা ও ন্যায়বিচার এগুলিই সংস্কৃতি " । প্রাকৃতিক বস্তুকে মানুষ সংস্কৃতি দ্বারা সম্পদে পরিণত করেছে।

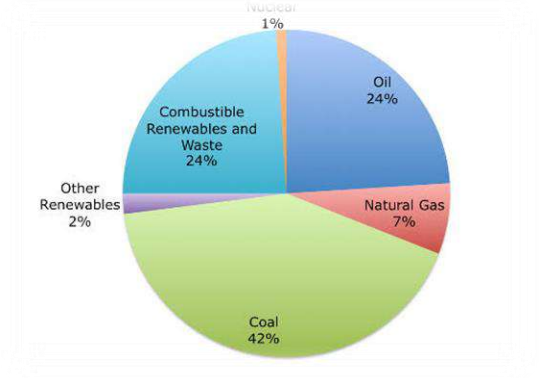

চিত্র ১

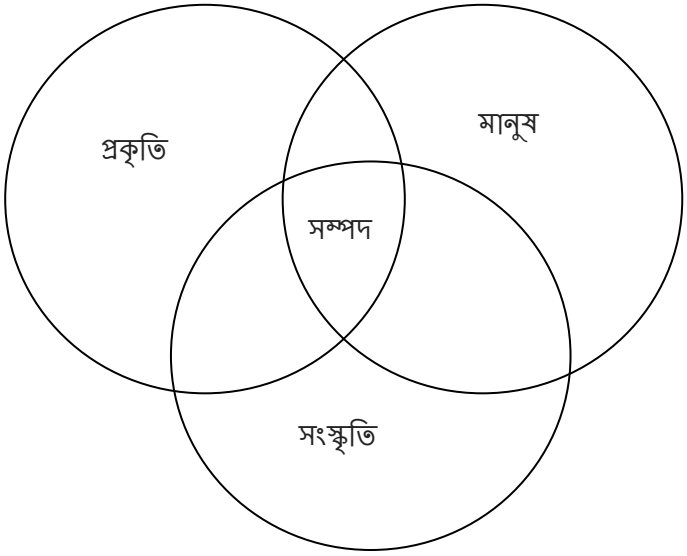

চিত্র ২ : সম্পদ সৃষ্টির উপাদান সমূহ

সম্পদ সৃষ্টির উপাদান অনুসারে, সম্পদ '৩' রকমের৷ যথা:
(১) প্রাকৃতিক সম্পদ
(২) মানবিক সম্পদ
(৩) সাংস্কৃতিক সম্পদ

প্রাকৃতিকসম্পদ: যে সমস্ত সম্পত্তি আমরা প্রকৃতি থেকে সরাসরি পাই, বা গ্রহণ করে থাকি সেটি হলো প্রাকৃতিক সম্পদ (Natural Resource) । দৈনন্দিন জীবনে মানুষ এই প্রাকৃতিক সম্পদের উপর এতটাই নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে যে, তারা ভুলে গেছে এই সম্পদ আর কেবল কয়েকদিন এর অতিথি৷ যাহা কিছুদিন পরেই পড়ে শেষ হয়ে যাবে কারণ তারা অপুনর্ভব সম্পদ৷ যার ফলে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য কিছুই থাকবে না।

মানুষের অ-নিয়ন্ত্রিতভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের উত্তোলন, শিল্প কলকারখানা নির্মাণ প্রভৃতিকারণের জন্য সমস্ত জীবকুল ধ্বংসের মুখে এসে পড়েছে৷ এসব পরিপ্রেক্ষিতে 1968 সালে সুইডেন গভারমেন্ট ইউনাইটেড নেশন (UN) কে প্রতিবেদন পাঠানা বলা হয় যে বিশ্বের দেশগুলিকে একত্রিত করে পরিবেশকে রক্ষা করতে হবে।

সেইপরিপেক্ষিতে, 'The United Nations Conference on the Human Environment was held in Stockholm, Sweden, from June 5–16 in 1972. তারপর 1983 The World Commission on Environment and Development (WCED), 1987 ব্রুটল্যান্ড একটা রিপোর্ট পেশ করেন । যেখানে ***'Sustainable development'*** কথাটি খুব জন প্রিয়তা লাভ করে।

Introduction of 'Sustainable development'

Sustainable কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন 'EVA BALFOUR'। ঠান্ডা লড়াই এর সময় সমস্ত দেশ নিজেকে শক্তিশালী দেশ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করার চেষ্টা, করে যার ফলে নতুন নতুন শিল্প, কলকারখানা, প্রাকৃতিক সম্পদের উত্তোলন, প্রভৃতির প্রতিযোগিতায় লেগে পড়ে। যার ফলস্বরূপ গ্লোবাল ওয়ার্মিং, জীববৈচিত্র্য ধ্বংস ইত্যাদি। এসব পরিপেক্ষিতে স্থিতিশীল উন্নয়ন (Sustainable development) খুব প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে।

সংজ্ঞা (Definition): ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কোনো রকম বাধা সৃষ্টি না করে বর্তমান প্রজন্মের চাহিদা মেটানো হলো (Sustainable development) সুস্থিতিশীল উন্নয়ন।
উন্নয়ন হলো একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। স্থিতিশীল উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় বর্তমানের উন্নয়ন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উন্নয়নকে বাধা প্রদাননা করা এই উন্নয়নের তিনটি লক্ষ্য রয়েছে, যথা:

1) Social Development
2) Economic Development
3) Environmental Development

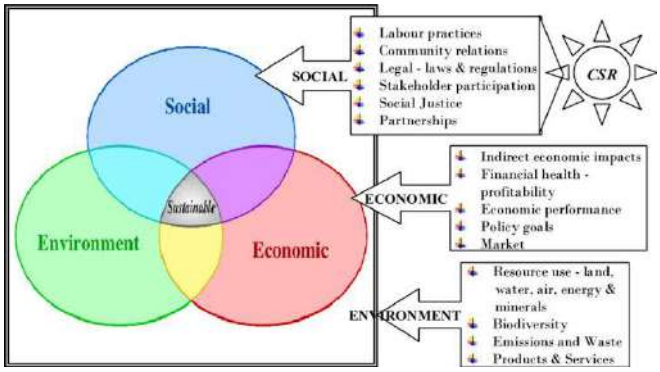

চিত্র ৪

লক্ষ্য (Goal)

1) No Poverty
2) জনস্বাস্থ্য বজায় রাখা
3) উন্নতদেশ এবং উন্নয়নশীল দেশ এর মধ্যে বৈষম্য দূর করা।
4) সংস্কৃতিক বৈচিত্র বজায় রাখা।
5) সামাজিক সংহতিস্থাপন।

উদ্দেশ্য (Purpose)

উৎপাদনব্যবস্থাহবেস্মৃতিশীল।
সম্পদ ভোগ করা হবে স্মৃতিশীল।
প্রাকৃতিক জীব বৈচিত্র রক্ষা করা।
দূষণের, ও গ্লোবাল ওয়ার্মিং পরিমাণ কমানো।
পরিবেশ বান্ধব জিনিস ব্যবহার করা

1990 সালে দুটি আন্তর্জাতিক দলিলে Sustainable Development' সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।
Carrying for the Earth:-

(A) Strategy for Sustainable Living (1991)
(B) Rio-De-Jenero/Earth Summit (1992)

Rio Summit/বসুন্ধরাসম্মেলন:

চিত্র ৫

1889 সালের জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের 44 তম অধিবেশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্রাজিলের রিওডি জেনিরো শহরে অনুষ্ঠিত 'বসুন্ধরা সম্মেলন'। পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যা ও তার সমাধান এর জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এই চুক্তির মূল লক্ষ্য ছিল বায়ুমণ্ডলে গ্রিন হাউজ গ্যাস নির্গমনের হার এমন অবস্থায় স্থিতিশীল রাখা, যাতে জলবায়ুগত মানবিক পরিবেশের জন্য তা বিপত্তি করনাহয়।

তারিখ:-3-14 জুন, 1992
অংশগ্রহণকারী দেশ:- 17

AGENDA-21
এই সম্মেলনে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল তার মধ্যে অন্যতম হলো এজেন্ডা 21। এটিকে সামনে রেখে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল

গৃহীত পদক্ষেপগুলি হল

(১) বায়ুমণ্ডল সুরক্ষা।
(২) অরণ্য বা বনভূমিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা
(৩) জীব-বৈচিত্র্য রক্ষা করা
(৪) দারিদ্রতা দূর করা
(৫) পরিবেশের ক্ষতি না করে উন্নয়ন করা
(৬) গ্রামীণ ও শহরের ফারাক দূর করা

বর্তমানে আমরা উপরে কারণগুলো মানতেই পারছিনা। তাই নানা কারণে পরিবেশকে ক্ষতি করে চলছি। মানুষের এই অমানবিক ব্যবহারের জন্য সমস্ত জীবকুল ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। তাই পৃথিবীকে বাঁচাতে আমাদেরকে এজেন্ডা 21 মানা আবশ্যিক হয়ে পড়েছে।
Rio+5:- বসুন্ধরা সম্মেলন এর পাঁচ বছর পর নিউইয়র্কে, পরিবেশ সম্মেলন রিও+5 নামে পরিচিত

Rio+10,:-1992 বসুন্ধরা সম্মেলন এর 10 বছর পর 2002 সাল এ জোহানেসবার্গে অধিবেশন রিও +10 নামে পরিচিত। এটি মূলত এজেন্ডা 21 কাজের পর্যালোচনার জন্য ডাকা হয়।
Rio+20:- আবার 10 বছরপরঅর্থাৎ 1992 থেকে 20 বছরপরডাকাহয়যারিও+20 নামেপরিচিত।
এরপর 2017 সালে কানাডার মন্ট্রিলে সম্মেলন হয় যারিও 25+ নামে পরিচিত এই সম্মেলনের সিদ্ধান্তকে বলা হয়'। 'The Future We Want'

Sustainable Development এর গুরুত্ব

স্থিতিশীল উন্নয়নের জন্যই প্রাকৃতিক সম্পদের উত্তোলন, ব্যবহার, এর মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখেছে।
এই উন্নয়নের জন্যই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সম্পদের যোগান থাকবে।
এই উন্নয়নের জন্যই ধনী-দরিদ্র, অশিক্ষা বিভিন্ন অভিশাপ থেকে মুক্তি পাচ্ছে।

উপসংহার

আমাদের পৃথিবীকে রক্ষা করতে হলে বিকল্প সম্পদের অর্থাৎ অপ্রচলিত সম্পদের ব্যবহার বাড়াতে হবে যেমন সৌরশক্তি, জলবিদ্যুৎ, বায়ুশক্তি, প্রভৃতি সম্পাদকে কাজে লাগাতে হবে। বর্তমানে সম্পদ সংরক্ষণের আবিষ্কৃত পদ্ধতিগুলি হল—

(i) সম্পদের অতি ব্যবহার কমানা
(ii) সম্পদের অপচয় রোধ করা;
(iii) উন্নত প্রযুক্তি বিদ্যার সাহায্যে খনিজ দ্রব্যের পুনর্ব্যবহার;
(iv) দ্রব্যের রূপান্তর ঘটিয়ে ব্যবহার;
(v) জৈব সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি (জীবজন্তুওমৎস্য);
(vi) উৎপাদন ও ভোগের মধ্যে সমতা;
(vii) সম্পদের কার্যকরী ক্ষমতাকে পরিপূর্ণ রূপে ব্যবহার (জমির শষ্যাবর্তন);
(viii) পুনর্ভব সম্পদের সময় ভিত্তিক ও পরিকল্পনা মাফিক ব্যবহার যেমন – মৎস্যওঅরণ্য);
(ix) অপুনর্ভব বা ক্ষয়িষ্ণু সম্পদগুলোর বিকল্প ব্যবহারও
(x) সর্বোপরি সম্পদ সংরক্ষণে চেতনার সৃষ্টি হল সম্পদ সংরক্ষণের সর্বশ্রেষ্ঠ ফলপ্রসূ পদ্ধতি।

GEO-TALK
A Journal of Man and Environment
Journal available at: http://www.hbcnht.edu.in/college_magazine.php

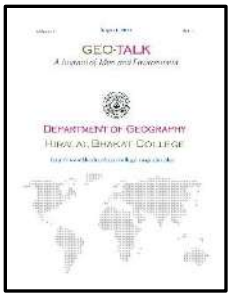

নিস্তব্ধ উপত্যকায় জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ভাবনা – 'সাইলেন্ট ভ্যালি আন্দোলন' ভারতের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশ আন্দোলন

সম্পা প্রামাণিক*

Semester-IV, Department of Geography, Hiralal Bhakat College, Nalhati, Birbhum

ARTICLE INFO

Keywords:
সাইলেন্ট ভ্যালি
KSSP
ক্রান্তীয় বনভূমি
জাতীয় উদ্যান

Article history

Received: 8th July, 2021
Revised: 30th July, 2021
Accepted: 12th August, 2021
© ***Dept. of Geography Hiralal Bhakat College***

ABSTRACT

কেরালা রাজ্যের পালঘাট জেলার কুন্তিপূজা নদীর তীরে অবস্থিত সাইলেন্ট ভ্যালি। 1973 সালে এই নদীর তীরে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা রূপায়ণ করা হলে KSSP সহ সারভারত এই অঞ্চল এর জীবৈচিত্র্য রক্ষার জন্য আন্দোলন করেন এবং শেষপর্যন্ত জলবিদ্যুৎ উৎপাদন বন্ধ করা সম্ভব হয়।

*Corresponding author
E-mail address: sadirulsk2017@gmail.com

Introduction

ভারতবর্ষের পরিবেশ সুরক্ষা মূলক আন্দোলনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হল সাইলেন্ট ভ্যালি আন্দোলন বানীরব উপত্যকা আন্দোলন।

সাইলেন্ট ভ্যালি হল কেরালা রাজ্যের উত্তরাঞ্চলের পালঘাট জেলার অন্তর্ভুক্ত কুন্তিপূজানদীরউপত্যকায়অবস্থিতনীরবনিস্তব্ধ এলাকা। এই উপত্যকার চেহারা অনেকটা ত্রিভুজের মতো। চূড়ান্ত নিস্তব্ধ ও নীরব নিথর এই উপত্যকায় ঝিঁঝিঁপোকার ডাক পর্যন্ত শোনা যায় না, তাই এর নাম সাইলেন্ট ভ্যালি। এই অরণ্যের আয়তন ৮৫৯২ হেক্টর।

সাইলেন্ট ভ্যালি অঞ্চলে প্রস্তাবিত জলবিদ্যুৎ প্রকল্প:-

1973 সালে ভারতীয় পরিকল্পনা কমিশনকে রালারকুন্তিপূজান দীর উপরে জলবিদ্যুৎ তৈরীর প্রকল্প ঘোষণা করে। এই প্রকল্পটিতে 240 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করবেযা শিল্পাঞ্চলে সরবরাহ করা হবে, অনুন্নত পালঘাট ও মালাপুরাম জেলার 10,000 হেক্টর জমিতে জলসেচ সম্ভবপর হবে এবং নির্মাণকার্য চলাকালীন এখান থেকে প্রায় 3000 মানুষের কর্মসংস্থান হবে। তাই মানুষজন প্রাথমিকভাবে প্রকল্পটিকে ভালোভেবেই গ্রহন করেছিল। করেছিল কারণ এটি স্থানীয় মানুষের মধ্যে আশার আলো জাগিয়েছিল।

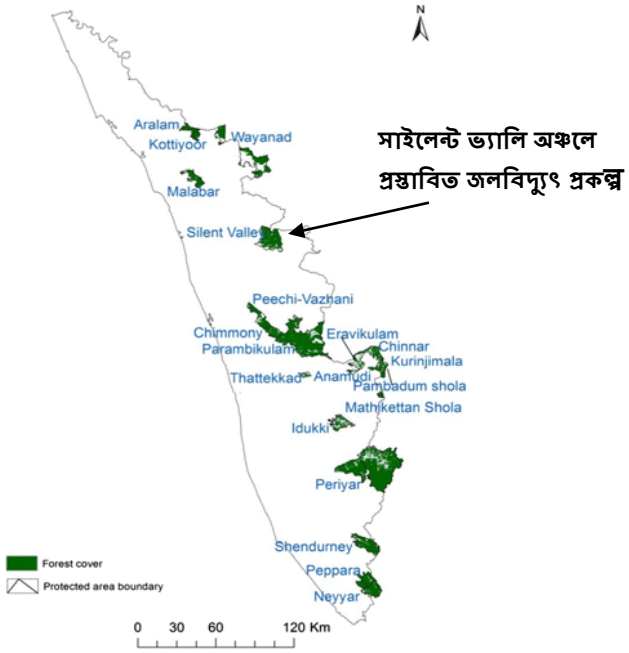

চিত্র ১

প্রকল্পটিতে 240 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করবেযা শিল্পাঞ্চলে সরবরাহ করা হবে, অনুন্নত পালঘাট ও মালাপুরাম জেলার 10,000 হেক্টর জমিতে জলসেচ সম্ভবপর হবে এবং নির্মাণকার্য চলাকালীন এখান থেকে প্রায় 3000 মানুষের কর্মসংস্থান হবে। তাই মানুষজন প্রাথমিকভাবে প্রকল্পটিকে ভালোভেবেই গ্রহন করেছিল। করেছিল কারণ এটি স্থানীয় মানুষের মধ্যে আশার আলো জাগিয়েছিল।

চিত্র ২

প্রকল্প রূপায়নের ফলে জীববৈচিত্র্য হ্রাস

National Committee On Environmental Planning And Coordination – এর উদ্যোগে গঠিত একটি Task Force সাইলেন্ট ভ্যালি অঞ্চলে প্রকল্পটির কারণে সম্ভাব্য পরিবেশগত বা বাস্তুতান্ত্রিক সমস্যারও পরে একটি সম্ভাব্য পরিবেশগত বা বাস্তুতান্ত্রিক সমস্যারও পরে একটি সমীক্ষা করে। সমীক্ষার রিপোর্টে ভয়াবহ পরিণতির কথা উল্লেখ করা হয়। পরিবেশবিদরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েনযে, প্রস্তাবিত জলবিদ্যুৎ প্রকল্পটি নির্মিত হলে, তা ঐ অঞ্চলের একটি প্রাচীনতম ক্রান্তীয় বনাঞ্চল -------- যাকি না জীববৈচিত্রে অতিসমৃদ্ধ------ ধ্বংসের অন্যতম কারণ হয়ে উঠবে। আরও একটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন---- একটি বিপন্ন প্রজাতির বানর---- Lion Tailed Macaque ----ক্রমশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে ঐ বনাঞ্চল থেকে জীববৈচিত্রের ক্ষতি হওয়ার ফলে। প্রস্তাবিত ড্যাম শুধুমাত্র বনাঞ্চল ধ্বংস ও প্রাণী বিলুপ্ত করবে না , সেই সঙ্গে পরিযায়ী মাছ (Migratory Fish) – এর বংশ বিস্তার , তীরবর্তী উদ্ভিদ এবং শাক সবজিও ধ্বংস করবে। ক্রমে রাজ্যের ছাত্র , শিক্ষক এবং বিজ্ঞানীরাও বিষয়টি অনুসন্ধান করেন , বম্বে ন্যাচারাল সোসাইটির মতোও NGO- ও অনুসন্ধান করেন এবং সারা দেশে সাইলেন্ট ভ্যালি সুরক্ষা করার জন্য জনমত গড়ে।

Salient valley is the home to the largest population of Lion-Tailed Macaques. They are among the world's rarest and most threatened primates.

"সাইলেন্ট ভ্যালি" রক্ষার কারন:

কেরলের ' সাইলেন্টভ্যালি ' এলাকাটি চিরহরিৎ অঞ্চলে পরিপূর্ণ এবং পশুপাখি গাছপালা নিয়ে গড়ে ওঠা এক বিরাট জীববৈচিত্রের ধারক ও বাহক। হঠাৎ বিপত্তি ঘটলো এক ফরমানে। উদ্দেশ্য জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন। ফলে , ব্যাপক বৃক্ষ নিধন। ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন ওই অঞ্চলের বাসিন্দারা।

একে রক্ষার কারণ হল

1) সাইলেন্টভ্যালি অঞ্চলটি কেরালার পালঘাট জেলার ৮৯৫০ হেক্টর ব্যাপী বিস্তৃত ক্রান্তীয় বৃষ্টি অরণ্য দ্বারা আবৃত এবং উচ্চতা প্রায় ৩০০০ ফুট। সাইলেন্ট ভ্যালি বৃষ্টি অরণ্য ভার ততথা পৃথিবীর অন্যতম প্রধান জীব বৈচিত্র্যময় অঞ্চল। এখানে এমনকিছু উদ্ভিদ ও প্রানীর

অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় যা পৃথিবীর অন্য কোথাও আর নেই। এমন স্থানে জলবিদ্যুৎ নির্মাণমূলক যে কোনোরকম কার্যাবলী এই অঞ্চলের জীববৈচিত্রের হ্রাস ঘটাবে।

2) জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণের ফলে জল সঞ্চয়ের জন্য নির্মিত বাঁধের ঊর্ধ্বাংশে প্রায় ৮৩০ হেক্টর বনভূমি, তার মধ্যে ৫০০ হেক্টর প্রধান ক্রান্তীয় বৃষ্টি অরণ্য জলমগ্ন হয়ে পড়বে।

৩)প্রস্তাবিত ড্যাম তৈরী হলে কেবলমাত্র 85 হেক্টর ক্রান্তীয় চিরহরিৎ বনভূমিই ধ্বংস হবে না , সঙ্গে সঙ্গে নীলগিরি ছাগল (Nilgiri Tahir) , নীলগিরি বানর (Nilgiri langur) , মালাবার কাঠ বিড়াল প্রভৃতি দুর্লভ বন্য প্রাণীও বিলুপ্ত হয়ে যাবে ।

"Save the silent valley" আন্দোলন

কেরালা শাস্ত্রসাহিত্য পরিষদ (KSSP) সাইলেন্ট ভ্যালি উপত্যকার সুরক্ষার জন্য প্রথম গণআন্দোলন শুরু করে।প্রথম অবস্থায় গ্রামবাসীরা মনে করতেন এই প্রকল্পের তেমন কোন বিরূপ প্রভাবনেই এবং কেরল শাস্ত্রসাহিত্য পরিষদ তাদের মধ্যে ভ্রান্ত ধারনার বিকাশ ঘটাচ্ছে। তাই কেরল শাস্ত্রসাহিত্য পরিষদ এই প্রকল্পটির বিরূপ প্রভাব সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করতে গিয়ে কাঠিন্যের সম্মুখিন হন। তাই তারা জনসাধারণকে বোঝানোর জন্য অন্য পন্থা অবলম্বন করেন। এই পরিষদ মানুষদের বোঝায় তারা এই বাঁধ থেকে যে সুবিধা গুলিপাবেতাতো অন্যভাবেই পাওয়া সম্ভব এবং প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে পরিবেশ ও স্থানীয় মানুষের উপরকী ধরনের প্রভাব পড়বে তারা যথার্থ মূল্যায়ন করেন। আন্দোলনকারীদের প্রতিবাদের মূখ্য বিষয় হল---- **"Save the silent valley"**।

আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তি

সাইলেন্ট ভ্যালি আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেন কেরালা সাহিত্য পরিষদ নামক সংস্থা ,কবি সুগাথা কুমারী ,পক্ষীবিশারদ সেলিম আলি এবং সবুজ বিপ্লবের রূপকার এস স্বামীনাথন। প্রায় ছয়শো- র কাছাকাছি ছাত্রছাত্রী , শিক্ষাবিদ , সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সই সম্বলিত প্রতিবাদ পত্র পাঠানো হয় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী - কে উদ্দেশ্য করে ।

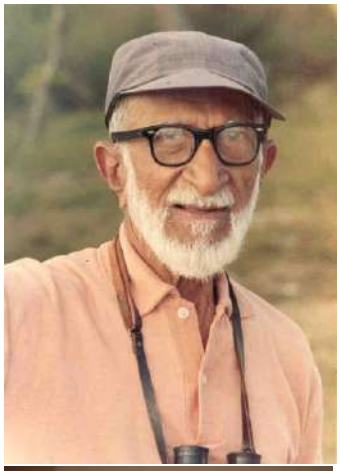

চিত্র ৩

আন্দোলনের ব্যাপ্তি

সাইলেন্ট ভ্যালি আন্দোলনের জনভিত্তি ক্রমশ বিস্তৃতহতে থাকে। নাগরিক সমাজের বিভিন্ন সংগঠন ---- দেশেরও বিদেশের ----- এই আন্দোলনের সমর্থনে এগিয়ে আসে। সাইলেন্ট ভ্যালি আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেন পক্ষীবিশারদ সেলিম আলি এবং সবুজ বিপ্লবের রূপকার এস স্বামীনাথন যদিও , দেশের প্রায় সব রাজনৈতিক দলগুলিই ছিল প্রস্তাবিত প্রকল্পটির পক্ষে এবং রাজ্য সরকারের মনোভাবও ছিল অনড়।

তারা এমনকি ব্যঙ্গের ছলে একথাও বলতে শুরু করেযে এই আন্দোলনের লক্ষ্য হচ্ছে মানুষেরওপরে বানরকে স্থান দেওয়া -------"Monkey Over Man Mission" ।

বি.জি. ভারঘেসনামক একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক তার লেখার মাধ্যমে জনগনকে সচেতনতা করতে থাকেন। প্রকল্পের বিরুদ্ধে জনগনের পদক্ষেপের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে

কাজ করার জন্য সারাদেশে শিক্ষাবিদ , বিজ্ঞানী , পরিবেশবিদদের নিয়ে বিভিন্ন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয়। এমনকি এই প্রকল্পটি বন্ধ করার জন্য কোনো কোনো সংগঠনকে রালা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। এই আন্দোলনটি আন্তর্জাতিক সংস্থা World Wild Life Fund India এবং International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) কর্তৃক সমর্থিত হয়। এভাবে সাইলেন্ট ভ্যালি আন্দোলনটি আন্তর্জাতিক গুরুত্ব পেতে থাকে।

আন্দোলনের তীব্রতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে শেষ পর্যন্ত প্রকল্পটি বন্ধ (1984 সালে)করে দেওয়া হয় এবং 1885 খ্রিস্টাব্দে ভ্যালিকে ঘোষণা করা হয় একটি জাতীয় উদ্যান (National Park) হিসাবে। বর্তমানে বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের মর্যাদা পেয়েছে এই উপত্যকা।

চিত্র ৪

আমাদের উপলব্ধি

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে , সাইলেন্ট ভ্যালি আন্দোলন অরন্য সম্পদকে সুরক্ষিত করার স্বার্থেই কুন্তি নদীর উপর কেরালা সরকার তথা কেরালা রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ কর্তৃক বাঁধ নির্মাণ করে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প গড়ে তোলারপ্রয়াসকে প্রতিহত করে দেয় এবং এভাবেই এই আন্দোলন প্রকৃতি ও পরিবেশের সুস্থতা ও স্বাভাবিকতাকে বজায় রাখা হয় । এই কারণেই ভারতবর্ষের পরিবেশবাদী আন্দোলনের ক্ষেত্রে এই আন্দোলন বিশেষ তাৎপর্যের দাবি রাখে ।

GEO-TALK
A Journal of Man and Environment
Journal available at: http://www.hbcnht.edu.in/college_magazine.php

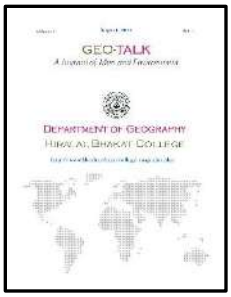

ইউট্রোফিকেশন: জলাশয়ের বন্ধ্যাকরন – জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীদের প্রাণ সংশয়

মনিষা চক্রবর্তী*

Semester-IV, Department of Geography, Hiralal Bhakat College, Nalhati, Birbhum

ARTICLE INFO

Keywords:
ইউট্রিফিকেশন
পুষ্টি মৌল BOD
জল দূষণ।

Article history

Received: 8th July, 2021
Revised: 30th July, 2021
Accepted: 12th August, 2021
© ***Dept. of Geography Hiralal Bhakat College***

ABSTRACT

বিভিন্ন দূষক বিভিন্ন প্রকার দূষণ ঘটাতে সহায়ক। অত্যাধিক পুষ্টি মৌলও যে নানা ভাবে জলজ বাস্তুতন্ত্র কে অস্বাস্থকর পর্যায়ে ঠেলে দেয়, ইউট্রিফিকেশন তার একটি জ্বলন্ত উদহারণ। কি এই ইউট্রিফিকেশন এবং কিভাবে এটাকে প্রতিরাধ করা যায় এটাই মূল আলোচ্য বিষয়।

ভূমিকা

গ্রিক শব্দ 'ইউট্রোফিয়া' যার অর্থপুষ্টিকর হওয়া সেই 'ইউটোফিয়া' শব্দটি থেকেই 'ইউট্রোফিকেশন' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে।

ইউট্রোফিকেশন হলো , জলদূষণ ও জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীদের বেঁচে থাকা দুস্কর হয়ে পড়ার অন্যতম প্রধান কারণ। এটি এমন এক প্রক্রিয়াযার কারণে পরিস্কার নদীজল বা সামুদ্রিক জল উভয় প্রকার জলাশয়ের মধ্যেই অত্যধিকপরিমাণে পুষ্টিমৌল বেড়ে যায় এবং এর ফলস্বরূপ অক্সিজেনের মাত্রা বৃদ্ধি পায় ও জলজ প্রাণীর প্রাণ সংশয় ঘটে।

সংজ্ঞা

বৈজ্ঞানিক ভাষায় ইউট্রোফিকেশন হলো, জলদেহের মধ্যে বায়োমাস জেনারেশন বৃদ্ধির প্রক্রিয়াযেটিউদ্ভিদের পুষ্টি অর্থাৎ নাইট্রেট এবং ফসফেটের বৃদ্ধির ঘটারফলে, প্ল্যাংকটনের সংখ্যা অত্যধিক মাত্রায় বৃদ্ধি করে এবং তা জলের গুনগত মানের ঘাটতি ঘটায়।

বিষয়টি বেছে নেওয়ার কারণ

ইউট্রোফিকেশন পরিবেশের এমন একটি সমস্যা যার প্রভাব অত্যন্ত মারাত্মক এই সমস্যাটি প্রাকৃতিক এবং মনুষ্যসৃষ্ট উভয়ভাবেইসৃষ্টি হয়।এটি মূলত দূষণ জল দূষণ এর মাধ্যমে পরিবেশের প্রাণীদের মধ্যে বাস্তুতন্ত্র ও খাদ্য শৃঙ্খলা কে বিনষ্ট করে দেয় এবং এর প্রভাবে জলজ উদ্ভিদকূলও নষ্ট হয়ে যায় এই বিষয়টিকে তাই আমি পরিবেশ রক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

*Corresponding author
E-mail address: monishachakraborty821@gmail.com

বিষয় হিসেবে মনে করি।এই ইউট্রোফিকেশনসমস্যাটির শেষ করার জন্য , পরিবেশ রক্ষায় প্রত্যেকেরই এই বিষয়টি সম্পর্কে জানা উচিত এবং প্রত্যেককেএ সম্পর্কে সচেতন করার জন্য এই বিষয়টি বিশ্লেষণ করা উচিত বলে আমি মনে করি।ইউট্রোফিকেশন সমস্যার সমাধান সম্পর্কে সকলকে জানানো এবং এ বিষয়টি নির্মূল কিভাবে করা যায় সেই সম্পর্কে সঠিক তথ্য দেওয়ার জন্যই আমি এই বিষয়টিকে বেছে নিয়েছি।

চিত্র ১

অ্যানথ্রোপোজেনিক ইউট্রোফিকেশন– যে ইউট্রোফিকেশন, মূলত কৃষিকার্যের রাসায়নিক সার ধৌতজল, সরাসরি কোনো কারখানা থেকে নিঃসৃত বিষাক্ত ও অত্যধিক পুষ্টিযুক্ত রাসায়নিক পদার্থের দ্বারা অর্থাৎ মনুষ্যসৃষ্ট কারণে ঘটে থাকে তাকে অ্যানথ্রোপোজেনিক ইউট্রোফিকেশন বলে।

প্রাকৃতিক ইউট্রোফিকেশন - যে ইউট্রোফিকেশন, প্রাকৃতিক ঘটনার মাধ্যমেজলাশয় এর অত্যধিক সমৃদ্ধিকে ঘটে, তাকে প্রাকৃতিক ইউট্রোফিকেশন বলে।

পদ্ধতি

I.অত্যধিক পুষ্টি মৌল মাটিতে প্রয়োগ হয়।

II. কিছু পুষ্টি মৌল মাটিতে প্রবেশ করে এবং পরে কিছু মৌল জল নিকাশের সময় অথবা বৃষ্টির জলের ধারা সেচের জলের ধারা মাটির উপর দিয়ে ধৌত হয়ে জলাশয়ে প্রবেশ করে।

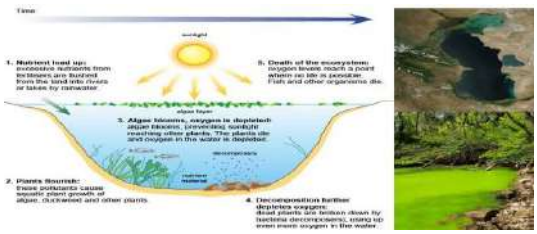

III. অতিরিক্ত পুষ্টির ফলে অ্যালগাল ফুল ফোটে।

IV.অ্যালগাল ফুল অতিরিক্ত ফোটায় তার নীচে থাকা জলজ উদ্ভিদরা সূর্যালোক না পেয়ে তারা মারা যায়।

V. তখন অ্যালগাল ফুল গুলিও মারা গেলে হ্রদের নিচে ডুবে যায়।

VI.ব্যাকটেরিয়া গুলি অবশিষ্ট অক্সিজেন শ্বষণ এর জন্য ব্যবহার করে, অবশেষে তারাও মারা যায়।

VII.ব্যাকটেরিয়া গুলি মারা যাওয়ার পর, তাদের পচনের ফলে অক্সিজেনের ঘাটতির মাত্রা চরমে পৌঁছলে, জলজ প্রাণীদেরও মৃত্যু ঘটে।

সহজে বলতে বোঝায় - জলের মধ্যেকার বাস্তুতন্ত্রে জলের মধ্যে থাকা প্রাণীরা শৈবাল জাতীয় উদ্ভিদ খেয়ে বেঁচে থাকে আর জলের মধ্যে থাকা অক্সিজেন তারা শ্বাস হিসাবে গ্রহণ করে এখন আমরা জানি সবুজ উদ্ভিদ মাত্রই সালোকসংশ্লেষ হয়

এখন বিভিন্ন কারণে, যেমন - জলে সার বা ডিটারজেন্ট মিশলে জলে যে খনিজ গুলো ছিল যেমন ফসফরাস পটাসিয়াম নাইট্রোজেন তাদের মাত্রা বেড়ে যায়

এখন এই শৈবাল বা প্ল্যাঙ্কটন ওই জলের মধ্যে থাকা খনিজ , অক্সিজেন নিয়ে আর সূর্যালোকের সাহায্যে প্রচুর পরিমানে বাড়ে ও সালোকসংশেষ এর মাত্রাও বেড়ে যায়।

ওই শৈবালগুলো জলের উপরে ভেসে ওঠে পুরো জলকে দূষিত করে সাথে বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন জলে মিশতে পারেনা কারণ জলের উপর সবুজ লেয়ার যায় ,যা বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

জলের উপরের ভেসে থাকা সবুজ লেয়ারকে অ্যালগাল ব্লুম বলা হয়ে থাকে। এই অ্যালগাল ব্লুমের মধ্যে থাকা মৃত শৈবাল গুলো ভারী হয়ে জলের নিচে চলে যায় যাকে অ্যালগাল বায়োমাস (Algal Biomass) বলে

এই মৃত শৈবালের স্তূপকে জলের মধ্যে থাকা ব্যাকটেরিয়া পচিয়ে বা decompose করে ফেলে যার জন্য অক্সিজেনের দরকার হয়।

ফলে জলে অক্সিজেনের অভাব হয়। জলের মধ্যে অক্সিজেনের অভাবকে BOD বা বায়োলজিক্যাল অক্সিজেন ডিম্যান্ড ***(Biological Oxygen Demand)*** বলা হয়।

কারণ

I.প্রাকৃতিক কারণ

জলাশয়ের পুষ্টি মৌল হঠাৎ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে, কচুরিপানা, শ্যাওলার প্রাকৃতিক ভাবে অত্যধিক বৃদ্ধি, বিশ্বউষ্ণায়নের ফলেজলের তাপমাত্রার বৃদ্ধিতে জলজ উদ্ভিদও প্রাণীর মৃত্যু ইত্যাদি প্রাকৃতিক কারণেই উট্রোফিকেশন ঘটে থাকে যা জলদূষণ এর অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে পরিচিত।

II. মনুষ্যসৃষ্টকারণ

বিভিন্ন কারখানার বিষাক্ত পদার্থ (বিষাক্ত তরল, ক্ষতিকর অ্যাসিড, প্লাস্টিক ইত্যাদি) সরাসরি কারখানা থেকে নদী বা মহাসাগরে নিক্ষেপণ, কৃষিতে অত্যধিক পরিমাণ রাসায়নিক সার ব্যবহার যার অবশিষ্ট পরিমাণটি জলাশয়েসেচের জল দ্বারা বা বৃষ্টির জল দ্বারা নদী বা পুকুর গুলিতে নিক্ষেপন, ছোট জলাশয়গুলোতে মাছ চাষের জন্য অতিরিক্ত পরিমাণ মাছের খাদ্য নিক্ষেপণ ইত্যাদি মনুষ্যসৃষ্ট কারণেও ইসমস্ত প্রাণীকূলের বিনাশ ঘটে গিয়ে ইউট্রোফিকেশন ঘটে থাকে।

ইউট্রোফিকশনের হওয়ার পিছনে প্রাকৃতিক ও মনুষ্যঘটিত উভয় কারণগুলোর সম্মিলিত রূপ হলো –

জমির সার ধোয়া জলের মিশ্রণ – জমিতে দেওয়া পটাসিয়াম ,ফসফরাস ঘটিত সার দিলে বন্যার জলের মাধ্যমে বা বিভিন্ন ভাবে তা জলাশয়ের জলে মিশলে ইউট্রোফিকেশন হয়

জলাশয়ে জামাকাপড় ধোয়ার ফলে– জলাশয়ে জামাকাপড় পরিষ্কার করলে সেখান থেকে সাবান ডিটারজেন্ট জলে মেশে যা ইউট্রোফিকেশন এর বড় কারণ।

নর্দমার জল জলাশয়ে মিশলে – নর্দমা বা ড্রেনের জলে বিভিন্ন বস্তু মেশার ফলে প্রচুর পরিমানে nutrients থাকে যা জলে মিশলে ইউট্রোফিকেশন ঘটে।

কারখানার বর্জ্য মেশার ফলে – কারখানার বর্জ্য জলাশয়ে পড়লে সেখানে থাকা minerals জলে মিশে ইউট্রোফিকেশন ঘটায়।

ইউট্রোফিকেশনের প্রভাব বা ফলাফল–

জলের বিষক্রিয়া বৃদ্ধি - কয়েকটি শৈবাল ইউট্রফিক জলের মধ্যে প্রস্ফুটিত হয়েনি উরোটস্কিন এবং হেপাটোস্কিন নামক দুটি বিষ ত্যাগকরে, যেগুলি সামুদ্রিক মাছ বা অন্যান্য জলজ প্রাণীদের মৃত্যুর কারণ হতে পারে, যা সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র ও খাদ্যশৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্যও দায়ী।

মিষ্টি জলের সিস্টেমেপ্রভাব - জলজ বাস্তুতন্ত্রের ভাসমান অ্যালগাল ব্লুম এর ফুল ফোটার

অন্যান্য জলজ উদ্ভিদের অতিরিক্ত বৃদ্ধির ফলে (অ্যালগাল ব্লুম এর ফলে) জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৃত্যু ঘটলে ওই মৃত দেহের জন্য মিষ্টিজলের জলাশয়টি অরুচিকর ও ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে যার ফলে ওই জলাশয়টি বিনষ্ট হয় (চিত্র – 3)।

অ্যালগাল ফুলগুলি মনুষ্য জীবনের জন্য ক্ষতিকারক হয়।

অ্যালগাল ব্লুমের বৃদ্ধির ফলেও ইউট্রফিক জলে অক্সিজেনের ঘাটতি দেখা যায় যার ফলেও ই জলাশয়ে বসবাসকারী প্রাণী ও উদ্ভিদকূলের বিনাশ ঘটে।

চিত্র ৩

ইউট্রোফিকেশন যে জলাশয়ে ঘটে সেই জলাশয়টি অস্বাস্থ্যকর হওয়ায় আশেপাশের পরিবেশও ক্ষতিগ্রস্ত হয়, নানারকম দুর্গন্ধের ফলে আশেপাশের বসতিটি বসবাসের অনুপযোগী ও সেখানে রোগের সৃষ্টি হতে পারে ওই জলাশয়টি থেকে (চিত্র – 4) ।

চিত্র 8

BOD বা বায়োলজিক্যাল অক্সিজেন ডিম্যান্ড বৃদ্ধি – ইউট্রোফিকেশন এর ফলে জলে থাকা ব্যাকটেরিয়া শৈবালের বিয়োজন ঘটে যা অক্সিজেনের অভাব সৃষ্টি করে ফলে বায়োলজিক্যাল অক্সিজেন চাহিদা বৃদ্ধি পায়।

ইউট্রোফিকেশন মূলত নিচে লেখা জায়গাগুলোতে বেশি হয়ে থাকে –

যে জায়গায় জলবদ্ধ অবস্থায় থাকে যেমন- পুকুর, ডোবা, ছোট জলাশয়ে বেশি হয়। কারণ শৈবাল বেশি জমে থাকতে পারে।

যেখানে জল বয়ে চলে যেমন – নদীতে শৈবাল জন্মানোর সম্ভাবনা কম থাকে ফলে এখানেই উট্রোফিকেশন ঘটার সম্ভাবনা কম।

চিত্র ৫

জমির কাছাকাছি থাকা জলাশয়ে ইউট্রোফিকেশন ঘটার সম্ভাবনা বেশি থাকে (চিত্র–5)

যে সব পুকুর বা জলাশয় বেশি ব্যবহার হয় না সেখানেই উট্রোফিকেশন বেশি ঘটে

ইউট্রোফিকেশন ঘটার আরো উপযুক্ত জায়গা হতে পারে কারখানার পাশাপাশি অব্যবহার্য্য জলাশয়

চিত্র ৫

ইউট্রোফিকেশন সমস্যার সমাধান

ইউট্রোফিকেশন সমস্যাটি রোধ করার জন্য জলাশয় গুলি মৃত্তিকা ধৌত জল দ্বারা বা সরাসরি মনুষ্য দ্বারা শিল্প বর্জ্য এর ফসফরাস সমৃদ্ধ পদার্থের আগমন রোধ করে ইউট্রোফিকেশন এর প্রক্রিয়াটিকে রোধ করা সম্ভব।এছাড়াও, কৃষিতে ব্যবহৃত অত্যধিক পুষ্টিযুক্ত সারের অত্যধিক ব্যবহার কমানোর মাধ্যমেও এই প্রক্রিয়াটি রোধ করা সম্ভবপর হয়। তাছাড়াও, শিল্পবর্জ্য গুলি থেকে ফসফরাস সমৃদ্ধ পুষ্টি মৌল গুলিকে নদী বা সমুদ্রের মতো বড় জলাশয় গুলিতে নিক্ষেপের থেকে আটকাতে পারলে ইউট্রোফিকেশন প্রতিরোধ সম্ভব।

উপসংহার

আমার এই বিষয়টির মাধ্যমে আমি চেষ্টা করলাম ইউট্রোফিকেশন সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞান তুলে ধরতে। এই বিষয়টি ব্যাখ্যার মাধ্যমে আমি ইউট্রোফিকেশন সমস্যাটির সমাধান তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি। আমি আশা করছি আমার এই ব্যাখ্যার মাধ্যমে ইউট্রোফিকেশন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি ওএই সমস্যাটির সমাধান পাওয়া সম্ভব।

GEO-TALK
A Journal of Man and Environment
Journal available at: http://www.hbcnht.edu.in/college_magazine.php

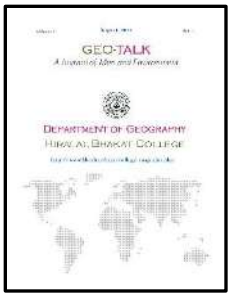

দুর্যোগ এবং বিপর্যয়ের ধারণা

আব্দুল্লাহ হিল কাফি *

Semester-VI, Department of Geography, Hiralal Bhakat College, Nalhati, Birbhum

ARTICLE INFO

Keywords:
দুর্যোগ
বিপর্যয়

ABSTRACT

সৃষ্টির আদি কাল থেকেই আমারা বিভিন্ন প্রাকৃতিক রোষের মুখামুখি হয়েছি। আজও তার ব্যতিক্রম নেই। আদিম যুগে আমরা দুর্যোগ, বিপর্যয় এই শব্দ গুলির সাথে পরিচিত ছিলাম না কিন্তু ঘটনা গুলির সাথে পরিচিত ছিলাম। এই লেখা টির মধ্য দিয়ে আমারা দুর্যোগ এবং বিপর্যয় সম্পর্কে বিস্তারিত জানবো।

Article history

Received: 8th July, 2021
Revised: 30th July, 2021
Accepted: 12th August, 2021
© ***Dept. of Geography Hiralal Bhakat College***

আমরা যদি পৃথিবী সৃষ্টিররহস্যের দিকে তাকাইতাহলে আমরা দেখতে পাবো যে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছিল একটা মহা বিস্ফোরণের মাধ্যমে যাকে আমরা বিগ বাং (Big Bang) বলে ডাকি। এটি একটি মহা মধ্যে সমস্ত কার্যকলাপ ধাপে ধাপে সম্পন্ন হয়েছিল।

যে সৃষ্টিই অর্থাৎ পৃথিবী যদি এত ভয়াল রূপে সৃষ্টি হয় তবে তার মধ্যের সমস্ত উপাদানই তার সহজাত রূপ নিতে পারে। মহাজগতের বেশিরভাগ বস্তু বা উপাদান এর নিজস্ব শক্তি বিদ্যমান যা তার নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য বা মানুষের অপব্যবহারের জন্য তার শক্তির ব্যবহার করে থাকে, যা মানুষের প্রাণহানি ও সম্পত্তিহানি ঘটে।
আদিম মানুষ থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত মানুষ প্রকৃতির সৃষ্ট দুর্যোগ ও বিপর্যয় দেখে আসছে। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় তার ছাপ আমরা এখনও দেখতে পাই।

প্রাচীনকালের মানুষের মধ্যে দুর্যোগ ও বিপর্যয় নিয়ে অনেক ভ্রান্ত মতবাদ আমরা শুনতে পাই, যেমন- ভূমিকম্প নিয়ে গ্রীক জাতির ধারণা হল যে ভুমিকম্পের দেবতা পোসাডাইন রেগে গেলে ত্রিশূল দিয়ে মাটিতে আঘাত করার ফলে ভূমিকম্প হয়, হিন্দু পুরাণ মতে পৃথিবীকে ৮ টি হাতি মাথায় নিয়ে সাপের মাথার উপর দাঁড়িয়ে আছে, যখন এদের কেউ নড়লে ভুমিকম্পের সৃষ্টি হয়। কোন বাক্তি বজ্র বিদ্যুৎের ফলে মৃত্যু হলে বলে যে ঈশ্বরের ক্ষোভের ফলে তার মৃত্যু হল, এছাড়াও বন্যা, খরা, ঝড় ইত্যাদি দেবতার রুষ্টের ফল বলে মানুষ চালিয়ে দেয়। বর্তমানে দাঁড়িয়ে থেকে আমরা এই অহেতুক গালগল্প মেনে নিতে পারি না। এর পেছনে যদি প্রমান না থাকে তবে আমাদের মেনে নেওয়া যাবে না। এখন আমরা বিভিন্ন ভৌগলিকদের দুর্যোগ ও বিপর্যয় সম্বন্ধে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে গবেষণা নিয়ে আলোচনা করবো-

*Corresponding author
E-mail address: hilkafiabdulla@gmail.com

Unique World Dictionary তে Hazard এর বাংলা প্রতিশব্দ দেওয়া আছে বিঘ্ন, বিপদ, বিপত্তি, আকস্মিক ঘটনা, ঝুকি।

দুর্যোগ প্রসঙ্গে Cambridge English Dictionary তে বলা হয়েছে ***"Something that is dangerous and likely to cause damage."*** অর্থাৎ কিছু জিনিস যা মারাত্মক ও সম্ভাব্য ক্ষতির কারণ তাই হল দুর্যোগ।

দুর্যোগপ্রসঙ্গে Oxford Dictionary তে বলা হয়েছে ***"A danger or risk"*** অর্থাৎ বিপদ বা ঝুকি হল দুর্যোগ।

www.dictionary.com এ দুর্যোগকে ***"an avoidable danger or risk, even through often foreseeable"*** রূপে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।

এবার আমরা বিভিন্ন ভৌগলিকদের ও বিভিন্ন সংস্থার দেওয়া সংজ্ঞা জানবো-

জাতিসংঘের সংজ্ঞা অনুযায়ী দুর্যোগ হল প্রকৃতি বা মানুষের দ্বারা সংঘটিত এমন একটা ঘটনা যা চলমান সমাজ জীবনকে গভীরভাবে ব্যাহত করে এবং মানুষ সম্পদ ও পরিবেশের এত ক্ষতি সাধন করে যে সেটি নিজস্ব সম্পদ দ্বারা পূরণ করা সম্ভবপর হয় না।

United Nations Centre for Human Settlement এর সংজ্ঞা অনুযায়ী "মানুষের বসতি অঞ্চলে যখন মানুষের স্বাস্থ্য ও সম্পদ কোন প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার দ্বারা ক্ষতি হলে তাকে দুর্যোগ বলা হয়।

১৯৭৪ সালে মার্কিন ভৌগোলিক গিল্বার্ট. এফ. হোয়াইট তাঁর ***"Natural Hazards, local, national, global"*** গ্রন্থে বলেছেন- দুর্যোগ হল বিভিন্ন সামাজিক, জৈবিক ও প্রকৃতির অন্তঃক্রিয়ার প্রভাব।

১৯৮০ সালে জন হুইটো বলেছেন- দুর্যোগ হল প্রাকৃতিক ভাবে সৃষ্টি হওয়া এমন এক বিপজ্জনক অবস্থা যা জীবন ও সম্পদের ক্ষতি করে।

১৯৮৩ সালে পি. জি. মুর ***"Business of Risk"*** নামে প্রকাশিত রিপোর্টে দুর্যোগকে পরিবেশ, ধনসম্পত্তি, প্রানহানিকারক ঝুঁকি, সম্ভাবনারুপে চিহ্নিত করেছেন।

১৯৯১ সালে কেথ স্মিথবলেছেন প্রাকৃতিক ভাবে সৃষ্টি হওয়া দুর্ঘটনা যা মানব সমাজ ও পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, তাই দুর্যোগ।

২০০১ সালে ভারতীয় ভু অধ্যাপক সভিন্দ্রা সিং বলেছেন "বিপত্তি সাধারণত একটি প্রক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার চরম ঘটনা, যা প্রাকৃতিক ও মানবিক উভয়েই হয়ে থাকে যা একটি স্বতঃস্ফূর্ত, চরম ঘটনা বা বিপদ ঘটায়।"

২০০৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এস আর বসুবলেছেন "দুর্যোগ এমন একটি প্রকৃতি কেন্দ্রিক ভূতাত্ত্বিক, অভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক বিশেষ পরিস্থিতি যার সঙ্গে অল্পবিস্তর ক্ষয়ক্ষতি অন্তর্ভুক্ত।

২০০৭ সালে সুনীল কুমার মুন্সিবলেছেন "আমাদের এই বৃহৎ পরিবেশে স্বাভাবিক অবস্থা থেকে যখন স্থিতিশীল বা ছোটখাটো বিপদে মানুষের অভিযোজনে বিচ্যুতি ঘটায়। এ জাতীয় বিপদকে সাধারণত দুর্যোগ বলে"।

উপরের সমস্ত সংজ্ঞা থেকে একটা সার্বিক সংজ্ঞায় নিয়ে এলে আমরা দেখতে পাবো যে, দুর্যোগ হল কোন একটি ঘটনায় যখন মানুষের জান ও মাল এর সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত হয় ও তার পূর্বাভাস আগে থেকে জানা যায় তখন তাকে দুর্যোগ **(Hazard)** বলে।

এবার আমরা বিপর্যয় **(Disaster)** এর সংজ্ঞা জানবো-

ইংরেজি disaster শব্দটি ফ্রান্সের desastre শব্দ থেকে এসেছে, কারো কারো মতে প্রাচীন ইতালিয়ান ***disastro*** থেকে, আবার কারো কারো মতে গ্রিক শব্দ ***'dus'*** ইংরেজি ***'bad'*** অর্থবা মন্দ/খারাপ এবং গ্রিক aster ইংরেজি star অর্থ তারা থেকে উদ্ভূত হয়েছে, যার অর্থ মন্দ তারার প্রভাব। এ শব্দটির মূল গ্রিক শব্দ ডিজাস্টার জোতির্বিজ্ঞানীয় ধারণা থেকে এসেছে, যার অর্থ বিপর্যয় বা চরম দুর্দশা।

Unique World Dictionary তে Disaster এর বাংলা প্রতিশব্দ সর্বনাশ, দুর্দৈব, দুর্বিপাক, আকস্মিক ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অনর্থপাত হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

কেম্ব্রিজ অভিধানে বিপর্যয়কে ***"an event causing great harm, danger or suffering"*** হিসাবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

www.Dictionary.com এ বিপর্যয় কে ***"a calamitous event, especially one occurring suddenly and causing great loss of life,"*** বলা হয়েছে। অর্থাৎ বিপর্যয় একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা যা হটাৎ করে ঘটে এবং প্রাণহানির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

২০০২ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাতাদের ***World Disaster Report*** এ বিপর্যয়কে একটা সংজ্ঞা দিয়েছেন তা হল " বিপর্যয় এমন একটি ঘটনা যা দুর্ভোগের স্তর সৃষ্টি করে ও সম্প্রদায়গত নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাকে ব্যহত করে জীবনযাত্রার সাধারণ পরিস্থিতিকে বিপর্যস্ত করে তোলে"।

জাতি সংঘ **Disaster** এর সংজ্ঞায় বলেছেন-

"একটি সম্প্রদায় বা সমাজের ক্রিয়াকলাপের মারাত্মক বাধাগুলি যখন ব্যাপক মানবিক, বৈষয়িক, অর্থনীতির অদম্য ক্ষয় হয় যা ক্ষতি গ্রস্থ সম্প্রদায় বা সমাজ পেরে ওঠার ক্ষমতা ছাড়িয়ে যায়"।

১৯৯৫ সালে ক্রেপ বিপর্যয়কে অনিয়মতান্ত্রিক "Nonroutine" হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

১৯৯৭ সালে **S. Mayhew** তাঁর **'A Dictionary of Geography'** গ্রন্থে বিপর্যয় সম্পর্কে বলেছেন ***"It is an unexpected treat to humans and/or their property".***

২০০১ সালে Savindra Singh বলেছেন বিপর্যয় আকস্মিকভাবে সৃষ্ট একটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা, যার চরম প্রভাব মানুষ ছাড়াও উদ্ভিদ ও প্রাণীদের উপর পড়ে।

২০১০ সালে Hallegatte ও Przyluski বিপর্যয়কে অর্থনৈতিক দিক থেকে দেখেছেন। তারা বিপর্যয়ের সংজ্ঞায় বলেছেন "প্রাকৃতিক ঘটনা হিসাবে যা সম্পদ, উত্পাদনের উপাদান, ফলন, কর্মসংস্থান বা ভোগের উপর উল্লেখযোগ্য নেতিবাচক প্রভাব সহ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কার্যকারিতা সম্পর্কে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে"।

সার্বিক সংজ্ঞায় দেখলে আমরা একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি সেটি হল যখন সেই দুর্যোগ মানুষের মাঝে হঠাৎ সংঘটিত হয় ও মানুষের জান ও মালের বাপক ক্ষতি হয় তখন তাকে বিপর্যয় (Disaster) বলে।

এবার আমরা বিভিন্ন দেশের দুর্যোগ ও বিপর্যয়ের মাপকাঠি নিয়ে আলোচনা করলে দেখতে পাবো যে প্রতিটি দেশের আলাদা আলাদা মানদণ্ড আছে।

2001 সালে WHO এর World Disaster Report এ বলা হয়েছে যে- যখন কমপক্ষে ১০ জনের বেশি মানুষ নিহত ও ১০০ জনের বেশি মানুষ আহত হয়, পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে আন্তর্জাতিক সহয়তার প্রয়োজন ও সরকার আপতকালীন ঘোষণা করলে তাকে বিপর্যয় হিসাবে চিহ্নিত করতে হবে। যেমন সাম্প্রতিক কালে করোনায় সরকারের সাহায্য ও আপদকালিন ঘোষণা করায় এটি একটি বিপর্যয়।

জাতিসংঘ বিপর্যয়কে চিহ্নিত করার জন্য যে মানদণ্ড দিয়েছে সেটি হল- ১০০ জনের বেশি মানুষের মৃত্যু আক্রান্ত হলে এবং কমপক্ষে ১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্ষতি হলে তাকে বিপর্যয় বলা চলে।

মার্কিন যুক্তরাস্ট্রের মানদণ্ড হল- যখন ১০০ জনের বেশি মানুষ আহত ও নিহত হবে এবং ১০ লক্ষের বেশি ডলারের সম্পত্তি বিনষ্ট হলে তাকে বিপর্যয় বলতে হবে। যেমন আমেরিকার টর্নেডো ঝড়ে অনেক মানুষ আহত ও নিহত হয় এবং প্রচুর সম্পত্তির বিনষ্ট হয়।

বেলজিয়ামের নিয়ম অনুযায়ী ১০০ জনের বেশি মানুষের মৃত্যু, মোট জনসংখার ১০০ জনের বেশি আক্রান্ত ও মোট জাতীয় উৎপাদনের ১% এর বেশি সম্পত্তি ক্ষতি হলে বিপর্যয় হবে।

তাহলে বোঝা গেল যে দুর্যোগ ও বিপর্যয় এক নয়। সমস্ত বিপর্যয় দুর্যোগ কিন্তু সমস্ত দুর্যোগ বিপর্যয় নয়। কারণ উপরের দেওয়া মানদণ্ডের ভিত্তিতে যদি না মিল খায় বা জান ও মালের ব্যাপক ক্ষতি না হলে সেটাকে বিপর্যয় বলা যাবে না। প্রকৃতপক্ষে দুর্যোগ ও বিপর্যয় হল মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। কম ক্ষয়ক্ষতি হলে তা দুর্যোগ ও বেশি ক্ষয়ক্ষতি হলে তা বিপর্যয়। ঠিক আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের মতো, বের হলে লাভা আর ভূগর্ভে জমে থাকলে ম্যাগমা বলে ডাকি।

উদাহরণস্বরূপ: কল্পনা করুন আপনি মরুভূমিতে আছেন এবং ভূমিকম্প ঘটল। এখন ভূমিকম্প একটি বিপদ। যেহেতু খোলা মরুভূমিতে এটি আপনার ক্ষতি করে না। আপনার জীবনের জন্য কোনও হুমকি নেই। সুতরাং এটি বিপর্যয়ে পরিণত হয় না। এটি একটি বিপদ হিসাবে রয়ে গেছে। এখন একটি শহরে ভূমিকম্পের কল্পনা করুন। সেখানে ঘরবাড়ি ধসে পড়ে মানুষ মারা যায় বা আহত হয়, স্বাভাবিক জীবন ব্যাহত হয়। এটি একটি দুর্যোগ পরিস্থিতি।

Annual Disaster Statistical Review ২০১৩ সালে এক রিপোর্ট পেশ করে; তাতে দেখা গেছে প্রধান ৫ টি অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি ঘন ঘন বিপর্যয় দেখা যায়, সেই অঞ্চল গুলি হল- চিন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জ ও ভারত।

Geological Distribution of Disaster ২০১৩ এর প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী সবচেয়ে বেশি বিপর্যয় দেখা দেয় এশিয়া মহাদেশে (৪০.০৭%), আমেরিকা (২২.০২%), ইউরোপ মহাদেশে (১৮.০৩%) আফ্রিকা(১৫.০৭%) ও ওসিয়ানিয়া মহাদেশে (০৩.০১%)।

একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে সমগ্র দুর্যোগের প্রায় ৭৩% প্রাকৃতিক ও ১৪% মানুষের তৈরি। মানুষের তৈরি বিপদের প্রায় ৮৩% হল সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ এবং বাকি অন্যান্য দুর্যোগ সংগঠিত হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগের ও বিপর্যয়ের মধ্যে উদাহরণ হল বন্যা, ভূমিকম্প, ঝড় ইতাদি এবং সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ এর মধ্যে ৯/১১ এর হামলা (September 11th, 2001), ভারতের মুম্বাই শহরের ২৬/১১ এর হামলা (November 26th 2008) সহ নিউজিল্যান্ড এর ক্রাইস্টচার্চ মসজিদ হামলা (March 15th, 2019) হিসাবে উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

একটি রিপোর্ট দেখা গেছে মহাবিশ্বে প্রতি বছরএক লক্ষের বেশি বজ্র বিদ্যুৎ, এক হাজারের বেশি বন্যা, একশোরও বেশি ভূমিধ্বস ও ভূমিকম্প এবং অনেক ঘূর্ণি ঝড় ও আগ্নেয়গিরির উদগীরন হয়।

উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে বিংশ শতকে ৩০ টিরও বেশি বড় বড় বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল। তার মধ্যে ১৭ টি ভূমিকম্প, ১০ টি ঘূর্ণি ঝড়, ২ টি বন্যা ও একটি আগ্নেয়গিরি উদগীরন হয়েছিল।

দুর্যোগ দুই প্রকার। যথা- ১) প্রাকৃতিক ও ২) মানবিক/ মনুষ্যসৃষ্ট

প্রাকৃতিক দুর্যোগ আবার চার ভাগে ভাগ করে; যথা-

১। ভূতাত্ত্বিক দুর্যোগ (ভূমিকম্প, অগ্নুৎপাত, ভূমিধ্বস, নদীভাঙ্গন ইত্যাদি)।

২। আবহাওয়াগত দুর্যোগ (ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরা ইত্যাদি)।

৩। পরিবেশগত দুর্যোগ (পরিবেশ দূষণ, বনচ্ছেদ, মরুকরণ, পোকার আক্রমণ ইত্যাদি)।

৪। মহামারি (মালেরিয়া, কলেরা, করোনা, ইত্যাদি)।

মনুষ্য সৃষ্ট দুর্যোগ হল মানুষের দ্বারা সৃষ্ট বিপর্যয়, যা মানুষের ভুল বা ইচ্ছাকৃত ভাবে সৃষ্ট বিপর্যয়। যেমন ভুপাল গাস দুর্ঘটনা, সন্ত্রাসবাদিতা, জমিতে কীটনাশক প্রয়োগ, বনচ্ছেদনের ফলে সৃষ্ট খরা, বিদ্রোহ করা, হিংসামূলক কর্মকাণ্ড ও অবৈধ ক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট দুর্যোগ বা বিপর্যয়।

সমস্ত দুর্যোগ বা বিপর্যয় যে মানুষের জন্য ক্ষতিকারক তা কিন্তু নয়। বন্যার ফলে মানুষের অনেক ক্ষতি হয় ঠিকই কিন্তু অপরদিকে দেখলে এতেও অনেক উপকার আছে। যেমন বন্যার ফলে মাটির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। বজ্রপাতের ফলে মাটিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাই ইত্যাদি।

ক্ষতির পরিমান নির্ধারণ করে মানুষের জন ঘনত্বের প্রতি।কোন অঞ্চলের জনসংখা যত বেশি হবে তত বেশি মানুষের আক্রান্ত হওয়ার ও সম্পত্তির বিনাশের সম্ভাবনা বেশি হবে। যেমন পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিপর্যয় হয় চিনে। তাই সেখানকার জন বসতি বেশি থাকায় তাদের প্রাণহানির ও সম্পত্তির ঝুঁকিও অনেক বেশি।

তাই আমাদেরকে প্রকৃতির হাত থেকে বাঁচতে হলে অবশ্যই সচেতন হতে হবে। একজন সচেতন নাগরিক হতে হবে। এ বিষয়ে সরকারের ভূমিকা সবথেকে বেশি থাকবে ও সরকারকে সাহায্য করার দায়িত্ব আমাদের সকলের। প্রকৃতির বিভৎসতা থেকে আমরা কখনই সম্পূর্ণ রক্ষা পাইনি তবে প্রতিহত করতে পেরেছি। বর্তমানে আমাদেরকে বিভিন্ন সেমিনার, বক্তব্য ও নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তি দিয়ে সাধারণ মানুষকে দুর্যোগ ও বিপর্যয় নিয়ে আলোচনা করতে হবে এবং সেই সঙ্গে ভবিষ্যতে যাতে আর এত বিপর্যয় না দেখতে হয় তার জন্য পরিকল্পনা অনুযায়ী এখন থেকেই কাজে নেমে পড়তে হবে। নাহলে মানুষের লাগামছাড়া আচরণের জন্য ভবিষ্যৎ প্রজন্ম পৃথিবীর অপরূপ সৌন্দর্য দেখতে পাবে কি না সন্দেহ !

GEO-TALK
A Journal of Man and Environment
Journal available at: http://www.hbcnht.edu.in/college_magazine.php

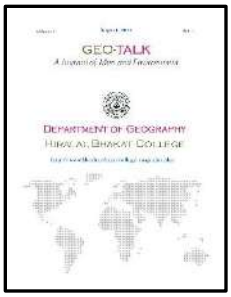

দুর্যোগ পঠন-পাঠনের দৃষ্টিভঙ্গিসমূহ

অঙ্কিতা চক্রবর্তী *

Semester-VI, Department of Geography, Hiralal Bhakat College, Nalhati, Birbhum

ARTICLE INFO

Keywords:
দুর্যোগ
বিপর্যয়
দৃষ্টিভঙ্গি

Article history

Received: 8th July, 2021
Revised: 30th July, 2021
Accepted: 12th August, 2021
© ***Dept. of Geography Hiralal Bhakat College***

ABSTRACT

বস্তুত দুর্যোগ বা বিপর্যয় দুটিই কিন্তু মানব তথা সমগ্র প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্য ক্ষতিকারক। মানব সমাজ | । এবং তার চিন্তা ভাবনা সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তনশীল। তাই একই ঘটনা মানুষ তার পরিবর্তিত জীবন শৈলী এবং চিন্তা ভাবনার দ্বারা বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করে থাকে। দুর্যোগ এবং বিপর্যয় কেউ মানুষ একই ভাবে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করেছে।

Introduction

কোনো অজানা বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানার জন্য মানুষের আগ্রহ বহু প্রাচীন কাল থেকেই। তাই মানুষ নিজের প্রচেষ্টায় পার্থিব বিভিন্ন বিষয় বস্তুকে পুঙ্খানপুঙ্খভাবে অনুধাবন করে থাকে। Hazard কথার অর্থ দুর্যোগ।এই দুর্যোগ মানুষের জীবন এর সাথে জড়িত।এই কারণে দুর্যোগ সম্পর্কে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে মানুষের বেশ কিছু ধারণা বা অনুধাবন বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।মানুষ এর দুর্যোগ সম্পর্কে বিভিন্ন অভজ্ঞতা অর্জন করেন এবং সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে অতীত ও বর্তমান এঘটে যাওয়া বিভিন্ন দুর্যোগ কে অধ্যয়ন করা হয়।এই ভাবেই দুর্যোগ সম্পর্কে অনুধাবনের জন্য দুর্যোগ অধ্যয়নের বিভিন্ন অভিমুখ গড়ে ওঠে।

What Is Hazard Study?

প্রাকৃতিকও মানুষ এর কারণে সৃষ্ট দুর্যোগ গুলির ঝুঁকি, ক্ষতিরপরিমাণ, বিপন্নতা, প্রতিরোধ করার উপায় বিভিন্ন তথের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হয় তাকে বলে Hazard study বলে।
অন্য ভাবে আমরা বলি যে Hazard study বাদুর্যোগ অধ্যয়ন বলতে আমরা বুঝি যে এটি

*Corresponding author
E-mail address: titli5495@gmail.com

এমন একটি প্রক্রিয়া যার সাহায্যে আমরা দুর্যোগ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান অর্জন করতে পারি।

Background

প্রাচীন যুগ এ মানুষ মনে করতেন যে এই সব প্রাকিতিক দুর্যোগ এবং দুর্ঘটনা গুলি দৈব বা ঈশ্বর সৃষ্ট। কিন্তু ধীরে ধীরে সময় এর পরিসর এ যত মানুষ এর জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশ ঘটলো যত মানুষ প্রযুক্তি উন্নতি ঘটলো তখন থেকেই দুর্যোগ সম্পর্কে নতুন নতুন ভাবনাচিন্তা , নতুন নতুন মতাদর্শ খুব সহজ এ সৃষ্টি হতে শুরু করলো। যদিও দুর্যোগ অধ্যয়নের প্রাথমিক সূত্রপাত অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে হলেও আধুনিক গবেষণামূলক স্তরে দুর্যোগ অধ্যয়নের প্রকিত প্রচেষ্টাগত সূচনা ঘটে বিংশ শতাব্দীতে।

১. ১৯৩০ সালের পর সারা পৃথিবীজুড়ে দুর্ভিক্ষ একাধিক মহামারী এই সমস্ত দুর্যোগ গুলি পশ্চিম এর অধিকাংশ উন্নত দেশগুলো দুর্যোগ অধ্যয়ন সচেষ্ট করে আনে। এই সময়কার দুর্যোগ অধ্যয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রেছিল মানুষ এর উপলব্ধি নির্ভর।

২.. ১৯৫০এর দশকে যে সমস্ত উন্নত দেশগুলি যেমন, জার্মানি, ফ্রান্স, USA, কানাডা ইত্যাদি বিভিন্ন দেশ দুর্যোগ গবেষণা এবং একাধিক দুর্যোগ অধ্যয়ন কেন্দ্র গড়ে ওঠে। এই অধ্যয়ন কেন্দ্রগুলিতে বিভিন্ন দুর্যোগ গুলি নিয়ে আলোচনা হতো এবং সেগুলি বিজ্ঞানসম্মত কারণ জানার চেষ্টা হতো।

৩. ১৯৭০এর দশকে উন্নয়নশীল বিভিন্ন দেশ যেমন, ভারত, পাকিস্থান, বাংলাদেশ ইত্যাদি দেশগুলি দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি কিছুটা হলেও কমানোর জন্য প্রযুক্তিগত এবং অর্থনৈতিক দুর্বলতাগুলো কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করতে থাকে।

Approch to Hazard Study

দুর্যোগ হচ্ছে প্রাকৃতিক অথবা মানব সৃষ্ট ক্ষতিকর দুর্ঘটনা বিশেষ। এর ফল এ বাহ্যিকভাবে ক্ষতিসাধন, জীবনহানি কিংবা পরিবেশগত ব্যাপক পরিবর্তন দেখা দেয়। দুর্যোগ বিভিন্নভাবে ওবিভিন্ন ধরনের হতে পারে। তবে অধিকাংশ দুর্যোগ প্রাকিতিক তাণ্ডবলীলা গঠিত হয়। ভূমিকম্প, ঝড়, বন্যা, অগ্নিকাণ্ড, বিস্ফোরণ, ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের মাধ্যমে সংঘটিত হতে পারে। মানুষের জীবন হানি সহ সম্পত্তিঘর বাড়ি নষ্ট,জমির ফসল নষ্ট হবার ফল এব্যাক্তির অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনধারা ওপরে মারাত্বকপ্রভাব পরে। দুর্যোগ এর ফল এঅনেকসময় মানুষ এর দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পরিবর্তন আসে। মানুষ বিভিন্ন দুর্যোগ এর মুখোমুখি হলে মানুষের বিভিন্ন চিন্তাধারা আসে বিভিন্ন নতুন ধারণার জন্ম দেয়। এর ফলে তৈরী হয় বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির। দুর্যোগ সম্পর্কে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিচে আলোচনা করাহল -----

১.প্রথাগত দৃষ্টিভঙ্গি (Traditional Approach)— সভ্যতা শুরুর প্রথম দিকে মানুষ দুর্যোগ সম্পর্কে কোনো ধারণা না থাকায় তার দুর্যোগ গুলিকে ভয়ের নজরে দেখতো। তারা মনে করতো এই দুর্যোগ হলো দৈব সৃষ্ট। তাইসেই সময় দুর্যোগ সম্পর্কে বিভিন্ন দৃষ্টি ভঙ্গি দৈব সত্তাওপরে ভিত্তিকরে গড়ে ওঠে। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী মানুষ খুব অসহায় ছিল। এই প্রথাগত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নিচে আলোচনা করা হল:

২. **পরিবেশগত নিয়ন্ত্রণবাদীদৃষ্টিভঙ্গি (Environmental Deterministic Approach)** – দুর্যোগ সম্পর্কে প্রচলিত এইপরিবেশগত নিয়ন্ত্রনবাদী দৃষ্টিভঙ্গিঅনেক প্রাচীন ও গুরুত্বপূর্ণ। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ীমানুষ হলো গৌণ আরপ্রকৃতি হলোপ্রধান। মানুষের সমস্ত কাজকর্মের ওপরে প্রকৃতি প্রভাব বিস্তার করে। পৃথিবীতে দুর্যোগ এর প্রধান কারণ হলো প্রকৃতি। মানুষ যতই আধুনিক যন্ত্রপাতি নতুন নতুনধ্যান ধারনাআবিষ্কার করুন না কেনো

প্রাকিতিক ভাবে সৃষ্ট দুর্যোগ আটকাতে পারবে না ।

দার্শনিক প্লেটো, টলেমি, অ্যারিস্টটল প্রমুখেরা পরিবেশগত নিয়ন্ত্রণবাদকেতাদের চিন্তাধারার প্রাথমিক ভীত করেছেন।হান্টিংটন ***'The pulse of Asia'*** গ্রন্থে জলবায়ু নিয়ন্ত্রণবাদ প্রসঙ্গটি কে উপস্থাপন করেন।

বিখ্যাত ভৌগলিক এলেনচার্চিল সেম্পেলতার ***'Influence of Geographical Enviroment'*** গ্রন্থে মানুষের ওপরে প্রকৃতির প্রভাব বিশ্লেষণ করেন।

৩. **সম্ভবনাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি** (**Possibilistic Approach)**-- দুর্যোগ সম্পর্কে প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি মধ্যে অন্যতম একটি দৃষ্টিভঙ্গি হলো এই দৃষ্টিভঙ্গিটি। নিয়ন্ত্রনবাদী দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীত হল এই দৃষ্টিভঙ্গি।এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী মানুষ হলোপ্রধান এবং প্রকৃতি হলো গৌণ।মানুষ এর জীবনযাপন এর ওপরে প্রকৃতি কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারে না মানুষ নিজেই নিজের জীবনযাপন কে নিয়ন্ত্রন করে।প্রকৃতি মানুষ এর সামনে বিভিন্ন সম্ভব তুলে ধরে সেই সম্ভাবনাকে মানুষ কাজে লাগাই।

৪. **আচরণ বাদী দৃষ্টিভঙ্গি (Behavioural Approach)** —বিজ্ঞানভিত্তিক দর্শনের মাধ্যমে গড়ে ওঠা একটি অন্য তম দৃষ্টিভঙ্গি হলো আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি।আচরণ নির্ভরকরে তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশের অনুভূতির মাধ্যমে।উইলিয়াম কিক পরিবেশের ওপরে মানুষ এর আচরণগত প্রভাব বিশ্লেষণ করে।এই ভাবেই দৈনন্দিন জীবনে মানুষ বিভিন্ন দুর্যোগ এর হাত থেকে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস করার চেষ্টা করে।

৫. **আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি (Modern Approach)** --- একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি হলো আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি।দুর্যোগ সম্পর্কে যে দৃষ্টিভঙ্গি প্রচলিত আছে সেগুলি থাকে বেরিয়ে এসে একটি স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি হল আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি।কোনো স্থানে দুর্যোগ ঘটার আগে সেখানে কি পরিকল্পনা নেওয়া উচিত,কি কি ধরনের প্রশিক্ষণ নেওয়াউচিত আবার দুর্যোগ ঘটার সময় কি কি ব্যাবস্থা নেওয়া দরকার কি ভাবে প্রাণ বাঁচানো উচিত, দুর্যোগ শেষ এ কি ভাবে পুনর্গঠন, ত্রাণব্যাবস্থা কাজ করবে তার তারপর্য এর দৃষ্টিভঙ্গিতে পাওয়া যায়।দুর্যোগের ধ্যান ধারণা কিছু নতুন দৃষ্টান্ত জন্ম দেয়। যেগুলি নিচে আলোচনা করা হলো-----

৬. **স্থিথিসিল দৃষ্টিভঙ্গি (Sustainable Approach)** --- এই দৃষ্টিভঙ্গি পরিবেশ ও মানুষের বিভিন্ন কাজকর্মের মধ্যে যে সম্পর্ক তার ওপরে জোর দেন।মানুষের জীবযাত্রার মানের ওপরে ভিত্তি করে দুর্যোগ ওঝুঁকি নিরসনের জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাহায্য নিয়েছে এখানে এই দৃষ্টিভঙ্গিটি গুরুত্ব পূর্ণ হয়ে ওঠে।জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে এই ধরনের স্থিতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি মানুষকে অধিকাংশ দুর্যোগ এর সঙ্গে অভিযোজিত হতে শিখিয়েছে।এর ফলে দুর্যোগে প্রাণহানি কিংবা আর্থসামাজিক ক্ষতি আগের তুলনায় কম।

৭. **প্রযোগিক দৃষ্টিভঙ্গী (Applied Approach)** --- এটি একটি সাময়িক দৃষ্টিভঙ্গি।মানুষ তার অভিজ্ঞ ও গবেষণা দ্বারা ভবিষ্যৎ এযে সম্ভাব্য ইঙ্গিত পেয়েছে সেগুলি ত্রুটিমুক্ত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রয়োগযোগ্য দৃষ্টিভঙ্গিতে উপনীত হয়।দুর্যোগ প্রায়োগিক দৃষ্টিভঙ্গীতে সার্বিক উন্নয়ন ঝুঁকি নিরসন ইত্যাদি মাধ্যমে মানুষ প্রতিটি দুর্যোগ সম্পর্কে সচেতন।

৮. **Interactive Approach**—যখন কোনো Hazard Analysishকরার জন্য তার সমাধানের পথ খুঁজে বার করার জন্য যখন আমরা সেই দুর্যোগ প্রবন এলাকায় গিয়ে সেখানকার মানুষের সেই দুর্যোগের অভিজ্ঞটা রয়েছে সেই অভিজ্ঞতাকে আমরা তথ্য হিসাবে নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করি এবং একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়।যখন আমরা সেই দুর্যোগ

প্রবন এলাকায় প্রত্যক্ষ ভাবে থেকে সেখানথাকে তথ্য সংগ্রহ করে শেষ এপৌঁছানো **Interactive approach** বলে

৯. **Diteractive Approach –**যখনআমরা কোনো দুর্যোগকে analkorar করার জন্য প্রথম সেই দুর্যোগ প্রবন এলাকায় না গিয়ে বাড়িতে বসে একটা মডেলতৈরীকরা হয় দুর্যোগ প্রতিরোধব্যবস্থার জন্য তারপর সেই দুর্যোগসম্পর্ক বিস্তারিত জানা হয় তাকে Diteractive Approach বলে।আগে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা।

১০. **Genarally Approach** --- যখনএকটি বা দুটি দুর্যোগ নিয়ে আলোচনা করা হয় সেই দুর্যোগ গুলি মানুষের মনে বা জীবনে প্রভাব ফেলে না বা ফেললে মানুষ তার সাথে অভ্যস্ত হয়ে গেছে।তারা জানে যে কি করে বিপর্যয়কে উপেক্ষা করে জীবনযাত্রা সফল রাখা যায় তাকে Ganarally Approach বলে।

১১. **Systemetiv Approach**—যখন কোনো দুর্যোগ কে আলোচনা করার জন্য সেই দুর্যোগ হবার জন্য প্রত্যেকটি করণেকে ধরে ধরে এবং প্রণালিবধভাবে আলোচনা করা হয় তাকে Systemetic Approach বলে।

১২. **Probabiliti Approach**—যে approach এআমরা প্রাকিতিক দুর্যোগ গুলি কে আগে থাকে **prediction** করতেপারো না বা প্রাকিতিক দুর্যোগ গুলিকে আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে তাকে **Probabiliti Approach** বলে।

১৩. **Determenatic Approach**—যে দৃষ্টিভঙ্গিতে মানুষ দ্বারা তৈরি দুর্যোগ গুলিকে আলোচনা করা হয় তাকে Determenatic Approach বলে।মানুষ যে কাজ গুলো করে তার বর্ণনা।। যারফল a মানুষআগে থেকে জানতে পারে তাদের কাজকর্মের ফল কত টা ভয়ংকর হতে পরে। আবারএই দুর্যোগ গুলি কি ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যেত পারে।আগে থাকে আমতা মানুষ দ্বারা সৃষ্টদুর্যোগ গুলিকে predietion করতে পারি।যেমন,যুদ্ধ।

উপরোক্ত এই সমস্ত Approach বা দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমরা Hazard Study সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পেতে পারি ওদুর্যোগ সম্পর্কে আমাদের ধ্যান ধারণা অনেক টা বেড়েযায় যা আমাদের দুর্যোগ প্রতিরোধ করতে,ঝুঁকি সম্ভবনা কমাতে সাহায্য করে।প্রাকিতিক ভাবে সৃষ্ট দুর্যোগ আমরা কখনো আটকাতে পারবো না কিন্তু সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা আমরা সেই দুর্যোগ থেকে আমরা উদ্ধার পেতে পারি।

GEO-TALK
A Journal of Man and Environment
Journal available at: http://www.hbcnht.edu.in/college_magazine.php

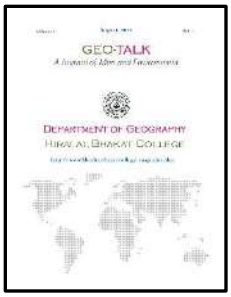

ভূমিকম্পের ফলাফল

তুঁই মণ্ডল*

Semester-VI, Department of Geography, Hiralal Bhakat College, Nalhati, Birbhum

ARTICLE INFO

Keywords:
দুর্যোগ
বিপর্যয়
দৃষ্টিভঙ্গি

Article history

Received: 8th July, 2021
Revised: 30th July, 2021
Accepted: 12th August, 2021
© ***Dept. of Geography Hiralal Bhakat College***

ABSTRACT

ভূমিকম্প সুপ্রাচীন কাল থেকে ঘটে যাওয়া একটা ভৌগালিক ঘটনা। এই ভৌগালিক ঘটনার ফলাফল সুদুর প্রসারী, যা মানব সমাজ তথা সমগ্র ভৌগোলিক পরিবেশ এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট উপাদান গুলিকে প্রভাবিত করে।

ভূমিকা

"Earthquake" অর্থাৎ "ভূমিকম্প"। ভূমিকম্প কথাটির সাথে আমরা সকলেই পরিচিত। প্রায়ই টিভি বা খবরের কাগজের মধ্যে আমরা কথাটা শুনতে পাই। ভূমিকম্প কি যদি ছোট করে বলা যায় তাহলে বলতে হয় যে, ভূমিকম্প হল যখন ভূত্বক কোন কারনে খানিকক্ষণ সময়ের জন্য কেঁপে ওঠে তখন তাকে আমরা ভূমিকম্প বলি অর্থাৎ ভূমির কম্পন। ভূমিকম্প একটি বিধ্বংসী প্রাকৃতিক দুর্যোগ।আর এর ফলে পরিবেশে ক্ষতিটাও বেশি হয়।কারণ পরিবেশের অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগযেমন- বন্যা, সাইক্লোন এগুলোর আগাম বার্তা আমরা টিভি বা খবরের কাগজের মাধ্যমে পেয়ে থাকি। এর ফলে আমরা সচেতন হয়ে পড়ি আর ক্ষতিটাও কম হয়। কিন্তু ভূমিকম্প তো আর বলে আসে নাহঠাতইহয়েথাকে।তাই আমরা সচেতন হতে পারি না আর ক্ষতিটাও পরিবেশের ওপর বেশি হয়। এবার ভূমিকম্প যদি বেশি মাত্রায় হয়ে থাকে তাহলে পরিবেশে তার প্রভাব জোরদার হয়। ফলে ক্ষতিটাও বেশি হয়।আর কম মাত্রায় হয়ে থাকলে সে রকম কোনো প্রভাব ফেলতে পারে না। ফলে ক্ষতি কম হয়।তীব্রভূমিকম্প পরিবেশে খুব দীর্ঘস্থায়ীপ্রভাব ফেলে। খানিকক্ষণ সময়ের জন্য সংঘটিত হয় ঠিকই কিন্তু তার প্রভাব পরিবেশের উপর দীর্ঘদিন স্থায়ী থেকে যায়। ভূমিকম্পের ফলাফল বা প্রভাব যাই বলি না কেন

*Corresponding author
E-mail address: juinmondal764@gmail.com

মানেটা একই।ভূমিকম্প প্রাকৃতিক কারণে অনেক সময় হয়ে থাকে ঠিকই কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে মনুষ্য সৃষ্ট কারনেও হয়ে হয়েথাকে।এবার প্রভাব বা ফলাফল নিয়ে ছোট্ট আলোচনা যদি করা যায়, তাহলে ভূমিকম্পের ফলে কিছু ঘটনা বলি আমাদের চোখের সামনেই ঘটে থাকে। যেমণ-

(ক) নেতিবাচক প্রভাব

ফাটল এবং ভাঙ্গন

পৃথিবীর বুকে আস্তে আস্তে গড়ে ওঠা ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, স্কুল-কলেজ,অফিস-আদালত, বড় বড় বিল্ডিং, ব্রিজ সবকিছুতেই ভূমিকম্পের ফলে ভাঙ্গন এবং ফাটল দেখা যায়।সবকিছুই যেন তাসের ঘরের মতো সহজেই ভেঙে পড়ে।

এরকম ঘটনা ঘটেছিল 2015 সালের নেপালে একটা শক্তিশালী ভয়াবহ ভূমিকম্পের ফলে। যার রিখটার স্কেলের মাত্রা ছিল 7.৪। এর ফলে প্রচুর বাসগৃহ, স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত, সবকিছু ধ্বংস হয়ে যায় ঠিকই, তার সাথে সাথে কাঠমান্ডুর 9 তলা বাড়ির সমান উঁচু ধারাহারা টাওয়ার টা ভেঙে পড়ে। নেপালের সবচেয়ে সংরক্ষিত প্রাচীন রাজধানী ভক্তপুর শহরের অর্ধেকেরও বেশি বাস ভবন ভেঙে পড়ে। সবকিছু মিলে নেপালের কিছু কিছু জায়গায় ধ্বংসস্তূপ পরিণত হয়। ওখানকার মানুষের জীবনে দুর্দশা নেমে আসে। মানুষ অনাহারে থাকে, আর গৃহহারা হয়।

নদীর গতিপথের পরিবর্তন

এতক্ষণ আমরা যা পড়লাম সেটা আমাদের চোখের সামনে ঘটে থাকে। কিন্তু ভূমিকম্পের ফলে নদীর পরিবর্তনও হয়ে যায়। কিন্তু এটা আমাদের চোখের সামনে ঘটে থাকে না।

1787 সালে আসামে একটা খুব বড় শক্তিশালী ভূমিকম্প হয়। যার মাত্রা ছিল 8.4। ফলে যেখানে ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র তার আশেপাশের ভূমি গুলি উঁচু হয়ে যায়। আসামের একটা বড় নদী ব্রহ্মপুত্র নদীর কথা আমরা সকলেই শুনেছি।ভূমিকম্পের ফলে এই ব্রহ্মপুত্র নদীর তলদেশ উত্থিত হয়ে যাই। আর তার চলার পথ পরিবর্তিত হয়ে যায়। 1787 সালের আগে এটি ময়মনসিংহের উপর দিয়ে আড়াআড়িভাবে বয়ে যেত। কিন্তু 1787 সালের ভূমিকম্পের ফলে এই নদীর তলদেশ উত্থান ঘটে, যার জন্য গতিপথ পরিবর্তন হয়ে গিয়ে যমুনা নদীর সাথে মিশে যায়। এর ফলে যমুনা নদী আকারে বড় হয়ে যায়। আর প্রবল গতিতে বইতে থাকে। এই ভূমিকম্পের পর বহ্মপুত্র নদী যমুনা নদীর নতুন শাখার রূপ নেয়।

সুতরাং, এরকমভাবে ভূমিকম্পের ফলে যে কোন নদীর গতিপথ পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে।

পর্বতের উত্থান

ভূমিকম্পের ফলে নতুন পর্বতের উত্থান ঘটতে পারে। যেমন- হিমালয় পর্বত। ভারতের উত্তর দিকে অবস্থিত আমরা সকলেই জানি। হিমালয় পর্বত সৃষ্টির ক্ষেত্রে ভূমিকম্পের বেশ গুরুত্ব রয়েছে, অর্থাৎ আমাদের ভূত্বক কতগুলি প্লেট বা পাতের সমন্বয়ে গঠিত। এগুলির মধ্যে হিমালয় পর্বতের সৃষ্টিতে ভারতের উপদ্বীপীয় পাত এবং ইউরেশীয় পাতের ভূমিকাটাই বেশি। দুটি পাত একই দিকে সচল হলেও উপদ্বীপীয় পাতটিদক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে বেশি এগিয়ে যাওয়ার ফলে ইউরেশীয় পাতের গায়ে ধাক্কা খায়। এই ভাবে সংঘর্ষের ফলে উপদ্বীপীয় পাতের সম্মুখস্থ পলি রাশিতে ভাঁজ পড়ে হিমালয়ের সৃষ্টি হয়। এরূপ সৃষ্ট পর্বত গুলিকে ভূগোলের ভাষায় ভঙ্গিল পর্বত বলা হয়।

ভূমিধস

ভূমিকম্পের ফলে ভূমিধস হওয়াটা স্বাভাবিক বিষয়। কিন্তু ভূমিধস যে শুধুমাত্র ভূমিকম্পের ফলেই ঘটে থাকে তা নয়। ভূমিধসের পেছনে অনেক কারণ থাকতে পারে। কিন্তু ভূমিকম্পের ফলে ভূমিধস হয়ে থাকে। মৃত্তিকার একটি নিজস্ব ধর্ম আছে, যে মৃত্তিকার প্রত্যেকটি কনা একে অপরের সাথে দৃঢ়ভাবে আটকে

থাকেফলেমাটিজমাটবদ্ধ অবস্থায় থাকে। কিন্তু ভূমিকম্পের ফলে পাহাড়েরমাটি আলগা হয়ে যায়। এবং সহজেই আস্তে আস্তে নিচে ধ্বসে পড়ে। একে আমরা ভূমিধস বলি। এবার এইরূপ ঘটনা যদি রাস্তা বা রেললাইনের ধারে হয়ে থাকে।তবে মাটি ধসে পড়ে রাস্তা বন্ধ করে দেয়। তার ফলে সাময়ীকভাবে পরিবহন ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে পড়ে।

সুনামি

এই কথাটাও আমরা টিভি বা খবরের কাগজে শুনেছি। ভূমিকম্পের ফলে প্রকৃতির বুকে বিধ্বংসী সুনামি সৃষ্টি হতে পারে। সমুদ্র তলদেশের কুড়ি থেকে ত্রিশ কিমিগভীরে ভূমিকম্প হলে তার সমুদ্র তলদেশের মাটি কে নাড়িয়ে দেয়। তেমনি খুব স্বাভাবিকভাবেই তার সাথে জড়িত জল কেউ নাড়িয়ে দেয়।ভূমিকম্প যখন জলে সঞ্চালিত হয় তখন তার ফলেসুনামিরউৎপত্তি হয়। এছাড়া সাধারণত কার্বন চক্রের প্রভাবে ভূ-অভ্যন্তরে টেকটনিক প্লেটের নড়াচড়া হতে থাকে। এভাবে কখনো কোনো একটি প্লেট অপরদিকে অনবরত ধাক্কা দিতে থাকলে। একসময় একটি পাত আরেকটি পাতের উপর উঠে যায় তখন ওই স্থানে ভূত্বক আচমকা উঁচু হয়ে যায়। এভাবে ছোট টিলা থেকে পাহাড় সমান পর্যন্ত উঁচু হয়ে যেতে পারে। সমুদ্র বা কোন বৃহৎ জল ক্ষেত্রের নিচের ভূত্বক এভাবে ফুলে উঠলে তখন ওই জল ক্ষেত্রের জল ও হঠাৎ ফুলে ওঠে এবং সুনামির সৃষ্টি হয়।

ভূমিকম্পের ফলে সৃষ্ট সুনামির উদাহরণ দিতে গেলে একটা খুব বড় আর শক্তিশালী ভূমিকম্পের কথা মাথায় আসে।যেটি সবথেকে প্রাণঘাতী সুনামি নামে পরিচিত। 2004 সালের 26 শে ডিসেম্বর ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা দ্বীপের উপকূলে সমুদ্রগর্ভে সংঘটিত যে সুনামি অবতারণা ঘটায়। যার মাত্রা ছিল রিকটার স্কেলে 9.3 পর্যন্ত। এই বিধ্বংসী ভূমিকম্পের ফলে সুনামির সৃষ্টি হয়েছিলযেটি মারাত্মক রূপ ধারণ করে।আর 18 টি দেশের প্রায় দুই লাখ 30 হাজার মানুষ মারা যায়। এই সুনামির ফলে জলোচ্ছ্বাস 30 মিটার অব্দি উঁচু হয়ে বেলাভূমিতে আছড়ে পড়ে বাড়িঘর ধ্বংস করে মানুষকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

জীবনহানি

প্রচন্ড ভূমিকম্পের ফলে, প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্ষয়ক্ষতি হয় ই।তার সাথে সাথে শহর, নগর, জনপদ প্রভৃতি নিমেষের মধ্যে ধ্বংস হয়ে যায়। মানুষের জীবন, পশুপাখিদের জীবন, এমনকি ধনসম্পত্তির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়।

উদাহরণ হিসেবে আমরা গুজরাটের ভুজ ভূমিকম্পের কথা বলতে পারি, 2001 সালে গুজরাটের ভুজ শহরে এক ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়েছিল। সেখানে ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র ছিল গুজরাট রাজ্যের কচ্ছজেলারভচাও তালুকের চৌবাড়ী গ্রাম থেকে প্রায় 9 কিমি দূরে। অন্তর পাত সংঘর্ষের ফলে এটি সৃষ্টি হয়েছিল।যার রিখটার স্কেল এর মাত্রা ছিল 7.7। এই ভয়াবহ ভূমিকম্পের ফলে ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে ভারত এবং পাকিস্তান মিলে প্রায় কুড়ি হাজার মানুষ প্রাণ হারায়।আর 167000 মানুষ আহত হয়। আর প্রায় 340000 টি ভবন ধ্বংস হয়ে যায়।

এতক্ষণ আমরাযা আলোচনাকরলামতাতে বোঝা যাচ্ছে যে, ভূমিকম্প পরিবেশের ওপর শুধু নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। কিন্তু

ভূমিকম্প পরিবেশের ওপর ইতিবাচক প্রভাবও, ফেলে এটা জেনে সবাই অবাক হবে।

(খ) ইতিবাচক প্রভাব

আমরা আজ যে প্রাকৃতিক ভূপ্রকৃতি দেখছি তা হল সহগ্রাধিক বছর ধরে ঘটে যাওয়া ভূমিকম্পের ফলাফলম ভূমিকম্পের সময় জমি উন্নীত হয়, এবং দোষ দেখা দেয়।

ভূমিকম্পের প্রভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশে অনেক সময় পাহাড়, পর্বত মালা এবং উপকূলীয় টেরেস গুলিও সৃষ্টি হয়ে থাকে। যেমন- ইতালির পশ্চিমা ক্যালাব্রিয়াক্যাপ

ভ্যাটিকানোয় সন্দর উপকূলীয় টেরেস গুলি ও ভূমিকম্পের ক্রিয়া-কলাপ হিসেবে চিহ্নিত। ভূমিকম্পের ফলে ভূগর্ভস্থ জল, তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রবাহ প্রভাবিত হয়।

এছাড়াও, ভূমিকম্প পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষণ করতে সহায়তা করে। ভূমিকম্পের তরঙ্গ এবং ত্রুটিগুলি অধ্যয়ন করে আমরা ভূগর্ভে কি ঘটছে তা কল্পনা করতে পারি।ভূমিকম্পের মাধ্যমে পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ কাঠামো সম্পর্কে জানা যায়।

এছাড়াও, বিজ্ঞানীরা সক্রিয় ত্রুটিগুলিরঅঞ্চল গুলিও অধ্যায়ন করেন। যা দীর্ঘকাল ভূমিকম্পের অভিজ্ঞতা পাইনি। ভূমিকম্পের ব্যবধান নামে পরিচিত এই জায়গাগুলিতে ভবিষ্যতে বড় ধরনের ভূমিকম্পের সর্বাধিক সম্ভাবনা রয়েছে সুতরাং আরো ভবিষ্যদ্বাণী করা যেতে পারে এবং সম্প্রদায়গুলি আরো ভালো প্রস্তুত হতে পারে।

উপরিউক্ত আলোচনা করে দেখা গেল যে, ভূমিকম্প প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং মানুষের জীবন উভয় ক্ষেত্রেই প্রভাব ফেলে। কিন্তু এটুকু জানা গেল যে, ভূমিকম্প পরিবেশের উপর ভালো প্রভাব ফেলে অর্থাৎ প্রাকৃতিক পরিবেশ ভূমিকম্পের দ্বারা কোথাও না কোথাও লাভবান হয়ে থাকে। অনেক সময় ভূমিকম্পের তীব্র প্রভাবে ভূপ্রকৃতি আগের তুলনায় পরিবর্তিত হয়ে অন্য রূপ নেয়। এভাবে বছরের পর বছর ভূমিকম্প এসে মানুষের জীবনে ক্ষতি করে চলে আর মানুষ বেঁচে থাকার জন্য প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে চলে।

GEO-TALK
A Journal of Man and Environment
Journal available at: http://www.hbcnht.edu.in/college_magazine.php

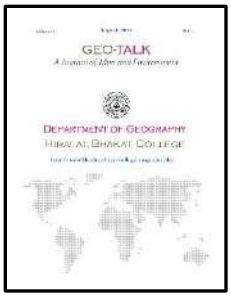

ভূমিকম্পের ব্যবস্থাপনা

কবিরুল ইসলাম*

Semester-VI, Department of Geography, Hiralal Bhakat College, Nalhati, Birbhum

ARTICLE INFO

Keywords:
ভূমিকম্প
পূর্বাভাস
সচেতনতা দুর্যোগ
বিপর্যয়

Article history

Received: 8th July, 2021
Revised: 30th July, 2021
Accepted: 12th August, 2021
© ***Dept. of Geography Hiralal Bhakat College***

ABSTRACT

দুর্যোগ এবং বিপর্যয় এর মাত্রা কে কেউ নিয়ন্ত্রিত করতে পারে না। কিন্তু এর যথাযত ব্যাবস্থাপনা এর থেকে আসন্ন ক্ষতি এর মাত্রা কে অবশ্যয় প্রসমিত পারে। ভূমিকম্প এর প্রাক এবং পরবর্তী কি কি ব্যাবস্থপনা আমাদের আগত ক্ষতি থেকে বাঁচাতে পারে এটাই আলোচ্য বিষয়।

ভূমিকা

ভূমিকম্পের পূর্বাভাস বা প্রেডিকশন খুবই জটিল। আমরা কোন নির্দিষ্ট ভূমিকম্পকে সরাসরি নির্ণয় করতে পারিনা, কিন্তু মাইক্রো সিসমিসিটি গবেষণা, ফোকাস মেকানিজম গবেষণার মাধ্যমে সম্ভাব্য পূর্বাভাস এবং ঝুঁকিপূর্ণ স্থান, হাইসিসমেসিটি,লোসিসমিসিটি নির্ণয় করতে পারি, যা জনসচেতনতা বৃদ্ধিসহ জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি রোদ অত্যন্ত সহায়ক। ভূমিকম্প বিষয়ক দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য সরকারের একটি সুস্পষ্ট কর্মপরিকল্পনা জরুরী প্রয়োজন।

ভূমিকম্পের উৎপত্তি ঠেকানো না গেলেও ভূমিকম্প ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আমরা ভূমিকম্পের প্রভাব অনেকটা কাটিয়ে তুলতে পারি। যেমন-

ভূমিকম্প উপলব্ধি: বাস্তবে আমরা অতীতের বিভিন্ন ভূমিকম্পের অভিজ্ঞতা কে সামনে রেখেই, যেকোন সমস্যার সমাধান মূলক পরিকল্পনা তথা কার্য পদ্ধতি গুলি গ্রহণ করে থাকি। ভূমিকম্পের সঠিক উপলব্ধি মানুষকে এর থেকে নিষ্কৃতি মূলক বিভিন্ন পথ দেখায়। ভূমিকম্পের উপলব্ধিতে যে সমস্ত বিষয়গুলি গুরুত্ব পাই সেগুলি হল

A. ভূমিকম্পের স্থান: ভূমিকম্পের উপলব্ধিতে প্রথমেই আমাদের মনে যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায় তা হল ভূমিকম্পের উৎসস্থল। ভূমিকম্পের উৎসস্থল যত কাছাকাছি হবে তার ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা ও তত বৃদ্ধি পাবে।

B. মাত্রা: ভূমিকম্প উপলব্ধির দ্বিতীয় বিষয়টি হল এর মাত্রা। কোন স্থানে ক্ষয়ক্ষতির একটা প্রাথমিক ধারণা

*Corresponding author
E-mail address: kabirulislam975@gmail.com

ভূমিকম্পের ফলে উৎপন্ন শক্তির মাত্রা ই দিয়ে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোন স্থানে সংগঠিত ভূমিকম্পের এই মাত্রা রিকটার স্কেলে ছয় মাত্রা অতিক্রম করলেই সেখানকার ক্ষয়ক্ষতির চিহ্ন দেখা।

C. ক্ষয়ক্ষতি: ক্ষয়ক্ষতির প্রভাব দ্বারা ও ভূমিকম্পের প্রকৃতি সম্পর্কে যথেষ্ট উপলব্ধি করা সম্ভব।

D. গবেষণা: ভূমিকম্পের ব্যবস্থাপনায় গবেষণা একটি অন্যতম বিষয়। আমরা যখন কোন অঞ্চলকে ভূমিকম্প প্রবণ রূপে চিহ্নিত করি সেখানে বেশ কয়েকটি ধারণা বিশেষ প্রাধান্য পায়। যেমন-অঞ্চলটির ভূ গাঠনিক অবস্থান, সংশ্লিষ্ট পাত বা অগ্ন্যুৎপাতের ক্রিয়া-কলাপ, ভূমিকম্পের পরম্পরা প্রভৃতি।

ভূমিকম্পের পূর্বাভাস

যেকোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের আগাম পূর্বাভাস তার অভিঘাত গুলিকে অনেকটাই প্রতিহার করতে সাহায্য করে। ভূমিকম্পের ব্যবস্থাপনায় এর পূর্বাভাস প্রধান বর্তমানে বিজ্ঞানীদের কাছে সত্যিই একটি বড় চ্যালেঞ্জ। তবে ভূগর্ভে ভূমিকম্পের যাবতীয় উৎপত্তি আমাদের অগোচরে থেকে যায় বলে এই পূর্বাভাসের ক্ষেত্রটি যথেষ্ট জটিল। যদিও বিশেষজ্ঞরা ভূমিকম্প প্রবনতার ভিত্তিতে পৃথিবীতে বেশ কয়েকটি অঞ্চল চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু তা সত্বেও পৃথিবীর কোন স্থানে এবং ঠিক কখন ভূমিকম্প ঘটতে চলেছে তার যথাযথ পূর্বাভাস কি এখনো অধরা রয়ে গেছে। তবে, ভূমিকম্প বিশারদগণ পৃথিবীর এমন কিছু ভূ-অভ্যন্তরে কিংবা বাহ্যিক ঘটনাকে চিহ্নিত করেছেন, সেগুলি আকস্মিক এই বিপদটির স্থানীয় পূর্বাভাস দিতে থাকে।

করণীয়

ভূমিকম্প জনিত দুর্যোগ থেকে জীবন ও সম্পদ রক্ষার প্রয়োজনে সম্ভাব্য ভূমিকম্প মোকাবেলায় সরকারি-বেসরকারি সব প্রতিষ্ঠানকে পদক্ষেপ নেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

জনসচেতনতা বৃদ্ধি।

ভূমিকম্প মোকাবেলায় পূর্ব প্রস্তুতি।

ভূমিকম্প পরবর্তী উদ্ধার, ত্রাণ ও পুনর্গঠন কর্মসূচি ইত্যাদি।

ভূমিকম্পে দালানকোঠার নিচে পড়ে অসংখ্য মানুষের মৃত্যু হয়। সম্ভাব্য ভূমিকম্পের প্রস্তুতি ও ক্ষয়ক্ষতি প্রশমনে জনসচেতনতা বৃদ্ধি একান্ত প্রয়োজন। ভূমিকম্পে জনসাধারণের করণীয় সম্পর্কে যেমন ভূমিকম্পের আগে, ভূমিকম্পের সময় ও পরে কি করা উচিত সে বিষয়ে অবহিত করা। তাছাড়া ভূমিকম্প কি, কেন হয়, ও এর প্রভাব কি,পরিকল্পিতভাবে বাড়ি ঘর নির্মাণ না করলে, প্রয়োজনীয় বিল্ডিং কোড মেনে না চললে কি ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে সে বিষয়ে সচেতন করা।

এবার আলোচনা করব ভূমিকম্পের আগে, পড়ে এবং ভূমিকম্পের সময় সাধারণের করণীয় সম্পর্কে:-

প্রথমে আলোচনা করব ভূমিকম্পের আগে কি কি করা উচিত:

ক.বিদ্যুৎ ও গ্যাস লাইন বন্ধ করার নিয়ম কানুন পরিবারের সবার জেনে রাখা প্রয়োজন।

খ.ঘরের উপরের তাকে ভারী জিনিসপত্র না রাখা।

গ. পরিবারের সব সদস্যের জন্য হেলমেট রাখতে হবে।

ঘ.পরিকল্পিত বাড়িঘর নির্মাণের জন্য বিল্ডিং কোড মেনে চলা, ভবনের উচ্চতা ও লোডের হিসাব অনুযায়ী শক্ত ভিত দেওয়া।

ভূমিকম্প চলাকালীন পর্যায়

যে কোন ভূমিকম্প মানুষের মনে ব্যাপক আতঙ্কের সৃষ্টি করে। তাই ভূমিকম্প চলাকালীন যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত সেগুলি হল-

নিজেকে যতটা সম্ভব ধীর স্থির রাখতে হবে।

আতঙ্ক না ছড়িয়ে মানুষকে আসস্ত করতে হবে।

ভূমিকম্প চলাকালীন দিশেহারা হয়ে ছোটাছুটি করা চলবে না।

ভূমিকম্পের সময় তাড়াহুড়ো না করে খুব তাড়াতাড়ি বাড়ি বা অফিস থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

যদি বাইরে বেরোনো সম্ভব না হয়, তবে বাড়ি বা অফিসের কোন বিম, ক লাম্বা গঠনগত দিক থেকে মজবুত কোন স্থানে গিয়ে দাঁড়াতে হবে।

বারান্দা, জানালা, দরজা, ব্যালকনি, আলমারি, কাঠ কিংবা ধাতব ও কোন ভারী ঝুলন্ত বস্তু থেকে দূরে থাকতে হবে।

বাড়িতে বিছানায় থাকাকালীন বালিশ দিয়ে মাথাটাকে যতটা সম্ভব ঢেকে রাখতে হবে।

টয়লেট বা লিফটে থাকলে, ভূমিকম্পের সময় তাড়াতাড়ি সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

উপরতলায় থাকলে যতক্ষণ ভূমিকম্প হচ্ছে অপেক্ষা করতে হবে।

এছাড়াও নিজের সব সময় আত্মবিশ্বাস ধরে রাখতে হবে।

ভূমিকম্পের পর এর পর্যায়

ক্ষতিগ্রস্ত ভবন থেকে ধীর-স্থির ও শৃংখলাবদ্ধ ভাবে বের হওয়া।
রেডিও ও টেলিভিশন থেকে জরুরী নির্দেশাবলী সোনা এবং সেগুলো মেনে চলা।
বিদ্যুৎ, গ্যাস, টেলিফোনের লাইন কোন সমস্যা হচ্ছে কিনা পরীক্ষা করে নেওয়া।
সরকারি সংস্থাগুলোকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার সহযোগিতা করা।
উদ্ধার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করতে হবে।
আহত মানুষদের দ্রুত নিকটবর্তী হাসপাতালে পৌঁছে দিতে হবে।
দুর্গতদের কাছে খাবার, পানীয় জল, বস্ত্র, ঔষধ পত্র পৌঁছে দিতে হবে।

উপসংহার

শেষে এটাই বলা যায়, ভূমিকম্প একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ, একে থামিয়ে রাখা সম্ভব নয়। সেহেতু ভূমিকম্প পূর্ব প্রস্তুতি ও ক্ষয়ক্ষতি রোধে ভূমিকম্প-পরবর্তী শক্তিশালী এবং কার্যকর প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এই দুর্যোগ মোকাবেলা সম্ভব।

GEO-TALK
A Journal of Man and Environment
Journal available at: http://www.hbcnht.edu.in/college_magazine.php

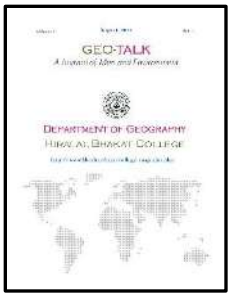

Flood as a Disaster and its Causes

Mou Mal*

Semester-VI, Department of Geography, Hiralal Bhakat College, Nalhati, Birbhum

ARTICLE INFO

Keywords:
বন্যা
কারন
প্রকারভেদ

Article history

Received: 8th July, 2021
Revised: 30th July, 2021
Accepted: 12th August, 2021
© ***Dept. of Geography Hiralal Bhakat College***

ABSTRACT

অনা বৃষ্টির মত অতি বৃষ্টিও একটি আভিসাপ, যা বন্যা রূপে ধেয়ে আসে এবং মুছে দিয়ে যায় মানব সভ্যতার কিছু সৃষ্টি।

ভূমিকা

আবহাওয়াগত খামখেয়ালিপনা মাঝে মধ্যেই মানুষকে যে কয়েকটি চরম বিপদবা বিপন্নতার মুখে ঢেলে দেয়বন্যা তার মধ্যে অন্যতম সাধারণত আদ্র জলবায়ু কেন্দ্রিক নদীমাতৃক অঞ্চলগুলিতে বছরের কিছু নির্দিষ্ট সময়ব্যাপী বন্যা সংগঠন একটি স্বাভাবিক ঘটনা কিন্তু তা সত্বেও কখনো কখনো বন্যা তার স্বাভাবিকত্ব হারিয়ে বেশকিছু প্রতিকূল পরিস্থিতির মাধ্যমে বিপর্যয় অনিবার্য করে তোলে।কোন নদীর জল ধারণ ক্ষমতা যখন থাকেনা অতিরিক্ত জল নদীর ধারে উপচে পড়ে অঞ্চলে বন্যা সংক্রান্ত দুর্যোগ সৃষ্টি হয় । বন্যা শ্রেণীবিভাগ একাধিক দৃষ্টিকোণ থেকে বন্যাকে প্রকৃতি অনুসারে ও প্রভাবিত ক্ষেত্র অনুসারে শ্রেণীবিভাগ করেছেন।

(A) প্রকৃতি অনুসারে শ্রেণীবিভাগ

বৃষ্টি বিধৌত বন্যা: বৃষ্টিপাতের কারণে যখন কোন অঞ্চলে নিচু এলাকা জলমগ্ন হয়ে থাকলে তাকে বৃষ্টি বিধৌতবন্যা বলা হয়।ভারতেরমুম্বাই কলকাতা ইত্যাদিনদীর বেশ কিছু এলাকায় প্রবল বৃষ্টিপাত জনিত কারণে বন্যা কবলিত হয়ে পড়ে।

মৌসুমী বন্যা: মৌসুমী জলবায়ুর দেশগুলিতে জুন থেকে সেপ্টেম্বর এর মধ্যবর্তী সময় কালে টানা বেশ কয়েকদিন একনাগাড়েবৃষ্টিপাতের কারণে স্থানীয় নদী-নালা হদ সহ বিভিন্ন জলাধার থেকে অতিরিক্ত জল উঠছে পরে এ ধরনের বন্যা সংঘটিত হয় ভারত-বাংলাদেশ সহ বেশ কিছু দেশে প্রতিবছর বন্যা হয়

*Corresponding author
E-mail address: moum3036@gmail.com

সামুদ্রিক জলের বন্যা: পৃথিবীর উপকূলবর্তী অঞ্চলের স্থলভূখন্ডগুলি সামুদ্রিকলবনাক্তজলেপ্লাবিত হলে তাকে সামুদ্রিক জলেরবন্যা বলা হয়।এধরনের বন্যার মূল কারণ গুলি হল প্রবল ঘূর্ণিঝড়জনিত জলোচ্ছাস উচ্চ জোয়ারের প্রভাব প্রভৃতি।জাপানে এধরনের বন্যা প্রায়ই দেখা যায়।

B) প্রভাবিত ক্ষেত্র অনুসারে

প্রভাবিত ক্ষেত্রে অনুসারে বন্যা মূলত তিন প্রকার যথা

অন্তর্দেশীয় বন্যা: অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত জনিত জল কিংবা কোন দেশের অভ্যন্তরে থাকা নদীহ্রদঅন্য কোন জলাশয় এর জল উপছে পরার মধ্য দিয়ে দেশের অভ্যন্তর ভাগ গুলির যে সমস্ত বন্যার উৎপত্তি ঘটে তা অন্তর্দেশীয় বন্যা নামে পরিচিত। সাধারণত বেশিরভাগ অন্তর্দেশীয় বন্যার প্রকোপ উপকূল থেকে দূরবর্তী গ্রাম বা শহর কে কেন্দ্র করে দেখা যায় যেমন হ্যারিকেন হার্ভের দাপটে ইউ.এস.এ.'র (USA) গ্রেট লেক সংলগ্ন অঞ্চলগুলিতে বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছিল ফলে তত্সংলগ্ন অঞ্চলে ভয়াবহ বন্যা সংঘটিত হয়।

নদীতীরস্থ বন্যা : নদীর অতিরিক্ত জলরাশি পাশ্ববর্তী অঞ্চল গুলিকে প্লাবিত করলে তাকে নদী তীরস্থ বন্যা বলা হয়। দীর্ঘদিন যাবত অত্যধিক ভূমিক্ষয়ের দ্বারা নদীগর্ভের ভরাটকরন প্রবল বৃষ্টিপাত জনিত জলেরজোগান থেকে ছাড়া অতিরিক্ত জলরাশির বোঝা প্রভৃতি নদীতীরস্থ বন্যা ঘটিয়ে থাকে। এটি পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশের অতি পরিচিত একটি সাধারণ বন্যা। যেমন ভারত-বাংলাদেশটি নদীমাতৃক দেশ গুলিতে এ ধরনের বন্যা সংঘটিত হয়।

উপকূলীয় বন্যা: যেকোনো দেশের মূল ভূখণ্ডের প্রান্তিক বা সমুদ্রতীরবর্তী উপকূলীয় শুষ্কস্থল ভূখণ্ডকেসামুদ্রিক লবনাক্ত জলপ্লাবিত করলে তাকে উপকূলীয় বন্যা বলা হয়।উপকূলীয় বন্যা তিনটি কারণে হয়-

(1) ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড় জনিত জলোচ্ছাসের প্রভাব।

(2) প্রবল সুনামি এবং উচ্চ জোয়ারের প্রভাব। যেমন ভারতের সুন্দরবন সংলগ্ন উপকূলীয় অঞ্চলে কিংবা বাংলাদেশের এই ধরনের বন্যার প্রকোপ যথেষ্ট বেশি।

বন্যার কারণ

প্রাকৃতিক কারণ

অতি প্রবল বৃষ্টিপাত:- পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশ অঞ্চলে প্রতি প্রবল বৃষ্টিপাতে বন্যা সংগঠনের গভীর সম্পর্ক রয়েছে।কোনো অঞ্চলজুড়ে একটানা দীর্ঘদিন প্রবল বৃষ্টিপাত ঘটলে অতিরিক্ত জলের বোঝা জলাশয় গুলির স্বাভাবিক জল ধারণ ক্ষমতা কে অতিক্রম করে যায়।এরফলে সংশ্লিষ্ট জলাশয় গুলি থেকে অতিরিক্ত জল পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলিতে প্লাবিত করে তোলে।

ঘূর্ণিঝড়: প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের সঙ্গে উপকূলবর্তী অঞ্চলে বন্যা সৃষ্টির একটি গভীর সম্পর্ক রয়েছে।বিশেষ করে ক্রান্তীয় মন্ডল এর দেশগুলিতে সমস্ত ঘূর্ণিঝড়ের উৎপত্তি ঘটেসাগর বা মহাসাগরীয় অঞ্চলে। সেখান থেকে ঘূর্ণিঝড়টি শক্তি সঞ্চয় করে যখন ধীরে ধীরে উপকূলীয় স্থলভূখন্ডের দিকে ধেয়ে আসে উপকূলবর্তী সমুদ্র সংলগ্ন জলরাশির তরঙ্গের প্রবণতা বেড়ে যায়। এর ফলে সমুদ্র থেকে উত্থিত প্রবল জলোচ্ছাস উপকূলবর্তী বিস্তীর্ন এলাকাগু লিতে প্লাবিত করে তোলে।

তুষার গলন: অনেক সময় তুষার গলা জল অযাচিতভাবে নদীতে এসে জমা হেল নদীতে জল ধারণ ক্ষমতার ভারসাম্য বিঘ্নিত করে ফলস্বরূপ অতিরিক্ত তুষার গলা জল নদীর দুই কুল ছাপিয়ে স্থানীয়ভাবে বন্যার সৃষ্টি করতে পারে উচ্চ মন্ডলীদের দেশগুলিতে একটা সময় তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নিচে নেমে এসে এই সময় সেখানকার স্থানীয় নদী ও অন্যান্য জলাশয় বা পার্বত্য উপত্যকা গুলি কে বিপুল পরিমাণে জল জমতে থাকে এরপর পথের শুরু থেকে তাপমাত্রা যখন বাড়তে থাকে তখন সেখানকার বিভিন্ন অংশ জুড়ে জল ক্রমাগত বলে গিয়ে বন্যার সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়।

বানডাকা: অনেক সময় আর্দ্র ঋতুকালীন পূর্ণিমা অমাবস্যা তিথি গুলিতে পৃথিবীর ওপর চাঁদও সূর্যের একযোগে মহাকর্ষ বল সর্বাধিক কার্যকরী হওয়ার দরুন সমুদ্রপৃষ্ঠের জলরাশি প্রবলভাবে ফুলে ওঠে নদী মোহনা বরাবর উজানের দিকে প্রবেশ করলে তাকে বানডাকা বলে। সমুদ্র থেকে ছুটে আসা এই ধরনের বাননদী গুলিকে জলের উচ্চতা প্রায় 5 থেকে 7 মিটার পর্যন্ত বাড়িয়ে দেয়। এর ফলে নদী তীরবর্তী অঞ্চল গুলিকে বন্যা সৃষ্টি করে।

এছাড়াও ভূমিক্ষয়, ভূমিধস, ও নদী সংক্রান্ত বিভিন্ন কারণ যেমন নদীর আঁকাবাঁকা গতিপথ, ভূমিঢালের পরিবর্তন, নদীর গতিপথ পরিবর্তনপ্রভৃতিকারণে বন্যার সৃষ্টি হয়।

মনুষ্যসৃষ্ট কারন

বন্যা সৃষ্টিতে প্রাকৃতিক কারণ গুলি সক্রিয় ভূমিকা পালন করলেও মানুষের বেশকিছু ক্রিয়া-কলাপ বন্যার সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে দেয় এর কারণগুলি হল:

1) বনভূমি বিনাস: উদ্ভিদের শিকর নদীপাড় সংলগ্ন মাটিতে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে বন্যা প্রতিরোধে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জীবনে মানুষের জীবন ও জীবিকাগত তাগিদে ক্রমবর্ধমান বাসস্থান কৃষিকাজ রাস্তাঘাটের সম্প্রসারনের জন্য নদীরপাড় গুলিতে বেড়ে ওঠা এই সমস্ত স্থানীয় বনভূমি তথা উদ্ভিদ গোষ্ঠী কে বিপুল পরিমাণে উতঘাট করা হয়। এর ফলে নদীপাড় ক্ষয় প্রাপ্ত পদার্থ গুলি সঞ্চিত হয়ে নদী খাতের গভীরতা এবং জল ধারণ ক্ষমতা উভয়ের হ্রাস ঘটায়। দীর্ঘদিন ধরেএই ঘটনার পুনরাবৃত্তি সংশ্লিষ্ট নদী অববাহিকায় বন্যার সমস্যা তৈরি করে।

2) জমি পুনরুদ্ধার: মানুষ নতুন করে তার বাসস্থান নির্মাণ কিংবা চাষ আবাদের জমি প্রস্তুত করার জন্য সক্রিয় বদ্বীপ নিচু ভূমি ভাগের বাঁধ দিয়ে জমি পুনরুদ্ধার করে থাকে। এর ফলে অতিবর্ষনেরসময় পুনরুদ্ধারকৃত নিম্নভূভাগের নির্মীয়মান গুলিতে জলের চাপ ক্রমাগত বাড়তে থাকে পরে জোয়ারের জল যখন এই অংশে প্রবল বেগে প্রবেশ করে তার আঘাতে বাঁধের দুর্বল অংশগুলি ভেঙ্গে গিয়ে বন্যার পরিস্থিতি সৃষ্টি করে।

3) নগরায়ন : যখন কোন নদী তীরবর্তী অঞ্চল কে কেন্দ্র করে ধীরে ধীরে শহর গড়ে ওঠার প্রবণতা দেখা যায় তখন সেখানে জনবসতি রাস্তাঘাট শিল্প কেন্দ্র প্রভৃতির ব্যাপক প্রসার ঘটে।নগরায়নভিত্তিক কংক্রিটের এইসবব্যাপীবিভিন্নস্থাপতিগুলি ভূপৃষ্ঠের উপরযেআচ্ছাদন গড়ে তোলে তাভূগর্ভেজলেরঅনুপ্রবেশ এবাধা দেয় অন্যদিকে নগরায়নের ফলে শহরগুলিতে নোংরা আবর্জনা প্রাধান্যেসেখানকার নালা-নর্দমা জল নিকাশি ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ব্যাহত হয়। এই পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট শহরগুলিতে মাঝারি বৃষ্টিপাত বন্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

উপসংহার: বন্যা মানুষের জীবনে চরম নিয়ে আসে প্রতি বছর। দেশের মানুষের অপুরনীয় ক্ষতি করে। এমনকি জীবজন্তুর প্রানহানি ঘটে। ঘরবাড়ি ও চাষের জমি নষ্ট হয়ে যায়।

GEO-TALK
A Journal of Man and Environment
Journal available at: http://www.hbcnht.edu.in/college_magazine.php

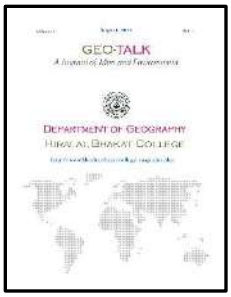

বন্যার প্রভাব

নিলয় মনি*

Semester-VI, Department of Geography, Hiralal Bhakat College, Nalhati, Birbhum

ARTICLE INFO

Keywords:
বন্যা
ক্ষতি
উপকারিতা

Article history

Received: 8th July, 2021
Revised: 30th July, 2021
Accepted: 12th August, 2021
© ***Dept. of Geography Hiralal Bhakat College***

ABSTRACT

হোয়াং-হো থেকে নীল নদ সুপ্রাচীন কাল থেকেই বিখ্যাত তাই বন্যা নামক দুর্যোগ বা বিপর্যয় আমাদের কাছে নতুন নয়। কোন নদী তার উপত্যকা এর দুঃখের কারন তো আবার কোন নদী সভ্যতা সৃষ্টিকারী। তাই বন্যা এর এই দ্বৈত ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আবহাওয়াগত খামখেয়ালিপনা মাঝেমধ্যেই মানুষকে যে কয়েকটি চরম বিপদ বা বিপন্নতার মুখে ঠেলে দেয় বন্যা তাদের মধ্যে অন্যতম । সাধারণত আদ্র জলবায়ু কেন্দ্রিক নদীমাতৃক অঞ্চলগুলিতে বছরে কিছু নির্দিষ্ট সময় বন্যা সংগঠন একটি স্বাভাবিক ঘটনা। বন্যা এক ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ গোটা বিশ্বে এই দুর্যোগে ভগিনী এমন কম অঞ্চল ই আছে। বর্তমানে কয়েক বছর ধরে আমরা দেখে আসছি আমাদের দেশ এবং আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলোতে প্রায় প্রত্যেক বছরই বন্যা আসছে। এবং যা ভয়াবহ ভাবে প্রভাবিত করছে আমাদের মানব জীবনকে, প্রাকৃতিক পরিবেশকে বিপর্যস্ত করছে, ।

বন্যার প্রভাব: যদিও কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বিপর্যয় এর প্রভাব কখনই ভাল হতে পারে না, তবুও কিছু ভালো দিক থাকা সত্বে আমি বন্যার প্রভাব কে দুই ভাগে বিভক্ত করলাম

1. বন্যার ক্ষতিকর প্রভাব
2. বন্যার উপকারিতা।

বন্যার ক্ষতিকর প্রভাব

বন্যার অজস্র ক্ষতিকর প্রভাব আছে। বন্যার প্রভাবে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে মানবজাতি প্রাকৃতিক পরিবেশ জীবজগৎ প্রত্যেকটি জিনিস ক্ষতিগ্রস্ত হয । নিম্নলিখিত বিষয় বস্তু দ্বারা আমি সেগুলি আলোচনা করব ।

*Corresponding author
E-mail address: niloymoni45@gmail.com

1. যেকোনো ভয়াবহ বন্যার গুরুতর প্রভাব হল জীবনহানি বা Death । বিশেষজ্ঞদের মতে একজন ব্যক্তিকে জলস্রোতে টেনে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে মাত্র 6 থেকে 10 ইঞ্চির জলবৃদ্ধি যথেষ্ট । বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় বন্যার দ্রুতগতির জল যেমন মানুষকে বহুদূর টেনেহিঁচড়ে ভাসিয়ে নিয়ে যায় তেমনি প্রবল জলতল বৃদ্ধি মানুষকে ডুবিয়ে মারে । এছাড়াও বন্যা পরিস্থিতিতে মানুষের প্রাণহানির অন্যান্য কারণ গুলি হল খাদ্যাভাব ,সাপের কামড়, ঘরবাড়ি ধসে পড়া কিংবা বাজপড়া প্রভৃতি।

যেমন - 1953 -2017 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বন্যার কারণে সমগ্র ভারতে প্রায় 1, 07, 535 জনের মৃত্যু হয়। সম্প্রতি 2020 খ্রিস্টাব্দে কেরালায় বন্যায় মাত্র 36 ঘন্টায় প্রায় 160 জনের মৃত্যু রেকর্ড করা হয়েছিল।

2.বন্যার ফলে বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপক পরিমাণ সম্পত্তি হানি ঘটে থাকে। বিশেষ করে বন্যার অতিরিক্ত জল বাড়ি ঘর গুলিতে যখন প্রবল বেগে ঢুকে পড়ে তার ফলে ঘরের আসবাবপত্র নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্র গুলি নষ্ট হয়, সেইসাথে প্রবন বন্যায় ভূমিধস ঘটলে বাড়ি ঘর ভেঙে পড়ে যায় ।

2020 আম্ফান এর ফলে আসা বন্যায, ভূমি ধসের কারণে 5,5000 টি বাসগৃহ ধ্বংস হয় । (The Quint)। এছাড়া ভারতবর্ষের 1978 খ্রিস্টাব্দের বন্যায় প্রায় 35,07,542 টি বাসগৃহ বিপর্যস্ত হয়েছিল

3.বন্যার ফলে কোন দেশ রাজ্য বা কোন অঞ্চল কে সবচেয়ে বেশি আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয় ।

যেমন -পশ্চিমবাংলায় 2017 জুলাই-আগস্টে যে বন্যা হয় তাতে 14 হাজার কোটি টাকা ক্ষয়ক্ষতি হয় (Government Estimate) ।

এছাড়া দুই হাজার কুড়ি সালে আগত ঘূর্ণিঝড় আম্ফান এর ফলে পশ্চিমবঙ্গ এবং উরিসা বিহার সংলগ্ন অঞ্চলে যে বন্যা সৃষ্টি হয়েছিল তাতে ভারতবর্ষে 800 কোটি টাকারও বেশি পরিমাণ ক্ষতি হয (উইকিপিডিয়া)।

2015 (14 Aug) সালের আনন্দবাজার পত্রিকার একটি প্রতিবেদন লক্ষ্য করলে দেখা যায় বন্যার ফলে পশ্চিমবঙ্গে কয়টি হয় 1438 কোটি

4.বন্যাকালীন পরিস্থিতিতে রাস্তাঘাট বিদ্যুৎ যোগাযোগ রেল পরিষেবা পানীয় জলের ব্যবস্থা একাধিক পরিকাঠামো গুলি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়

যেমন 2019 সালে ইউএসএতে 1.2 বিলিয়ন ডলারের পরিকাঠামো ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল ।

5 .বন্যার প্রভাব এ শহর অঞ্চল গুলির প্রয়:প্রণালী ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। বিশেষ করে পলি বালিগাদা এবং নোংরা আবর্জনা নর্দমা গুলিতে দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকে যা শহর অঞ্চল গুলি থেকে বন্যার জল অপসারিত হতে বাধা সৃষ্টি করে।

যেমনঃ কোলকাতা মুম্বাই দিল্লি মহানগরে এখানকার বন্যা পরিস্থিতি বর্তমানে অত্যন্ত ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে যা আমরা 2021 সালে এর ফলে আগত বন্যাতে দেখতে পেয়েছি।

6.বন্যা প্রবণ দেশ গুলিতে কৃষি ক্ষেত্রে ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয় । বিশেষ করে জল প্লাবিত হয়ে কৃষকদের বপন করা বিপুল পরিমাণ ফসল একদিকে যেমন ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যায় অন্যদিকে চাষের জমি পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায়।

যেমন বিহারে প্রতিবছর বন্যায় প্রায় 30%-40%ফসল নষ্ট হয়ে যায়।

এছাড়া 2016 সালের বন্যায় উত্তরপ্রদেশে 12 টি জেলায় প্রায় 30 হাজার হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়েছিল

7.বন্যার কারণে মানুষের মধ্যে একাধিক রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি দেখা যায় । যেমন টাইফয়েড হেপাটাইটিস এ ম্যালেরিয়া ডেঙ্গু ইত্যাদি

8.বন্যায় প্রতিকূল বিভিন্ন অবস্থা বা বন্যা সংক্রান্ত ভয়াবহতার অভিজ্ঞতা গুলি মানুষের মনের মধ্যে অনেক সময় দীর্ঘকালীন আঘাতে ছাপ রেখে যায। এর ফলে বন্যা পরবর্তীকালে বিভিন্ন শারীরিক অসুস্থতা নিদ্রাহীনতা এমনকি হিংসা জনিত প্রভাব কিছু সংখ্যক মানুষকে গ্রাস করে থাকে।

9.অনেক সময় বন্যার প্রভাবে প্লাবিত কোন অঞ্চল তার চারপাশে অন্যান্য অঞ্চল গুলি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ভাবে একটি দ্বীপে পরিণত হয় এই অবস্থায় সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা পুরোপুরি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে ।

যেমন 2019 সালে বিহারের বন্যা এই ধরনের পরিস্থিতি পষ্ট ভাবে লক্ষ্য করা গিয়েছিল

10.এছাড়া মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনে যে সমস্ত আর্থিক অবলম্বনে সহায়তা নিয়ে থাকে (মৎস্য আহরণ ফুল মধু সংগ্রহ চাষাবাদ ব্যবসা-বাণিজ্য) যা নিয়ে মানুষ বেঁচে থাকে বন্যার কারণে সেই সমস্ত ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে থমকে যায় মানুষ প্রায় সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে ।

পরিবেশের ওপর প্রভাব

বন্যা যে শুধু মানবজীবনকে বিপর্যস্ত করে তা নয় সংশ্লিষ্ট প্রকৃতি ও সমান ভাবে প্রভাবিত হয়।-

সাধারণত স্থলজ বা বাস্তুতন্ত্রের প্রায় 25% এলাকায় বিভিন্ন প্লাবনভূমি কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে । কিন্তু বন্যার ফলে পরিবেশের অন্তর্গত উদ্ভিদ এবং প্রাণী সম্প্রদায় বিপুলভাবে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কারণে স্থানীয় খাদ্য শৃংখল ভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এর ফলে সেখানকার বাস্তুতন্ত্রের কাঠামো সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে যায়। যেমন সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ স্থান জুড়ে প্রতিবছর বন্যার কারণে বাস্তুতান্ত্রিক কাঠামো ভীষণভাবে বিঘ্নিত হয়েছে।

বন্যার প্রভাবে পাহাড়ি বা পার্বত্য অঞ্চলের ঢালু ভূভাগ বরাবর ব্যাপক আকারে ভূমিধসের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। যেমন ভারতের সিকিম উত্তরাখণ্ড অরুণাচল প্রদেশ বন্যার কারণে এই ভূমিধস প্রবনতার অত্যন্ত বেশি।

বন্যা প্রভাবিত অঞ্চল গুলিতে বিশুদ্ধ জলে আর্সেনিক কিংবা বিভিন্ন ধরনের জীবাণু সংক্রমণ বৃদ্ধি ঘটে জলের গুণগত অবনমন ঘটায়।

যেমন প্রতিবছর ভারতের গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় প্রায় কয়েক হাজার গ্রামে এ ধরনের সমস্যা দেখা

এছাড়া বন্যার অতিরিক্ত জল এর প্রভাবে উদ্ভিদকুল এবং জীবজন্তুর ব্যাপকভাবে ক্ষয়ক্ষতি হয়।

যেমন সম্প্রতি দুই হাজার কুড়ি সালে আসামের ভয়াবহ বন্যায় কাজিরাঙা অভয়ারণ্য প্রায় শতাধিক জীবজন্তুর মৃত্যু ঘটে।

বন্যার উপকারিতা

সমগ্র পৃথিবীতে বন্যা বিভীষিকাময় একাধিক প্রভাব লক্ষ্য করার পর প্রশ্ন জাগতেই পারে যে বন্যার ইতিবাচক কোনো দিক হয় কিনা তবে হ্যাঁ বন্যার ইতিবাচক দিক হয় এবং জানি আমি এখন আলোচনা করব

বন্যার জল বিস্তীর্ণ কোন বিভাগের উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় উনার সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের জমা হয় যার ফলে সেখানকার মাটিতে পুষ্টিগুণ স্বাভাবিক ভাবেই যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়।

বন্যার ফলে অধিকাংশ দূষিত এবং নোংরা আবর্জনায় পরিপূর্ণ সতীন নদী পুনরায় পরিষ্কার হয়ে তার হারানো গতি ফিরে পায় যা নদীর পুনর্জীবন লাভ করার সমতুল্য।

বন্যার পরোক্ষভাবে ভূগর্ভের জল স্তর বৃদ্ধি পেয়ে ভৌম জল ভান্ডারের স্বাভাবিকত্ব অক্ষুন্ন রাখে।

এছাড়াও বন্যার প্রভাব কৃষিতে উন্নতি, মাছের চাষ, বদ্বীপ গঠন প্রভৃতি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে হয়ে থাকে।

কোন বিপর্যয় কখনোই মানব জীবনের জন্য অনুকূল নয়, সবগুলো দিক যথাযথভাবে বিচার করলে বন্যাকে প্রকৃতির আশীর্বাদ রূপে মনে হতে পারে বন্যার হাত থেকে মানুষ সম্পূর্ণ মুক্তি না পেলেও ব্যবস্থাপনা মূলক বেশকিছু পন্থায় এর প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারলে বন্যার সুফল ভোগ করা যাবে।

অবশেষে আমি এটাই বলব আজ মানুষ সব থেকে বেশি সমস্যায় পড়ে নিজেদের কারণে প্রকৃতির সাথে দূর ব্যবহার করার জন্য। যে কারণে আজ গোটা বিশ্ব করোনায় ভুগছে। আমি আমার সহপাঠীদের কাছে অনুরোধ করবো শিক্ষাকে শুধুমাত্র শিক্ষাবিদের না নিয়ে সেটাকে বইয়ের পাতায় না রেখে নিজের জীবনের কোন না কোন অংশে যদি কাজে লাগায়।

GEO-TALK
A Journal of Man and Environment
Journal available at: http://www.hbcnht.edu.in/college_magazine.php

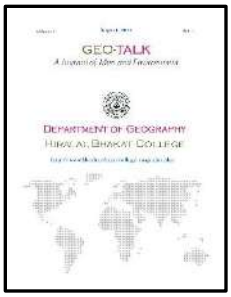

বন্যা ব্যবস্থাপনা

প্রদীপ মাল*

Semester-VI, Department of Geography, Hiralal Bhakat College, Nalhati, Birbhum

ARTICLE INFO

Keywords:
বন্যা
ব্যাবস্থাপনা

ABSTRACT

বন্যা বা যেকোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয় খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। প্রাকৃতির উপর আমাদের কোন রকম নিয়ন্ত্রন নেই এবং থাকতে পারে না। আমরা শুধুমাত্র বন্যা বা যেকোনো বিপর্যয়ের যথাযত ব্যাবস্থাপনার মাধ্যমে এর থেকে উদ্ভূত যে ক্ষয় ক্ষতি তার হাত থেকে বাঁচতে পারি মাত্র।

Article history

Received: 8th July, 2021
Revised: 30th July, 2021
Accepted: 12th August, 2021
© ***Dept. of Geography Hiralal Bhakat College***

ভূমিকা

পৃথিবীতে প্রতিনিয়ত ঘটে চলা অসংখ্য প্রাকৃতিক বিপযরয় গুলি মধ্যে অন্যতম হলো বন্যা। আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশে প্রতি বছর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্নকারণে বিধংসী বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়। এই বন্যার ফলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি জীবন হানী ইত্যাদি ঘটে থাকে। জাতীয় তথা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বন্যানিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবস্থাপনা নিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উদোগে গৃহীত রয়েছে। আজকের এই সেমিনারে আমরা বন্যার পরিস্থিতি এবং তার নিয়ন্ত্রণ বাব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা চেষ্টা করব।

প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে যখন নদী নালা জলাশয় পুকুর খাল বিল জলধারণ করতে অক্ষম হয়ে ওঠে তখনই বন্যার সৃষ্টি হয় প্রচন্ড বৃষ্টির ফলে সব নদী নালা, খালবিল, জলাশয়, পুকুর দুকুল ছাপিয়ে প্রচন্ড বেগে বয়ে যায়, গ্রাম নগর ফসলের ক্ষেত সব ভাসিয়ে নিয়ে যায় প্রচন্ড বেগের সাথে এই প্রবল জলোচ্ছাসের নাম বন্যা

বন্যার কারণ

পলি জমে যখন নদী ভরাট হয়ে আসে, তখন নদীর জল ধরে রাখার এবং জল বয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা কমে যায় ফলে জল নদীর দুই তীর ছাপিয়ে রাস্তাঘাট ডুবিয়ে দেয়, হঠাৎ নদীর বাঁধ ভেঙে গেলে ও বন্যা দেখা যায়, প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে বন্যা হয় এবং জলাধার থেকে বেশি পরিমাণে জল ছাড়ার ফলে ও বন্যা দেখা দেয়

*Corresponding author
E-mail address: 95pradipmal@gmail.com

বন্যার ইতিহাস

2018 সালের, বন্যা ভারতের রাজ্য কেরল কে প্রভাবিত করেছিল। 445 এর বেশি মারা গেছে, এটি বন্যার কারণ ছিল ভারী বৃষ্টিপাত 16 জুন 2013 সালে বন্যা আক্রান্ত কে প্রভাবিত করেছিল। ভারতীয় রাজ্য উওরাখন্ড এবং নিকটস্থ রাজ্যগুলি হরিয়ানা, দিল্লি, ইউপি এবং এইচপি এর ফলে 54888 টিরও বেশি মারা গেছে এবং 4500 গ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এটি বন্যার কারণ ছিল ভারী বৃষ্টিপাত এবং ভূমিধস

বন্যার প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি

যেকোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মতো বন্যাকেও সেই আদিম যুগ থেকে মানুষ ভয় পেয়ে এসেছে। প্রাচীন যুগে বন্যা থেকে মুক্তির জন্য মানুষ আশ্রয় নিয়েছে অলৌকিক কল্পনার কাছে আত্মসমর্পণের তবে কালের বিবর্তনে বন্যা সম্পর্কে মানুষের কুসংস্কার বহুলাংশে কেটে গেলেও বন্যার প্রতি মানুষের ভয় এখানো যায়নি। পৃথিবীর যেসব অঞ্চল বন্যাপ্রবণ, সেই সকল অঞ্চলের মানুষের কাছে বন্যা এক দুর্বিষহ বিভীষিকা স্বরূপ বন্যা এসে তাদের ঘরবাড়ি জমি ভাসিয়ে নিয়ে যায় তাই বন্যার তাদের ক্ষোভ সার্বজনীন তথা চিরকাল এর

বন্যার অপকারিতা

বন্যার ফলে মানুষের দুঃখ কষ্টের শেষ থাকে না। ঘরবাড়ি ভেঙ্গে যায় ফসলের ক্ষেত জলে ডুবে যায়, যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। গবাদি পশু মারা যায় এবং মানুষের ক্ষতির সীমা থাকে না। এছাড়া আমাশয়, কলেরা প্রভৃতি রোগ দেখা যায়

উপকারিতা:

বন্যার কিছু উপকারিতা আছে বন্যা সমস্ত আবর্জনা ধুয়ে নিয়ে যায়। বন্যা হলে জমিতে পলি জমে উর্বরতা বাড়ে। তার ফলে ফসল ভালো হয়।

বন্যার ব্যবস্থাপনা (Management of Flood)

বিধবংসী বন্যার ব্যবস্থাপনা উদ্দেশ্য পরিবেশে বিশারদরা বিভিন্ন মতামত দিয়েছেন। তাদের মতামতের উপর ভিত্তি করে বন্যা ব্যবস্থাপনাকে মোটামুটি দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমটি হলো উৎস প্রতিরোধ এবং দ্বিতীয়টি মূলগত প্রতিকার। উৎস প্রতিরোধের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানী রাবারবারবন্যাপ্রবণএলাকায়পোক্তবাঁধনির্মাণ করা, সংলগ্ন নদীর জলস্তরের উপর প্রতিনিয়ত নজররাখা ইত্যাদি উপায়ের কথা বলেছেন। তারা মনে করেন বন্যাপ্রবণ এলাকাগুলি ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি এড়ানোর জন্য বছরে বন্যার সময়ের পূর্বে যে অঞ্চলের মানুষদের নিরাপদ জায়গায় স্থানান্তরিত করা প্রয়োজন। অন্যদিকে বন্যার প্রতিকারমূলক উপায় হিসাবে বিজ্ঞানীরা পরিবেশে সংরক্ষনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এক্ষেত্রে তাদের মতে গুরুত্বপূর্ণ নদীগুলির উচ্চ ও মধ্যপ্রবাহের বাঁধ নির্মাণের আরোপ করতে হবে। বন্যা একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাঘটনা। এটিকে সম্পূর্ণ ভাবে রোধ করা সম্ভব নয়, তবে আগাম কিছু ব্যবস্থা বা সতর্কতা নিলে বন্যা পরিমাণ ও তীব্রতা হ্রাসকরা যায়, এগুলি হলো-

1.বনসৃজন:

বৃষ্টির সময় পৃষ্ঠীয় প্রবাহের তীব্রতা হ্রাসের কারণের জন্য বিশেষ করে পাহাড়ি অঞ্চলে বনসৃজন প্রয়োজন। বনসৃজনের ফলে জলের গতিরোধ করা সম্ভব উদ্ভিদেরা তাদের শিকড়ের সাথে মাটিকে ধরে রাখে এবং এই মাটি তাদের কনার ফাঁকে জল ধরে রাখে। এছাড়া অরণ্য ভূমিতে মাটির গাছ থেকে পড়ে করে। ফলে অধিক বৃষ্টির ফলে হঠাৎ আপতিত জলের সমস্তটাই নদী গিয়ে জড়ো হতে পারে না। বনসৃজনের ফলে পৃষ্ট প্রবাহ রোধের হয়ে মাটি ক্ষয় থেকে হ্রাস পায়।

2. জলাধার নির্মাণ:

বন্যার সময় জলধরে রাখার জন্য জলাধার তৈরী করা হয়। জলাধারগুলি বর্ষার জল ধরে রেখে বন্যার প্রকোপ যেমন হ্রাস করে, গরমকালে সেই জল আবার, কৃষি, শিল্প ও অন্যান্য কাজেও লাগানো যায়, দামোদর উপত্যকা নির্গম এই ধরনের বাঁধ তৈরী করে দামোদর বন্যার প্রকোপ অনেক হ্রাস করেছেন

3. Diversion System:

Dam এর নিচে নদনদীর নীচু অববাহিকার বন্যার জল বিভিন্ন খাতে বইয়ে দেওয়ার জন্য ব্যারেজ তৈরি করা হয়। ঘাগরভিন্নমুখি ব্যবস্থা এমনই এক ব্যবস্থা

4.ডাইক নির্মাণ:

অনেক সময় কোনো নীচু এলাকা বন্যার হাত থেকে রক্ষার জন্য চারিদিকে বা প্রয়োজনীয় দিকে বাঁধ দেওয়া হয় এই ধরনের বাঁধ কে ডাইক বলা হয়।

5.নদী প্রণালী নাব্যতা বৃদ্ধি:

নদী প্রনালীতে জল ধারণ বা নাব্যতা বৃদ্ধি করে বন্যার তীব্রতা ও বিস্তার হ্রাস করা যায়। নাব্যতা সৃষ্টি দু'ভাবে করা যায়:

a.নদীগর্ভে থেকে সঞ্চিত পলি অপসারণ করবে
b.পলি সঞ্চয় রোধ করে,পলি সঞ্চয় রোধ করা যেতে পারে মাটির হ্রাস করে
6. নদীর গতিপথ রোধ করা:

সর্পিল গতিপথ যুক্ত নদীতে বন্যা হ্রাস বা প্রতিরোধ করার জন্য গতিপথের সর্পিল ফাঁস অংশ কে কৃত্রিম উপায়ে ঋজু করা প্রয়োজন। ফলে এই ঋজু প্রনালীর মাধ্যমে সর্পিল প্রণালীর তুলনায় অপেক্ষাকৃত বেশি গতিবেগ নিষ্কাশিত হতে পারে এর ফলে বন্যার তীব্রতা ও বিস্তার অনেকটা কমে যায়

7.বন্যার পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থা

বাঁধ থেকে জল নির্গত করার পূর্বে পূর্বাভাস এবং বিপদ সংকেত দেওয়া উচিৎ। এর ফলে মানুষ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার সময় পেতে পারেন এছাড়া Cyclone সৃষ্টি অতি বৃষ্টির সম্ভাবনা সম্পর্কে পূর্বাভাস দেওয়ায় জন্য আধুনিক পূর্বাভাস ও বিপদ সংকেত জ্ঞাপক ব্যবস্থা করা প্রয়োজন এতে যুগপৎ সংঘটিত বৃষ্টি ও বাঁধ থেকে তুলে জলনির্গমন জনিত বিপদ এড়ানো যায়। এছাড়াও
বন্যা রোধের কিছু দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা নেওয়া দরকার, এগুলি হলো -

a. নদীর পাড় থেকে যতদূর সম্ভব স্থায়ী বসবাস তুলতে হবে
b.পার্বত্য অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণ গাছ লাগাতে হবে। যেখানে সেখানে খননকার্য বন্ধ করতে হবে। ঝোরা ঝর্ণা গুলো উন্মুক্ত করতে হবে।
c. যেসব রাস্তার বারেল পথগুলোর নদীর বাঁধের ভূমিকা নেয় সেগুলো যথা সম্ভব কমিয়ে, বেশি করে কালভার্ট তৈরি করে সেগুলো যথাসম্ভব কমিয়ে বেরোনোর রাস্তা রাখতে হবে।

বন্যার পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রস্তুতিপর্ব

বিশেষতঃ জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর মাসে বন্যা হয়ে থাকে, পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রস্তুতি নিতে হবে জানুয়ারি থেকে মে মাসের মধ্যে।
মাস অনুযায়ী পরিকল্পনা তৈরীর রূপরেখা

জানুয়ারি:

1.কাজ:
বন্যা মোকাবিলার জন্য কর্মসূচি তৈরী করা বন্যা বাহিত রোগ ও তার প্রতিকার নিয়ে সচেতনতা শিবির এর দরকার।
2.দায়িত্ব থাকবে: পঞ্চায়েতের সঙ্গে জনগোষ্ঠীর, প্রশাসনের সাহায্য দরকার

ফেব্রুয়ারি:

1.কাজ: বন্যার সময় করণীয় কাজ সমূহের প্রস্তাবের কপি বিভিন্ন সংস্থা কে জানানো,বন্যার মোকাবিলার জন্য গ্রামে অর্থ সংগ্রহ করা

মার্চ:

1.কাজ: টিউবওয়েল সারাতে ও জল পরিশোধন দুই দিনের প্রশিক্ষণ, প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়ার জন্য 15-20 জনের স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন ও প্রশিক্ষণ দরকার।

এপ্রিল:

1.কাজ: ওষুধের তালিকা তৈরী করে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পাঠানো, দুর্গতদের উদ্ধারে জন্য দল গঠন করা

মে:

1.কাজ: বন্যাও রোগ ভোগ তার প্রতিকারের জন্য সচেতনতা শিবির, যেসমস্তআবেদনসংশিলষঠ দপ্তরগুলি পাঠানো হয়েছিল তার ফলোআপ করা

জুলাই (বন্যার পর্যায়ে):

1.কাজ: উদ্ধারকারী দল সভা করে সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়া প্রয়োজনীয় রসদ ও উপকরণ নিয়ে আলোচনা করা , সতর্কীকরণ গ্রামে পৌঁছে দেওয়া।

আগস্ট, সেপ্টেম্বর (বন্যার পর্যায়ে):

1.কাজ: বন্যার্তদের শিবিরে বসবাসের ব্যবস্থা করা, শিবির ট্রিপল পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা, খাবার মজুত ও স্বালানি শিবির পৌঁছানো, অস্থায়ী টিউওবয়েলে থেকে পরিশোধিত পানীয় জলের ব্যবস্থা করা প্রানীদের উদ্ধারের পর নিরাপদ স্থানে রাখা যায় জল কমতে ব্লিচিং পাউডার ইত্যাদি দিয়ে দূষণমুক্ত রাখার চেষ্টা করা

অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর (পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন):

1.কাজ: ডুবে থাকা টিউবওয়েল সারানোর ব্যবস্থা করা, রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিলে মেডিক্যাল টিম দিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা এছাড়াও দূষণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ, বন্যার শীতের পোষাক নষ্ট হলে নতুন করে সংগ্রহ করা

উপসংহার

পরিশেষে একটা কথা বলা যায় আমাদের ধৈর্য বুদ্ধি ও প্রযুক্তিগত বিদ্যাকে কাজে লাগিয়ে, এছাড়াও সরকারের আর্থিক সহায়তা কেন্দ্র করে এবং জনসাধারনের সচেতনতায় বন্যা নিয়ন্ত্রণের এগিয়ে আসতে হবে আমাদের সকলকে।

GEO-TALK
A Journal of Man and Environment
Journal available at: http://www.hbcnht.edu.in/college_magazine.php

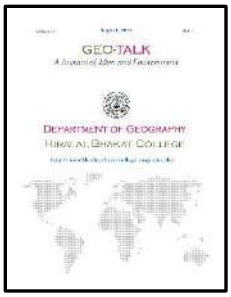

দুর্যোগ এবং এর কারণ হিসেবে ঘূর্ণিঝড়

রফিকুল ইসলাম*

Semester-VI, Department of Geography, Hiralal Bhakat College, Nalhati, Birbhum

ARTICLE INFO

Keywords:
দুর্যোগ
ভূমিকম্প
ইতিহাস

Article history

Received: 8th July, 2021
Revised: 30th July, 2021
Accepted: 12th August, 2021
© ***Dept. of Geography Hiralal Bhakat College***

ABSTRACT

ভূমিকম্প নামক প্রাকৃতিক দুর্যোগ এর সুদীর্ঘ ইতিহাস আমাদের এই দুর্যোগ এর ভয়াবহতা জানান দেয়। তার সাথে সাথে এই ভূমিকম্প এর ইতিহাস, এই বিশেষ দুর্যোগ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য প্রদান করে।

Cyclone as a Disaster

বিপর্যয় হল দুর্যোগ এর পরিণতি। প্রাকৃতিক ঘটনা যা মানুষের দুর্গতির কারণ হয়। এবং বাইরের বা অপরের সাহায্য ছাড়া যার মোকাবিলা করা সম্ভব হয় না তাকে বলে বিপর্যয়।

বিপর্যয় এর ফলে নানান ক্ষতি হয়। যেমন সমুদ্রের মধ্যে তৈরি হওয়া ঘুর্ণবাত হল একটি দুর্যোগ। কিন্তু সেই ঘূর্ণবাতের প্রভাব উপকূল এ আছড়ে পড়েতাই ভীষণভাবে ক্ষতি গ্রস্ত হয়। সাধারণত গ্রীষ্মমন্ডলীয় দেশগুলিতে ঘূর্ণিঝড় একটি বায়ুমন্ডলীয় গোলযোগ হিসাবে বিবেচিত। তার মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী হল ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়। এই ঘূর্ণিঝড়ের ফলে মানুষ যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

'Cyclone ' শব্দটি ব্যুৎপত্তিগত ভাবে গ্রিক শব্দ " Kukloma " বা " Kyklos " থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ হল সর্পকুণ্ডলী। 1855 খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ ক্যাপ্টেন Henry Piddington তার বিখ্যাত গ্রন্থ ***'Sailor's Horn a for the Laws of Storms in all parts of the World'***- তে সর্বপ্রথম " **Cyclone** " শব্দটির সঙ্গেনত পরিচয় করিয়েছিলেন।

1977 খ্রিস্টাব্দে NASA (National Aeronautics and Space Administration) ও NASDA (National Space Development Agency of Japan) – এর যৌথ উদ্যোগে মহাকাশে পাঠানো TRMM (Tropical Rainfall Measuring Mission) উপগ্রহের তথ্য বিশ্লেষণ করে এই ঝড়ের উৎপত্তি অনুধাবন অনেকটাই নিশ্চিত হওয়া গেছে। যেহেতু ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড় উৎপত্তিগত দিক থেকে

*Corresponding author
E-mail address: rickkhan731220@gmail.com

একটি তাপীয় ইঞ্জিন এর মতো কাজ করে তাই এই ঝড়ের বিকাশজনিত শক্তিরূপে মুখ্য ভূমিকা নিয়ে থাকে ঘনীভবনের রূপান্তরিত লীনতাপ। সাধারণত ক্রান্তীয় সামুদ্রিক অংশগুলিতে তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও অত্যধিক বাষ্পীভবনের কারণে বাতাসে অতিরিক্ত জলীয়ৰাষ্পের জোগান সংশ্লিষ্ট অঞ্চল বরাবর বায়ুরচাপ দ্রুত কমিয়ে দেয়। এখানে পারিপার্শিক বায়ুচাপের অস্থিরতা এবং বায়ুমণ্ডলে < 10−5 ডাইন মাত্রার কোরিওলিসবল একটি শক্তিশালী ঘূর্ণি (Vortex) ক্ষেত্রের সৃষ্টি করে। মৃদু ঝড়ো বাতাস সৃষ্টির প্রাথমিক অবস্থায় এখানে বাতাসের গতিবেগ 40 km / h হয়ে থাকে। এরপর বায়ুচাপের মাত্রা আরও হ্রাস পেয়ে যখন 990 মিলিবারের নীচে নেমে আসে , তখন বাতাসের গতিবেগ 40-80 / h-তেপৌছায়। সেখানে ঘূর্ণির কেন্দ্রীয় অংশ বরাবর একটি চক্ষু (Eye) অঞ্চলের সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে স্থলভাগ ও জলভাগের মধ্যে থাকা বায়ুর চাপঢাল বেড়ে যাওয়ায় বায়ুমণ্ডলের অস্থিরতা বৃদ্ধি পায় এবং ঘূর্ণিঝড়ের চক্ষু অঞ্চলকে কেন্দ্র করে প্রবল দমকা বাতাস ক্রমশ স্থলভাগের দিকে ধেয়ে আসে। বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে বায়ুমণ্ডলে প্রসারিত ঘন −কালো কিউমুলোনিম্বাস বজ্র মেঘ এবং প্রবল ঝাড়ো বাতাস সহ ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়ের ধরনের দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া এই ধরনের উপকূলীয় অঞ্চলগুলিকে তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব ফেলে থাকে।

ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়ের ফলাফল (Consequences of Tropical Cyclone)

পৃথিবীর উষ্ণ ক্রান্তীয় উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলিতে বছরের বিভিন্ন সময় একাধিক ঘূর্ণিঝড়ের আগমন ঘটে। বর্তমানে তার প্রভাব বেশি লক্ষণীয়। যেমন বর্তমান দিনে ঘটে যাওয়া আমফান, ফনি, জশ, প্রভৃতি শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় বিপর্যয়ের কারণ। ***World Meteorological Organisation*** - এর এক পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, বিগত 50 বছরে সমগ্র পৃথিবীতে শুধু ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়ের দাপটেই প্রায় 1942 − টি বিপর্যয় সংঘটিত হয়েছে, যাতে প্রায় 7,79,324 জন মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। কাজেই ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড় মানবজীবনে কতটা প্রভাব ফেলতে সক্ষম, এই পরিসংখ্যান থেকে যথেষ্ট স্পষ্ট।
ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড় যে সমস্ত প্রতিকূল অবস্থা তথা বিপদের উদ্রেক ঘটায়, সেগুলিকে পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করা হল।

1.বিধ্বংসীবাতাস (Violent Wind): ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড় মানব জীবনে প্রথম প্রভাব ফেলে থাকে শক্তিশালী তথা বিধ্বংসী বাতাসের মাধ্যমে। কাচাও দুর্বল, খুব দুর্বল বাড়ি গুলিভিত থেকে উলটে যায়।

2. প্রবল বৃষ্টিপাত (Heavy Rainfall): ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়ে প্রবল ঝোড়ো হাওয়ার সাথে দিনে গড়ে 200 km বাতারও বেশি বৃষ্টিপাত সংঘটিত হয়।অতিরিক্ত জল শিলাস্তরকে অসংলগ্ন করে তুলে ভূমিধসের মাত্রা বৃদ্ধি ঘটায়।

3. ঝড় জনিত ঢেউ (Storm Surges): সমুদ্র উপকূলের জলরাশিতে ঘূর্ণিবাতাস প্রবল শক্তি নিয়ে আছড়ে পড়লে সমুদ্র সংলগ্ন জলস্তর যখন হঠাৎ করেই অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায় তাকে ঝড়জনিত ঢেউ বলা হয়। এই ধরনের জলোচ্ছাসের উচ্চতা 10−20 ফুট বা তারও বেশি উচু হয়ে উপকূলে আছড়ে পড়ে। উপকূলীয় অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকায় থাকা কাচা ও দুর্বল বাড়ি ঘরগুলি জলের তোড়ে ভেসে যায়।

ক্ষয়ক্ষতির দৃষ্টান্ত (Example of Damages): সমগ্র পৃথিবীতে ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষয়ক্ষতি সংক্রান্ত দৃষ্টান্ত রয়েছে, যেমন –

* 1998 - 2017 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ঘূর্ণিঝড়ের আহরিততথ্যের ভিত্তিতে UNISDR (United Nations Office for Disaster Risk Reduction) তাদের এক পরিসংখ্যানে উল্লেখ করেছে — এই সময় কালে সমগ্র পৃথিবীতে ঘূর্ণিঝড় সংক্রান্ত প্রায় 2049 – টিবি পর্যয় সংঘটিত হয়েছে, যা বিশ্বের মোট বিপর্যয়ের নিরিখে প্রায় 28.2 % ।

* 1998-2017 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শুধুমাত্র ঘূর্ণিঝড়েই পৃথিবীর প্রায় 726 মিলিয়ন মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যা বিশ্বের মোট বিপর্যস্ত জনসংখ্যার নিরিখে প্রায় 16 % ।

* 1998-2017 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালে ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলা ঘূর্ণিঝড় তথা সংক্রান্ত বিপর্যয় ব্যবস্থাপনায় সমগ্র পৃথিবীতে প্রায় 1330 বিলিয়ন ইউ.এস. ডলার আর্থিক মূল্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যা এখনও পর্যন্ত সমস্ত বিপর্যয় মোকাবিলার নিরিখে সবচেয়ে বেশি (প্রায় 46 %) ।

National Hurricane Centre- এর মতে, 1963 - 2012 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত হ্যারিকেন জাতীয় ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ে সৃষ্ট জলোচ্ছাসে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে প্রায় 49 % মানুষের মৃত্যু ঘটেছে।

* NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) – এর প্রদত্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, 2013

খ্রিস্টাব্দে টাইফুন হাইয়ান – এর ফলে যে 24. 6 ফুট উচ্চতার জলোচ্ছ্বাস ঘটেছিল, এবং তার ফলে মধ্য ফিলিপিন্স – এর প্রায় 7350 জন মানুষের মৃত্যু ঘটে। তবে এখনও পর্যন্ত পৃথিবীতে ঘূর্ণিঝড় জনিত ভয়ঙ্কর জলোচ্ছ্বাস দেখা গেছে 1970 – এ বাংলাদেশে সংঘটিত ভোলা ঘূর্ণিঝড়ে। সেখানে জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা প্রায় 33 ফুট – এর কাছাকাছি হয়েছিল। তৎকালীন সেই ঘূর্ণিঝড়ে সামগ্রিকভাবে প্রায় 5 লক্ষ মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল।

ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়ের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Tropical Cyclone) : ক্রান্তীয় ঘূর্ণি ঝড় অন্যতম বৈশিষ্ট্যগুলি হল

প্রকৃতি: অতি শক্তিশালী নিম্নচাপীয় ক্ষেত্র বিশিষ্ট অঞ্চল থেকে সৃষ্টি হওয়া বজ্রবিদ্যুৎ বৃষ্টিপাত সহকারে সংঘটিত উপকূলবর্তী অঞ্চলের একটি প্রবল ঘূর্ণিবায়ু প্রবাহ হল ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়।

উৎপত্তিকাল

পৃথিবীর বিভিন্ন গোলার্ধে ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়ের উৎপত্তিগত সময়কাল এক একরকমের যেমন উত্তর গোলার্ধের ক্রান্তীয়মন্ডল এর সামগ্রিক অংশে মূলত গ্রীষ্মকাল থেকে শরৎকাল এর মধ্যে এই ঘূর্ণিঝড়ের উৎপত্তি ঘটে। আবার দক্ষিণ গোলার্ধে অধিকাংশ ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড় বসন্তকালে সৃষ্টি হয়

আয়তন ও আকৃতি-ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়ের ব্যাসটি আয়তনে গড়ে ৪০-300 কিলোমিটারের মধ্যে থাকলেও ক্ষেত্র বিশেষেটি 50 কিলোমিটার বাতার ওকমআয়তন বিশিষ্ট হতে পারে। এখানে ঘূর্ণিঝড়ের সমচাপ রেখাগুলি আকৃতি গোলাকার বা কখনও কখনও ডিম্বাকার হয়।

গভীরতা

অধিকাংশ ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়ের গঠন গতগভীরতামূলত 12 থেকে 16 কিলোমিটারের মধ্যে হয়।Byers এর মতে অনেক সময় বড় এবং গভীর কোনো ক্রান্তীয় ঘূর্ণি ঝড় ভেঙে গিয়ে বেশ কয়েকটি ছোট ছোট ঘূর্ণিঝড়ের জন্ম দিতে পারে।

স্থায়িত্ব – বেশিরভাগ ঘূর্ণিঝড়ের দুর্যোগ পূর্ণ পরিবেশ 1 থেকে 3 ঘন্টাকিংবাতারওবেশিসময়স্থায়ীহতে পারে। তবে প্রাক ঘূর্ণি ঝড় থেকে ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী আবহাওয়া পুরোপুরি কাটাতে বেশ কয়েকদিন সময় লেগে যায়।

Causes of Cyclone

যে সমস্ত অনুকূল অবস্থা ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টির ক্ষেত্রে অত্যন্ত সহায়ক, সেগুলি হল-

1. পর্যাপ্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাপ ও লীনতাপের সরবরাহ (Supply of Adequate Sensible and Latent Heat) : যেহেতু ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড় একটি তাপীয় ইঞ্জিনের ন্যায় কাজ করে , তাই এটি সৃষ্টির জন্য সমুদ্র সংলগ্ন অঞ্চলের গড় তাপমাত্রা 27 ° সেলসিয়াস হওয়া বাঞ্ছনীয়। এর ফলে বাতাসে জলীয় বাষ্পের জোগান যেমন বাড়বে , তেমনই ঘূর্ণবাতটিকে সচল রাখতে পর্যাপ্ত লীনতাপ সরবরাহ করবে। ক্রান্তীয় মণ্ডলীয় উপকূলীয় সামুদ্রিক অংশে এই ধরনের উপযোগি তাপমাত্রা মূলত গ্রীষ্মের শেষ কিংবা শরৎ – এর শুরুর দিকে থাকে বলে , অধিকাংশ ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড় এই সময়েই সংঘটিত হয়।

2. জলের গভীরতা (Depth of Water) : ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টির উপযোগি পর্যাপ্ত বাষ্পীভবনের জন্য ক্রান্তীয় মণ্ডলীয় সাগর বা মহাসাগরীয় অঞ্চলের গড় গভীরতা অন্তত পক্ষে 60–70mt গভীর হওয়া আবশ্যক। অন্যথায় গভীর পরিচলন স্রোত (Deep covectional current) নীচের শীতল সামুদ্রিক জলরাশিকে ঠেলে ওপরে তুলে নিয়ে আসবে , যা ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টিতে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে।

3. বায়ুমণ্ডলীয় গোলযোগের উপস্থিতি (Pressure of atmospheric disturbance) : ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টির জন্য বায়ুমণ্ডলের নিম্নস্তর ও উর্ধ্বস্তর — উভয় ক্ষেত্রেই অস্থিরতা বা গোলযোগের উপস্থিতি একান্ত কাম্য।দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় , গ্রীষ্মকালীন সময়ে ক্রান্তীয় নিম্নচাপ সৃষ্টি কিংবা ITCZ (Inter Tropical Convergence Zone) – এর উত্তর গোলার্ধে অবস্থানের দরুন , জলভাগ বরাবর পুবালি স্রোতের (Easterly wave) আবির্ভাব নিম্ন বায়ুমণ্ডলীয় স্তরে ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টির প্রাক্ অবস্থা সৃষ্টি করে।এছাড়াও , আবহবিজ্ঞানী Gension এবং Longley (1944 খ্রি .) – এর ধারণা অনুযায়ী , 9–15 km- এর মধ্যে থাকে উর্ধ্ব ট্রপোস্ফিয়ারের প্রতীপ ঘূর্ণবাত বা

নাতিশীতোষ্ণ ঘূর্ণবাতের পরিত্যক্ত ট্রাফ (Trough) , এমনকী জেট বায়ুকক্ষ তাপ বিযুক্তি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়ে গতির সঞ্চার করে।

4. কোরিওলিসবল (Coriolis Force): পৃথিবীর আবর্তন জনিত কেন্দ্র বহির্মুখী (Centrifugal) একদিকবিক্ষেপণশক্তিহলকোরিওলিসবল। সাধারণত বাতাসে ঘূর্ণি সৃষ্টির জন্য ন্যূনতম কোরিওলিস বল 10(5) ডাইন থাকা আবশ্যক। গবেষক Haltner ও Martin (1957 খ্রি:) – এর মতে , পর্যাপ্ত কোরিওলিস বলের কারণেই পৃথিবীর দুই – তৃতীয়াংশ ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড় উভয় গোলার্ধের 10 °-20 ° অক্ষাংশের মধ্যেই সৃষ্টি হয়।

5. আর্দ্রতা স্তর (Humidity Level) : মধ্য ট্রপস্ফিয়ারে বাতাসের আদ্রর্তা 50-60 % -এর বেশি হলেই বায়ুমণ্ডলে ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড় এবং ঘূর্ণিঝড় সংশ্লিষ্ট কিউমুলোনিম্বাস মেঘ সৃষ্টির আদর্শ পরিবেশ গড়ে ওঠে।

6. উষ্ণ ট্রপোস্ফিয়ারে প্রতিসরণ প্রক্রিয়া (Divergence Process in Upper Troposphere) : সাধারণত উষ্ণ টুপপাস্ফিয়ারের কেন্দ্র বহির্মুখী (Centrifugal) বায়ুপ্রবাহ নিম্নচাপ কেন্দ্রকেযেমনগভীরতরকরে , তেমনই পরোক্ষভাবে উর্ধ্বমুখী বায়ু কুণ্ডলী প্রবাহের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সহায়তা করে। সেই কারণে ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টিতে অবিরত শক্তির জোগান অব্যাহত রাখতে উষ্ণ ট্রপোস্ফিয়ারে বায়ুর প্রতিসরণ প্রক্রিয়াটি (Divergence process) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

7. বাতাসের ন্যূনতম উল্লম্ব কৃন্তন (Minimal Vertical Wind Shear) : ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাত সৃষ্টিতে নিম্নতম এবং উষ্ণতম বায়ুমণ্ডলীয় ক্ষেত্রে বাতাসের ন্যূনতম কৃন্তন (Shear) উল্লম্ব বায়ুপ্রবাহে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে কারণ উল্লম্ব উত্থান বায়ুর চক্রাকার প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করে ঘূর্ণিঝড় বিকাশের প্রেক্ষাপট তৈরি করে থাকে।

ইত্যাদি কারণগুলির দ্বারা ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টিহয়, যারদ্বারাবৃহৎক্ষতিসাধনহয়। যেমন বর্তমানে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘূর্ণিঝড় আম্ফান, ফনি, বুলবুল, ইয়াস প্রভৃতির দ্বারা বঙ্গোপসাগরে তীরবর্তী অঞ্চল ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অতিপ্রবল ঘূর্ণিঝড় ইয়াস ভারতের উড়িষ্যায় আঘাত করেছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশের আবহাওয়া অধিদপ্তর। বাংলাদেশের আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, সাইক্লোনটির কেন্দ্র আনুমানিক দুপুর ১২ টারদিকে উড়িষ্যার ধামরা অঞ্চল দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছে। উড়িষ্যা রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডব 3 থেকে 4 ঘন্টা পর্যন্ত চলতে পারে। পূর্বাভাস অনুযায়ী ঘূর্ণিঝড় টি বালেশ্বরের দক্ষিণ এবং ধামরার উত্তরাঞ্চল দিয়ে উড়িষ্যায় আঘাত হেনেছে। ঘূর্ণিঝড়ের সাথে জলোচ্ছাসের প্রভাবে উড়িষ্যা ও পূর্ব মেদিনীপুর এলাকার ব্যাপক অংশ জলের নিচে চলে গেছে বলে জানা যাচ্ছে। অনেক এলাকাতেই নদীর জল স্বাভাবিকের চেয়ে বেশ কয়েক ফুট উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এইসব এলাকায় স্বাভাবিক জোয়ারের চেয়ে ৩ থেকে ৬ ফুট বেশি উচ্চতায় জোয়ারে প্লাবিত হয়।

উপরিউক্ত কারনগুলির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ঘূর্ণিঝড় মানব জীবনে সংকটাপন্ন হয়। যার প্রভাব মানুষের মধ্যে দীর্ঘদিন থেকে যায়। এই ঘূর্ণিঝড় জনিত বিপর্যয়ের ফলে মানুষ ট্রমার মধ্যে চলে যায়। বাস্তুহারা মানুষজন দিশাহীন হয়ে শুধু খাদ্যের সন্ধান করে। অনেকে ট্রমা গ্রস্ততার ফলে আত্মহত্যা করে। বাকরুদ্ধ হয়ে হয়ে এই সমস্ত মানসিক ক্ষয়ক্ষতি লক্ষণীয়। তবে উপকূল থেকে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বিপর্যয়ের মাত্রা অত্যাধিক হয়। তাই আমরা বলতে পারি যে বিপর্যয় হল ঘূর্ণিঝড়ের ফল। যার প্রভাব মানুষ সহ পশুপাখি, উদ্ভিদ প্রভৃতি বিপুল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই এই ক্ষতিথেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কিছু ব্যবস্থা গ্রহন করা একান্ত দরকার।

About the Department of Geography

The Department of Geography has started its journey from 2008 with a General Course of Undergraduate Programme. Later it was upgraded by an Honours Course from 2013. At present the Department includes three Assistant Professors, four SACTs and one Laboratory Attendant. The Department is facilitated by a well-equipped general laboratory and a RS & GIS laboratory with proper internet connection. Following the University prescribed syllabus, student-computer ratio is routinely maintained in the RS & GIS laboratory. An annual Field Study is conducted by the Department and each student of Semester-V submit a Field Report to fulfil their Undergraduate Programme. Having a good student-teacher ratio, the Department always bears a rare personal relationship. Students can also follow a YouTube channel entitled 'World of Geography, Hiralal Bhakat College' to revisit some important classes. Teachers demonstrate practical classes in audio-visual mediums to grow a user-friendly attitude of students towards equipment. Recently an ICSSR funding Research Project was completed in this Department successfully.